ISSN 2229-7537

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

Vol. 12 October, 2020

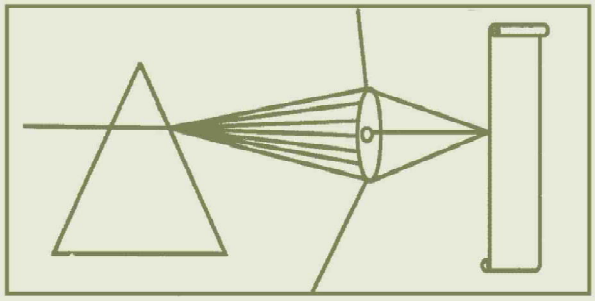

Annual Bilingual Journal

of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia, West Bengal

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 12 October, 2020

Annual Bilingual (English & Bengali) Journal
of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia

THE PRISM

Vol. 12, October, 2020

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Editors

Sri Thakurdas Mahato Assistant Professor in Bengali
Smt. Soma Lohar Assistant Professor in English
Dr. Sibani De Associate Professor in History
Dr. Bipul Chandra Bepari Assistant Professor in Sanskrit
Dr. Kalyan Senapati Assistant Professor in Chemistry

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

Editorial

On the eve of publication of the 12th volume of our *The Prism* the editorial board seeks the opportunity to thank all concerned, especially our peer-reviewers for the onus they have born in reviewing the articles. We also thank all our contributors for the faith they have kept in us.

The proclamation of our journal *The Prism* (ISSN 2229-7537) being of a multi disciplinary and bilingual disposition suggest that the deferrence of to homogeneity of approach is innate in it. This is exactly what creates in it a real heteroglossia. Predominantly our journal thrives on diversities rather than nuances.

We are sincerely planning to start alongside an electronic version of *The Prism* with a number of segment in order to reach a bigger audience. Hopefully it will be realised within a year. As members of the editorial board of *The Prism* we are ever on the lookout for suggestions from our readers. For any type of correspondence readers are requested to use our e-mail id.

We find it to be the right occasion to thank the college authority for its persistent support towards the college journal. We hope that we shall continue to have this patronage in future.

Thank you all
Members of Editorial Board

October, 2020
Mahatma Gandhi College, Purulia

THE PRISM

Vol. 12, October, 2020

Our Contributors

Dr. Kshirod Chandra Mahato	Associate Prof. M.M. College, Kashipur, Purulia.
Prof. Thakurdas Mahato	Asst. Prof. M.G. College. Lalpur, Purulia.
Sri Shyamapada Mahato	Research Scholar, Dept. of Bengali, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia.
Dr. Milan Kanti Satpathi	Associate Prof., Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Uday Sardar	Asst. Prof. Kandra College, West Burdwan.
Dr. Jayanta Sinha Mahapatra	SACT, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Ramsankar Pradhan	Asst. Prof. R.C. College, Loulara, Purulia.
Santana Deogharia	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Sri Sandip Gorain	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Dr. Amit De	Asst. Prof. M.M. College, Kashipur, Purulia.
Soumen Mukhopadhyay	Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Shuvam Chatterjee	Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.

Dr. Swarup De	Asst. Prof. Dept. of Bengali, Hijli College, Khargapur.
Prof. Gaffar Ansary	Asst. Prof. Arsha College, Purulia.
Prof. Kailashpati Saha	Asst. Prof. R.C. College, Loulara, Purulia.
Dr. Swarnakamal Goswami	SACT, Dept. of Bengali, Panchmura College, Bankura.
Dr. Ashutosh Biswas	Asst. Prof. Manbhum Mahavidyalaya, Manbazar, Purulia.
Sri Pradip Kuamr Patra	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Dr. Bipul Ch. Bepari	Asst. Prof. M.G. College, Lalpur. Purulia.
Sheuli Dass	Research Scholar, Dept. of Sanskrit, S.K.B. University, Purulia.
Shyamal Mahato	Ex. Student, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sadhan Kumbhakar	SACT, Manbhum Mahavidyalaya, Manbazar, Purulia.
Dr. Subhasis Bhattacharya	Associate Prof., Dept. of Economics, S.K.B. University, Purulia.
Prof. Goutam Bhowmik	Asst. Prof., Haldia Govt. College, Purba Medinipur.
Sri Dipak Kr. Mandal	Research Scholer, S.K.B. University, Purulia.
Dr. Biswanath Mukherjee	Assoeiate prof., Dept. of Physies, S.K.B. University, Purulia.
Dr. Malay Kumar Ghosh	Asst. Prof. Dept. of Commerce, S.K.B. University, Purulia.

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 12 October, 2020

Contents

চর্যাপদ ও ঝুমুর	ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো	13
ঝুমুর গানের বিকাশে সামন্ত রাজা-জমিদারদের ভূমিকা	ঠাকুরদাস মাহাতো	26
টুসু গীত : লোকসমাজে নারী জীবনের এক অনন্য উদ্ভাষণ	শ্যামাপদ মাহাতো	42
বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা : বৈপরীত্যে ও সামীপ্যে	মিলনকান্তি সৎপথী	49
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সুন্দরবনের জনজীবন	উদয় সরদার	59
মহামারী ও বাংলা কথাসাহিত্য	ড. জয়ন্ত কুমার সিন্‌হা মহাপাত্র	68
শরৎ সাহিত্যের সমাজ ভিত্তিতে অতিমারীর স্বরূপ সন্ধান	ড. রামশঙ্কর প্রধান	74
সৈকত রক্ষিতের গল্প : নিম্নবর্গের অবস্থান	সান্ত্বনা দেওঘরিয়া	83
বঙ্কিমের রোহিণী : নবজাগরণের অনিবার্য সিন্‌থিসিস	ড. অমিত দে	92
স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস (নির্বাচিত) : নারী চরিত্রের আধুনিকতা	সন্দীপ গরাই	100
ভাগাভাগি : প্রসঙ্গ দাঙ্গা ও দেশভাগ	সৌমেন মুখোপাধ্যায়	110

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ বিচিত্র ভূমিকায় নারী	শুভম চ্যাটার্জী	124
বনফুলের ছোটগল্প : ভাষাচিন্তা ও ভাষা পরিচয়	ড. স্বরূপ দে	131
বিষয় বৈচিত্র্যে সমকালীন ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্রতা	গাফফার আনসারী	145
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা নাটক	কৈলাশপতি সাহা	151
আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র উত্তরাধিকার	ড. স্বর্ণকমল গোস্বামী	160
সমর সেনের কবিতায় তেতাল্লিশের ছোঁয়া	ড. আশুতোষ বিশ্বাস	168
নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা কবিতা	প্রদীপকুমার পাত্র	179
বর্তমান সময়ে সংস্কৃতবিদ্যার আবশ্যকতা : অথর্ববেদ	ড. বিপুল চন্দ্র বেপারী	193
The Concept of Sannyasa in the later Upanishads	Sheuli Das	203
New Generation of Human Right	Shyamal Mahato	215
Implication of Education Status on Debt Profile and Family Planning: A Comparative Study between Scheduled Tribes of Purulia and Bankura District of West Bengal	Sadhan Kumbhakar Dr Subhasis Bhattacharya	225
The Capability Approach to the analysis of disability of children in India	Gautam Bhowmik	242

Portrayal of the sufferings and humiliation of woman in India A Comparative study of "A Time to be happy" and "Cry the Peacock"	Dipak Kr. Mandal	258
Solution Self-Assembly of Organic Crystalline Array for High-performance Molecular Electronic Devices	Biswanath Mukherjee	264
E-Commerce : A Booming Industry in India	Dr. Malay Kumar Ghosh	274

চর্যাপদ ও ঝুমুর

ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো

সংক্ষিপ্তসার : পণ্ডিতদের অভিমত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নমুনা হল বৌদ্ধধর্মের গুহ্যসাধনা বিষয়ক সাধনসঙ্গীত হিসাবে পরিচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রি. প্রকাশিত চর্যাপদগুলি। ওড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দী, মৈথিলী সহ অন্যান্য ভাষার নিদর্শনের দাবীকে নস্যাৎ করে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, চর্যাপদগুলি বাংলা ভাষারই আদি নিদর্শন। এদিকে, সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে ভিন্ন মত। অর্থাৎ, প্রকাশের দিন থেকে চর্যাপদগুলিকে নিয়ে আলোচনায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি আজ পর্যন্ত। সম্প্রতি গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, চর্যাপদগুলি হল কুড়মালি ভাষার নিদর্শন এবং পদগুলি হল কুড়মালি ভাষায় রচিত ঝুমুর গান— যা সাবেক মানভূম সহ তৎসংলগ্ন অঞ্চলের জনজাতি মানুষজনের মধ্যে প্রচলিত প্রেমসঙ্গীত। ফলে, চর্যাপদগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে আজও তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই পণ্ডিত মহলে। আলোচ্য নিবন্ধে স্বল্প পরিসরে সেই তর্ক-বিতর্কের উপর নতুন ভাবে আলোকপাত করে চর্যাপদগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : বৌদ্ধধর্মের গুহ্যসাধনা, সাধন সঙ্গীত, কুড়মালি ভাষা, ঝুমুর গান, জনজাতি মানুষজন, তর্ক-বিতর্ক।

'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে তিনটি বৌদ্ধধর্মের সাধনসঙ্গীত বিষয়ক পুঁথি আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে ১৯১৬ খ্রি. প্রকাশ করেন। এখানে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব'—বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের এই তিনটি পুঁথি স্থান পেয়েছিল।[১] পুঁথিটি খণ্ডিত হওয়ায় তেত্রিশ জন পদকর্তার রচিত সর্বমোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ মুনিদত্তের টীকা সহ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের মতানুযায়ী পদগুলি 'বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের অতিপুরাণ

বাঙ্গালা গান'। 'পটমঞ্জরী', 'গবড়া', 'অরু', 'গুর্জরী', 'দেবক্রী', 'দেশাখ', 'ভৈরবী', 'কামোদ', 'রাগ', 'রামক্রী', 'গউড়া', 'গুঞ্জরী', 'বরাড়ী', 'শীবরী', 'বলাড্ডি', 'মল্লারী', 'মালশী', 'মালসি গবুড়', 'কহ্নু গুঞ্জরী', 'বঙ্গাল' ও 'শবরী' রাগ আশ্রয়ে পদগুলি সিদ্ধাচার্যগণ রচনা করেছিলেন। সমালোচকের ভাষায়— এগুলি মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ সাধকদের রচনা। এই সব সাধক মূলত কবি ছিলেন না, কাব্যরস সৃষ্টি করার জন্য এঁরা চর্যাগীতিগুলি রচনা করেননি। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে এঁরা মহাযান-বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তাই, এই গানগুলির কাব্যমূল্যের চাইতে তত্ত্বমূল্যই বেশি। অধিকাংশ গানই 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে অভিহিত এক দ্ব্যর্থমূলক সাঙ্কেতিক ভাষার মধ্য দিয়ে তত্ত্ব অধিব্যক্ত হয়েছে।'[২]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'-য় মোট পঞ্চাশটি চর্যাগীতি আছে। মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা সমেত এগুলি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত ছিল। কিন্তু সাড়ে ছেচল্লিশটি আস্ত চর্যা পাওয়া গিয়েছিল তবে টীকা সমেত তিব্বতী অনুবাদে পঞ্চাশটি চর্যাই পাওয়া গিয়েছে। এই পঞ্চাশটি চর্যার ভণিতা অংশ থেকে এই সকল চর্যাকারের নাম পাওয়া যায়—[৩]

ক্রমিক নং	**চর্যাকারদের নাম**	**চর্যা নং**
১	লুই-পা	১, ২৯
২	শবর-পা	২৮, ৫০
৩	শান্তি-পা	১৫, ২৬
৪	ভুসুক-পা	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯
৫	সরহ-পা	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯
৬	কাহ্ন-পা	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪,৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫
৭	ঢেন্ডন-পা বা টেন্ডন-পা	৩৩
৮	কুক্কুরী-পা	২, ২০, ৪৮
৯	চটিল-পা	৫
১০	কম্বলাম্বর-পা	৮
১১	গুন্ডরী বা গুড্ডরী-পা	৪
১২	ডোম্বী-পা	১৪

১৩	কঙ্কণ-পা	৪৪
১৪	আর্যদেব	৩১
১৫	তন্ত্রী-পা	২৫
১৬	তাড়ক-পা	৩৭
১৭	দারিক-পা	৩৪
১৮	ধাম-পা বা গুঞ্জরী-পা	৪৭
১৯	বিরুবা-পা	৩
২০	বীণা-পা	১৭
২১	ভাদে বা ভদ্র-পা	৩৫
২২	মহীধর-পা	১৬
২৩	জয়নন্দী	৪৬

চর্যাগীতিকারদের আবির্ভাবকাল নির্ণয় ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। আবিষ্কর্তা হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ব্যাপারে প্রথম প্রচেষ্টা করেন। পরে ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of the Bengali Language'-এ চর্যাগীতিগুলি কোন্ ভাষায় রচিত এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এর ভাষা প্রাচীনবাংলা এবং রচনাকাল দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু, এ নিয়েও পরবর্তীকালে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় নানা তথ্য, প্রমাণ ও সাক্ষ্য উদ্ধার করে সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে বলেছেন, 'অতএব চর্যাগীতির রচনা অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়' এবং 'অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাগীতির রচনা হয়েছিল।'[৪] অধ্যাপক নীলরতন সেন মহাশয়ের সাক্ষ্য থেকেও এই ধারণা দৃঢ় হয়। চর্যাগীতগুলির মধ্যে যে বহুভাষার মিশ্রণ ঘটেছে যুগের নিরিখেই, তা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন— 'কাঠমান্ডুর অভিলেখালয়ে পুথি নকল করবার জন্যে যে মৈথিলী লিপিকরেরা রয়েছেন তাঁরা পুথির ভাষা ও লিপিকে মৈথিলী বলে দাবী করেছেন। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষাবিদ পন্ডিতগণ চর্যার ভাষা ও লিপিকে যথাক্রমে অসমীয়া ও ওড়িয়া বলেই চিহ্নিত করেছেন। হিন্দী ভাষা-সাহিত্যের তরফ থেকেও একই দাবী উঠেছে। এদের মধ্যে মৈথিলী, বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়ার দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার্য। কারণ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সম্ভবত এই ভাষাগুলি পুরোপুরি পৃথক রূপ পায়নি। বোধহয় ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি প্রথমে ওড়িয়া, তার কিছু পরে মৈথিলী এবং আরও অনেক পরে (ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ?) অসমীয়া স্বতন্ত্র ভাষার স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা, অসমীয়া ও মৈথিলী লিপির অভিন্নতা

এখনো প্রায় পুরোপুরি রয়ে গেছে।'[৫] অতএব চর্যাগীতির রচনাকালকে অষ্টম থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত টেনে নেওয়াই যায়।

অপরদিকে, চর্যাগানগুলি রূপকাশ্রয়ী সংকেতময় ভাষায় রচিত। পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে 'সন্ধাভাষা' বলেছেন। 'বোধ হয় সাধারণ্যে তাদের গুহ্যসাধনতত্ত্ব, বিশেষ করে সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনতত্ত্ব যাতে প্রকাশিত হয়ে পড়তে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এমন সঙ্কেতময় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন'[৫ক]—এইরকম একটি ধারণা এই ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে গড়ে উঠেছে। 'সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বে'র শরিক না হলে বা 'টীকাকার ব্যাখ্যা না করে দিলে গীতগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ সাধারণের পক্ষে বোঝা আদৌ সম্ভবপর নয়।' কিন্তু প্রশ্ন জাগে, 'সাধারণের পক্ষে বোঝা'র জন্য টীকাকার মুনিদত্ত চর্যাগানগুলির টীকা-টিপ্পনি সংস্কৃত ভাষায় লিখলেন কেন ? তাও আবার মাত্র পঞ্চাশটি গানের কেন ? তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে তৎকালে 'সাধারণের পক্ষে বোঝা'র জন্য সংস্কৃত ভাষার প্রচলন সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। অর্থাৎ সংস্কৃতই কি ছিল, সাধারণের একমাত্র বোধগম্য ভাষা ? না, এই ধর্মসঙ্গীতগুলির বিষয়বস্তু বিশেষ এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষের জন্য বা শুধু উক্ত নির্দিষ্ট সাধনপথের কারবারিদের জন্যই মুনিদত্ত চর্যাগুলির সংস্কৃত টীকা অর্থাৎ মানে বই রচনা করেছিলেন ? সমালোচকের সাক্ষ্য অনুযায়ী যখন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সম্ভবত মৈথিলী, বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষাগুলি পুরোপুরি পৃথক রূপই পায়নি, তখন এই পাঁচ-মিশেলি ভাষায় রচিত চর্যাগুলির অন্তর্নিহিত ভাষ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, আর তা বোঝবার জন্য মুনিদত্ত সংস্কৃত ভাষায় টীকা-টিপ্পনি লিখে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক! অবশ্য, আধুনিক সমালোচক এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুথি এবং তারপরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে যে তিব্বতী পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের পুথিটি ছেপে প্রকাশ করেন (তাতেই জানা গেল 'কল্যাণমিত্র' পণ্ডিতবর্গ 'চর্যাগীতিকোষ', নামে একশত সিদ্ধবজ্রগীতের এক সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মুনিদত্ত তার অর্ধাংশ (অর্থাৎ পঞ্চাশটি) শিষ্যবর্গ ও ভক্তদের জন্য বিবৃত করেন। সেই সঙ্গে সৎব্যক্তিদের বোধের জন্যে 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামক টীকা রচনা করেন'।[৫খ]), তার ভিত্তিতেই তিনি বলেছেন, 'মনে হয়, সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও আচরণ পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক ভাষার গণ্ডী পেরিয়ে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছিল। সে জন্যেই টীকা সর্বজনবোধ্য সংস্কৃতে লিখতে হয়েছিল।...অথবা তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজে এমন সংকরধর্মী সংস্কৃত ভাষার (Hybrid Sanskrit) প্রচলনও থাকতে পারে।'[৫গ] এই অনুমান কতটা যুক্তিসঙ্গত তা পন্ডিতগণেরই বিবেচ্য।

এছাড়াও, চর্যার পদকর্তাদের নামকরণ নিয়েও বিস্ময়বোধের জাগরণ হয়। একশত চর্যাগীতের সংকলন থেকে টীকাকার মুনিদত্ত 'সাধারণের পক্ষে বোঝা'র জন্য বেছে বেছে যে পঞ্চাশটি চর্যার টীকা লিখেছিলেন সেখান থেকে মাত্র তেইশজন চর্যাকারের নাম পাওয়া যায়। লুই, ভুসুক, ডোম্বী, শবরী, টেন্টন, কুক্কুরী, চাটিল এই রকম বিচিত্র নামের পদকর্তাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা কি স্বাভাবিক নাম, না কি ছদ্মনাম ? পদকর্তারা এই রকম ছদ্মনামই বা ধারণ করতে গেলেন কেন ? সর্বসাধারণের বিরূপতার হাত থেকে সহজিয়া সাধনপদ্ধতিকে আড়াল করবার অথবা নিজেদেরকে সেই সাধনপন্থার অনুগামী হিসাবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ থেকেই এই রকম বিচিত্র ছদ্মনাম ধারণ ? এর থেকে মনে হয়, তৎকালে সমাজ-পরিবেশে বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া সাধনপন্থায় দৌর্বল্য অনুপ্রবেশ করেছিল, তার থেকে নিজেদের সংস্রব গোপন রাখতেই ছদ্মনামের অবতারণা। সুরের দিক থেকেও এই শৈথিল্যের পরিচয় ধরা পড়ে। 'পটমঞ্জরী', 'কামোদ', 'ভৈরবী', 'মল্লারী'-রাগের পাশাপাশি 'বঙ্গাল'[৬] নামক লৌকিক রাগেও পদকর্তা ভুসুক ৪৩ নং চর্যাটি রচনা করেছেন।

এতৎসত্ত্বেও চর্যাপদ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। পণ্ডিতেরা সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, চর্যাপদগুলি হলো কুড়মালি ভাষা ও ঝুমুরের নিদর্শন।[৬ক] এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি। আসলে, চর্যাপদগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে-এর নানাদিক নিয়ে পণ্ডিত মহলে চর্চা শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে, চর্যার ভাষা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। কেউ বা হিন্দী ভাষার, কেউ বা অসমীয়া, কেউ বা ওড়িয়া, কেউ বা মৈথিলী'-র নিদর্শন হিসাবে চর্যার পদগুলোকে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাকে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতের সমর্থন করে আধুনিক সমালোচকও বলেছেন যে, 'বৌদ্ধ আচার্যেরা যে উদ্দেশ্যেই চর্যাগীতগুলি লিখুন না কেন, আমাদের কাছে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার এবং ছন্দ-সুর-সমন্বিত কাব্য-সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে এগুলির বিশেষ মূল্য রয়েছে।'[৭] তিনিও চর্যাগুলির ভাষাবৈশিষ্ট্য হিসাবে ধ্বনি ও রূপের আলোচনা করে বাংলা ভাষার দাবীকে দৃঢ় করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুকুমার সেন মহাশয়ের মত অনুযায়ী 'চর্যাগীতির ভাষা কথ্য-ভাষাশ্রিত হইলেও তাহা সাহিত্যের ভাষা এবং সে ভাষায় একাধিক উপভাষার (পরে যা স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইয়াছে) মিশ্রণ আছে।'[৮] আর 'চর্যার ভাষার মূল অনায়াসে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে' বলে অনুমান করেছেন। তবে, এর রচনাকালের শেষ সময়সীমা সম্পর্কে নিশ্চয় হওয়া না গেলেও, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত মৈথিলী গ্রন্থ জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর'-এ চর্যাকারদের সকলের নামের

উল্লেখ আছে। এমনকি, দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতকের সময়সীমায় রচিত কয়েকটি সঙ্গীতশাস্ত্রে 'চর্যা' ও 'চর্যাগান'-র উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮ক]

চর্যাপদের রচনাকাল এই সময়সীমার মধ্যে ধরে নিলে, এর ভাষায় কুড়মালির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সোনার পাথরবাটির মত মনে হয়। কারণ, প্রাগুক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রচলিত 'কথ্য-ভাষা' বা 'সাহিত্যের-ভাষা' হিসাবে কুড়মালি ভাষার কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এবং ড. সেন চর্যাগীতের মধ্যে যে 'একাধিক উপভাষার মিশ্রণ আছে' বলে মন্তব্য করেছেন, সেখানে কুড়্মালির মত কোনো উপভাষার সন্ধান মেলে না। বরঞ্চ, ইদানিং যে সকল গবেষক চর্যাগীতের ভাষাকে কুড়মালি বলে চিহ্নিত করতে চান, তাঁরা কুড়মালিকে উপভাষার বদলে একটা স্বতন্ত্র ও ঐতিহ্যশালী ভাষা বলে মনে করেন। কিন্তু কথা হল— কুড়মালি চর্যাপদের যুগেও এত সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যশালী ভাষা হয়েও পরবর্তীকালে শতকের পর শতক জুড়ে সেই ভাষায় রচিত আর একটাও সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া গেল না কেন ? আসলে সমালোচক ঠিকই অনুমান করেছেন, হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমীয়া, বাংলা প্রভৃতি ভাষাগুলি খুব সম্ভবত অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এক সঙ্গে মিলেমিশেই ছিল পুরোপুরি স্বতন্ত্র বা পৃথক রূপ পায় নি। বোধ হয়, সে যুগে কুড়্মালি ভাষারও স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। সেই সময় দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠির মধ্যেও আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণ হয়নি। এছাড়াও ঝুমুরেরও কোনোরকম স্বতন্ত্র পদ রচিত হয় নি সেই সময়। কেবল ষোড়শ শতকে রচিত শ্রীশুভঙ্করের 'সঙ্গীতদামোদর'-এ ঝুমুর শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে 'অথ ঝুমরি' নামক এক সুরের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, সচেতনভাবে ভণিতাযুক্ত পদবন্ধ ঝুমুর লিখিত হয়েছে উনিশ শতকের শেষভাগে। এই যুগে বিভিন্ন প্রতিভাধর ঝুমুর কবির আবির্ভাব ঘটে এবং স্থানীয় জমিদারেরাও ঝুমুর কবিদের ঝুমুর রচনায় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তাঁরা স্থানীয় জমিদারের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক ঝুমুরের পাশাপাশি রামায়ণ, মহাভারত ও রাধাকৃষ্ণ লীলার পালাবদ্ধ ঝুমুর রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। অনেকে আবার ব্যক্তিগতজীবনে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে দেহতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক ঝুমুর রচনা করলেন। কেউ বা জমিদারদের সভায় পরিবেশনের জন্য বৈঠকী মেজাজের 'দরবারী ঝুমুর' রচনা করলেন। কেউ আবার জমিদারদের বাঈজিদের নাচের অনুষঙ্গ হিসাবে 'নাচনিশাইল্যা ঝুমুর' বাঁধলেন। অনেকে জুড়লেন 'দাঁইড়শাইল্যা' সহ বিভিন্ন রসের ঝুমুর। এক কথায়, এই যুগে এসেই যেন ঝুমুর রচনায় জোয়ার এলো।

যাইহোক, সচেতনভাবে ঝুমুর রচনা বলতে যা বোঝায় চর্যাপদগুলি তা নয়। তবে, অনেক পদকর্তা রাঢ়দেশের লোক ছিলেন বটে।[৯] সে দিক থেকে দেখতে গেলে, এই

অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রাচীনরূপের ছাপ চর্যার মধ্যে থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই তেত্রিশ জন পদকর্তার মধ্যে প্রথম পদকর্তা লুইপাদ 'রাঢ়দেশের লোক ছিলেন' বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন। শুধু চর্যাপদই নয়, তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'বজ্রতত্ত্বসাধন', 'বুদ্ধোদয়', 'শ্রীভগবদভিসময়' ও 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামে চারখানি পুথি রচনা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া 'লুহিপাদগীতিকা' নামে তাঁর একখানি বাঙ্গালা সংকীর্তন পদাবলীর দুটি পদে তিরানব্বইটি কথার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ষোলটি, প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ চুয়াল্লিশটি, চলিত বাঙ্গালা আটটি এবং কুড়িটি প্রাকৃত শব্দ আছে বলে জানিয়েছেন। আর 'ধমণ' ও 'চমণ' শব্দ দুটি কোন ভাষার তা চিহ্নিত না করতে পেরে 'পারিভাষিক শব্দ' বলে অনুমান করেছেন। এই দুটো পদকেই যদি তৎকালের 'পাঁচমিশেলী' ভাষার নমুনা হিসাবে ধরা হয়, তাতেও স্পষ্ট হয় চর্যাপদগুলি নিছক কুড়মালি ভাষার ঝুমুর গান নয়। তাছাড়া, শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত চর্যাপদগুলিকে যদি কুড়মালি ঝুমুরের নিদর্শন বলে ধরে নেওয়াও হয়; তাহলে সমকালের সরহপাদের 'কথস্য দোঁহা', 'দোঁহাকোষনামচর্য্যাগীতি', 'দোঁহা-কোষ উপদেশগীতি', কৃষ্ণাচার্য্যের 'দোঁহা কোষ' সহ তেলিপ ও বিরূপের 'দোঁহা কোষ' গুলিকেও ঝুমুরের নিদর্শন বলতে হয়। কিন্তু তা বলা যায় না। কারণ, 'বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা গীতিকা ভিন্ন দোঁহা রচনা করিয়াছেন।... সহজযানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করাই এই দোঁহাকোষের উদ্দেশ্য...'।[৯ক]

সুরের প্রয়োগ বৈচিত্র তথা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আধারে চর্যাপদগুলিকে মণ্ডিত দেখে আধুনিক গবেষকগণ চর্যাপদগুলিকে কুড়মালি ঝুমুরের সমগোত্রীয় বলে দাবী করেছেন। ঝুমুরে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে নাকি চর্যার বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মিল তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। তার ভিত্তিতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চর্যাপদগুলি হল উৎকৃষ্ট ঝুমুর। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত তা একটু মনযোগ দিলেই জানা যায়। চর্যাপদসহ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের সহজযানের দোঁহাকোষ রচনাকালের ইতিহাস পণ্ডিতেরা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শুরু ধরেছেন। তার রাগ-রাগিণী, সুরের ব্যবহারও তখন থেকেই শুরু ধরে নেওয়াই যায়। এমনকি, চর্যাপদগুলির ভাষাও 'পাঁচমিশালী' বা 'সন্ধ্যাভাষা'। তাহলে, এ ব্যাপারে কতকগুলি প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ঝুমুরের রচনাকালও কি চর্যাপদের বা দোঁহা কোষগুলির সমসাময়িক ? দ্বিতীয়তঃ চর্যাপদের সমকালীন ঝুমুরের সন্ধান এতদিনেও পাওয়া গেল না কেন ? তৃতীয়তঃ চর্যাপদ বা দোঁহা কোষগুলির মত 'পাঁচমিশালী' বা 'সন্ধ্যা ভাষা'য় রচিত ঝুমুরের একটাও নমুনা আবিষ্কৃত হল না কেন ? চতুর্থতঃ চর্যাপদ বা দোঁহা কোষগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য সহজযানপন্থীদের সাধনসঙ্গীত হলে, ঝুমুরও কি কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত ? চর্যাপদগুলিকে ঝুমুরের পূর্বসূরী ধরলে এই সব প্রশ্ন অমিমাংসিতই থেকে যায়।

এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে চর্যার আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। চর্যাপদগুলির রচনার পূর্বকাল ও সমকাল পরিবেশ বিষয়ে তিনি একটা সুস্পষ্ট ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। তা এইরকম— 'চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ছয়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ও পূর্ব্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ সংকীর্ত্তনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ সমস্ত গান গাইয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন, তাদের নাম, পটম-মঞ্জরী, গবড়ী, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ী, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কহ্নুগঞ্জরী, বাঙ্গালা ইত্যাদি।'[৯খ] তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই রাগ-রাগিণীগুলির প্রচলন তখন থেকেই ছিল এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত চর্যাগুলি এই সব ক'টা রাগ-রাগিণীতেই রচিত। এই রাগ-রাগিণীগুলি সমাজ জীবনে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, পরবর্তীকালের দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে ও তৎপরবর্তীকালের কবি বড়ু চন্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এও উক্ত রাগ-রাগিণীগুলি ব্যবহার করেছেন। এই তিন কাব্যে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর তালিকাটি উল্লেখ করলেই স্পষ্ট হয়—

চর্যাপদ	**গীতগোবিন্দ**	**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**
গুর্জরী/গুঞ্জরী	গুর্জরী	গুজ্জরী
দেশাখ	দেশাখ্য	দেশাগ
ভৈরবী	ভৈরবী	ভৈরবী
রামক্রী	রামকিরি	রামগিরী
বরাড়ী/ বড়ারী	বরাড়ী	বরাড়ীরাগ/বরাড়ীয়াগ/বাঙ্গালবরাড়ী
মালশী	মালব	মালব/মালবশ্রী
শীবরী/শবরী		শৌরী
মল্লারী		মল্লার
বঙ্গাল		বঙ্গাল
কুহ্নুগুঞ্জরী		কহূগুজ্জরী
বিভাগ	বিভাষ/বিভাষকহূ	
বসন্ত	বসন্ত	
দেশীবরাড়ী	দেশবরাড়ী	
পটমঞ্জরী	মালব-গৌড়রাগ	কোড়া রাগ

দেবক্রী	কর্ণাট রাগ	ধানুষী রাগ
কামোদ	গোন্ডকিরী	আহের
ধনসী	মালব	ভাঠিআলি
বলাড্ডিড		কেদার
মালসী গবুড়		বেলাবেলী
গবড়া/গউড়া		ললিত
অরু		শ্রীরাগঃ/কহূরাগ
		পাহাড়ীঅ(আ)রাগ

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত নেপালে প্রাপ্ত পুথিতেও দেখা যায়, তিনি যে ৭০০-র বেশি গেয় বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন, সেখানেও বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—[৯গ]

পদসংখ্যা	**রাগ/রাগিণী**
৬	আসাবরি
৭	আহিরি/আহিরিনি
৪	কেদার
৩৬	কোলবা
৮	গুর্জরি
৮১	ধন্‌চি (ধানেশ্রী)
২	নট
৮	বসন্ত
১৫	বিভাস
২২	বরাড়ি
৬১	মালব
১৩	মলারি
৫	ললিত
৯	সারঙ্গ

আবার দেখা যায়, সপ্তদশ শতকের আর এক মিথিলার কবি লোচন শর্মা (ঝা) (জন্মকাল ১৬৮১) তৎকালীন মিথিলার নৃপতি নরপতি ঠাকুরের নির্দেশে রাগতরঙ্গিণী নামে যে

সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, সেখানেও তিনি বিদ্যাপতির সাঙ্গীতিক প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে ৫১টি পদের রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—[৯ঘ] 'মাধবী', 'নেপাল বরাড়ী', 'দেশ দেশাখ', 'কেদার', 'কামোদ কেদার', 'দেশ', 'শ্রীরাগ', 'সুরপঞ্চম', 'মালব', 'বিজয়পুরমালব', 'জোগিয়ামালব', 'যোগিয়া আসাবরী', 'মলারিকা', 'বিভাসী', 'ভীম পলাসি', 'গোপীবল্লভ, 'দেশী', 'অভিরাম', 'শোভনা', 'সারঙ্গি', 'স্মরসন্দীপন', 'কোভার' ইত্যাদি। তুলনামূলক আলোচনান্তে রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের মন্তব্য— "নেপাল-পুথিতে উল্লিখিত রাগরাগিণীর সঙ্গে লোচন শর্মার বিবরণ মিলিয়ে দেখে এমন ভাবা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বিদ্যাপতির গীতি বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়।"[৯ঙ] তিনিও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর একটি তালিকা প্রস্তুত করে বলেছেন— "বড়ু চণ্ডীদাস শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর প্রমাণ থেকে মনে হয়, বড়ু চন্ডীদাসের সময়ে গ্রাম গঞ্জে মার্গসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ছিল।"[৯চ] ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে এই সকল রাগ-রাগিণী অবলম্বনে পদাবলী সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রাপ্ত এই ঐতিহ্যবাহী রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ করেছেন।

তাহলে, দৃষ্টিকে আর একটু প্রসারিত করে এ কথা বলা যেতেই পারে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবপদ রচনাকালের মতো 'চর্যাপদ' ও 'গীতগোবিন্দ' রচনা কালেও গ্রামে-গঞ্জে মার্গসঙ্গীতের সমান জনপ্রিয়তা ছিল। কারণ, তিনটি গ্রন্থের ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর রাগ-রাগিণীর মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের সাহিত্য পরম্পরায় রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখের ধারাবাহিকতায় সমাজ প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলির আধারে ঐ চারযুগের কাব্য রচয়িতাদের কাব্য রচনা সামাজিক সচলতারই (Social mobility)-র লক্ষণ বলে মনে হয়। ধারাবাহিকভাবে সমাজে প্রচলিত বা গ্রামেগঞ্জের জনপ্রিয় মার্গসঙ্গীতগুলিই ক্রমবিবর্তিত হতে হতে পরবর্তীকালে মানভূমের লোকগান 'ঝুমুরে'র রেগ্ (রাগ)-এ পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ 'ঝুমুর'-এ ব্যবহৃত অধিকাংশ রাগ-রাগিণীগুলি এই গ্রামেগঞ্জের প্রচলিত মার্গসঙ্গীতগুলিরই ক্রমবিবর্তিতরূপ। ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত সমাজ প্রচলিত এই সব মার্গসঙ্গীতের রাগ-রাগিণী আশ্রয় করেই ঝুমুর কবিগণ ভণিতাযুক্ত পদাবলীর অনুকরণে উৎকৃষ্ট ঝুমুর পদ সহ পালাবদ্ধ ঝুমুর রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলস্বরূপ, অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সাবেক মানভূমের স্থানীয় ভূ-স্বামী তথা সামন্ত-জমিদারদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় 'ঝুমুর' নামক লোকসঙ্গীত তৎকালীন সমাজে বহুধারায় রচিত হয়েছিল। তাই, প্রচলিত এই সব রাগ-রাগিণীর প্রভাবেই এবং পূর্বপ্রচলিত বৈষ্ণবপদাবলীর আদলে ঝুমুর কবিগণ ভণিতাযুক্ত ঝুমুর রচনায়

আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ চর্যার রাগ-রাগিণীর প্রভাবেই ঝুমুর প্রভাবিত, ঝুমুরের প্রভাবে চর্যাপদ রচিত নয়। কালের নিয়মেই চর্যার ব্যবহৃত রাগ 'পটমঞ্জরী', ঝুমুরে 'পাটামেধা'-য় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই এ কথা বলা যায় যে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের সাধনসঙ্গীত বিষয়ক এই চর্যাপদগুলি ঝুমুর নয়। ঝুমুর উনিশ শতকের শেষপাদে সূচিত সাবেক মানভূম তথা সমগ্র ঝাড়খন্ড অঞ্চলে প্রচলিত প্রেমসঙ্গীত— কোনো ধর্মীয় সাধনসঙ্গীত নয়।

তাছাড়াও, ভাষা ব্যবহারের দিক থেকেও চর্যাপদের সঙ্গে ঝুমুরের বিস্তর তফাৎ। ঝুমুরের কবিরা চর্যাকারদের মতো 'সন্ধ্যাভাষা'য় ঝুমুর রচনা করেননি। তাঁরা আধুনিক বাংলা ভাষায় ঝুমুর রচনা করেছেন। এমনকি, নাম-ভণিতাহীন যে সকল প্রলিত ঝুমুরের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলোও আধুনিক বাংলায় রচিত এবং এই ধরনের ঝুমুরগুলির রচনাকালও অজ্ঞাত। চর্যাপদগুলি ঝুমুর হলে, অতি অবশ্যই চর্যা সমকালের চর্যার ভাষানুসারী কোনো না কোনো ঝুমুরের সন্ধান মিলতো। তা যখন মেলেনি তখন এক প্রকার জোর দিয়েই বলা যায় চর্যাপদগুলি ঝুমুরের নিদর্শন হতে পারে না। আর কুড়মালি ভাষার সঙ্গে চর্যার ভাষার কিছু কিছু মিল থাকলেও, যে যে কারণে অন্যান্য ভাষার দাবীকে অগ্রাহ্য করা হয় সেই কারণেই চর্যাপদগুলিকে কুড়মালির গ্রহণীয় নয়। তর্কের খাতিরে চর্যাপদগুলিকে এই ভাষার নিদর্শন হিসাবে ধরলেও, এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে চর্যাপদের পর কুড়মালি ভাষায় রচিত আজ পর্যন্ত কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেল না কেন ? কুড়মালি ভাষা চর্চার অতীত ঐতিহ্যের প্রবহমানধারাটি চর্যাকালের পর শুকিয়ে গেল কেন ? সমালোচকের ভাষায়, আসলে 'চর্যার ভাষা সম্পদ তাই একান্তই লৌকিক। সামাজিক উচ্চবর্ণের ভাষা ও রাজসভাশ্রিত ভাষা একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সীমায় বিচরণ করেছিল, কিন্তু চর্যা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময়ের জন্য রচিত হয় নি। তার আবেদন বৃহত্তম সমাজ-মানুষের নিকট এবং তাই সেই বৃহত্তর সমাজ-মানুষের ভাষাই এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই লৌকিক ভাষার সঙ্গে আছে লোক-জীবনের স্বীকৃতি। . . .চর্যার বহু উপমা-রূপক আজও আমাদের বাঙ্গালী জীবনে সত্য ও সজীব।'[১০] ধরে নেওয়া যায় বহু ভাষাভাষী আপামর বাঙালীর মধ্যে কুড়মি জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরাও সংপৃক্ত ছিল। চর্যার দুরূহ তত্ত্ব সমাজের সকল স্তরের মানুষ যাতে 'গুরু পুচ্ছিঅ' জানতে পারে, তার জন্যই 'সন্ধা ভাষা'র অবতারণা। আর, যদি কুড়মালি ভাষার চর্যাগুলি লেখা হয়ে থাকে, তাহলে সবারই বোধগম্য হয়ে উঠতো— 'গুরু পুচ্ছিঅ' জানার দরকার হতো না। অতএব চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সাধন সঙ্গীত, কুড়মালি ভাষার ঝুমুর নয়।

তথ্যসংকেত

১. শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ-'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৮৮।

২. মুখোপাধ্যায়, সুখময়— 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পরিচয় ও সময়', ভারতী বুক স্টল, কল-০৯, ১৯৮৭, পৃ. ১।

৩. শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ— 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৮৮।

৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময়— 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়', ভারতী বুক স্টল, কল-০৯, ১৯৮৭ বিস্তারিত আলোচনা ও কৌতূহল নিরসনের জন্য পৃ. ৩-১০ দ্রষ্টব্য।

৫. দ্র. 'বাংলা সাহিত্য-প্রসঙ্গ' (প্রথম পর্ব), পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৫, পৃ. ৫৪-৫৫।
ক) তদেব, পৃ. ৫৭, খ) তদেব, পৃ. ৫৪, গ) তদেব, পৃ. ৫৭।

৬. 'বঙ্গাল' লৌকিক রাগটি যে আদিবাসী সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট রাগে উন্নীত হয়ে উঠেছিল, তা পন্ডিতেরা বিশ্বাসর করেন। ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যার ৯৩ পৃষ্ঠায় 'বাঙ্গালী রাগিণী' প্রবন্ধে এই রাগিণী সম্পর্কে শ্রী অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন— 'বাংলার আদিবাসীদের সংস্কৃতির আর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, আদিম কালের বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতের সৃষ্টিতে। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইল বঙ্গাল রাগিণী। ইহাতে সন্দেহ নাই যে ইহা বাংলাদেশের ভূমিজ রাগিণী। ইহার আদিরূপ কি ছিল, তাহা আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের আদিবাসীদের সঙ্গীতসৃষ্টির অকাট্য প্রমাণ বলিয়া ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি।'
দ্র. ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (৩য় খণ্ড)', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., 'বঙ্গাল রাগিণী' অংশ, পৃ. ১২২০-১২২১ থেকে গৃহীত।
ক) দ্র. মাহাত, কিরীটি— 'ঝুমুর ও চর্যাপদ', মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, পুরুলিয়া, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৭. সেন, নীলরতন— 'বাংলা সাহিত্য-প্রসঙ্গ' (প্রথম পর্ব), পরিবেশক : দে বুক স্টোর, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৫, পৃ. ৬৩।

৮. দ্র. 'চর্যাগীতি-পদাবলী', ২য় সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃ. ৭-৮।
ক) দ্র. কুমার, ড. মদনমোহন— 'বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা', চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৫-৬৪।

৯. দ্র. শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ— 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভাদ্র ১৩৮৮, 'পদকর্তাদের পরিচয়' অংশ, পৃ. ২১।

ক) তদেব, পৃ. ৩৪,

খ) তদেব, পৃ. ৩৪।

শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ— 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভাদ্র ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ থেকে গৃহীত।

মণ্ডল, শ্রী পঞ্চানন (সম্পা)— জয়দেব বিরচিত 'শ্রী শ্রী গীতগোবিন্দম্', অক্ষয় লাইব্রেরী, কল-৯, ২০১৫ থেকে গৃহীত।

গোস্বামী, ড. কৃষ্ণপদ (সম্পা)— বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে গৃহীত।

গ) দ্র. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পা)— 'বিদ্যাপতির পদাবলী', ভূমিকা অংশ। তালিকাটি গৃহীত হয়েছে— চক্রবর্তী, রমাকান্ত 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৩।

ঘ) দ্র. রাজ্যেশ্বর মিত্র (সম্পা), 'লোচন শর্মা বিরচিত— 'রাগতরঙ্গিনী', নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, গৃহীত—ঐ

ঙ) চক্রবর্তী, রমাকান্ত— 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৩।

চ) তদেব। পৃ. ১৫৩।

১০. দ্র. পোদ্দার, অরবিন্দ- 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ', উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলি-৭৩, ১৯৮১।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

ঝুমুর গানের বিকাশে সামন্ত রাজা-জমিদারদের ভূমিকা

ঠাকুরদাস মাহাতো

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক, সাংগীতিক ও সাহিত্যিক সম্পদ হল ঝুমুর। বিশেষ করে সাবেক মানভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম সন্নিহিত ঝাড়খণ্ডের রাচী-পাঁচ পরগণা, ধানবাদ, দেওঘর, ডুমকা ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, সরাইকেলা, সুন্দরগড় হল ঝুমুর গানের প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলের লোকসংগীতের মৌলিক ভিত্তি হল ঝুমুর। সুদুর অতীত থেকে বর্তমান কাল অবধি নানান বিবর্তনের পথ ধরে বিকশিত হয়েছে ঝুমুর গান। ঝুমুরের এই বিকাশের ধারাটিকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে— টাঁড়ঝুমুর > কাঁইড় (দাঁইড়) ঝুমুর > দরবারি ঝুমুর। আদি রসাত্মক গ্রামীণ মানুষের ঝুমুর 'হাঁকা' ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়েছে ঝুমুর গানে। গ্রাম্য আদিরস পরিণত হয়েছে অলংকার শাস্ত্রের 'শৃঙ্গার রসে'। আর এই বিবর্তনের ধারায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অষ্টাদশ-উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এই অঞ্চলের সামন্ত রাজা-জমিদাররা।

এই অঞ্চলের রাজা-মহারাজাদের দরবার একসময় মুখরিত হয়ে উঠত ঝুমুর গানের সুরে সুরে। মানভূমের বিভিন্ন রাজা জমিদারের আসরে বা বৈঠকে শোনা যেত ধ্রুপদী দরবারি ঝুমুর। তাঁদের আগ্রহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় জড়ো হয়েছেন একের পর এক প্রতিভাবান ঝুমুর কবি ও শিল্পী— "সিল্লি, বাগমুন্ডি, কাশিপুর, বেগুনকোদর, বীরডি, গোবরখুঁটি প্রভৃতি রাজন্যবর্গ মাসোহারা দিয়ে ঝুমুরিয়া বা কবিদের সসম্মানে রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন।"[১] এমনকি রাজপরিবার থেকেও উঠে এসেছেন ঝুমুর কবি ও শিল্পী। রাজা মহারাজা ছাড়াও জমিদার, মানকি, মাহাত, ঘাটোয়াল, মুড়া প্রমুখ গ্রামীণ মোড়লরা ছিলেন ঝুমুর গানের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। সে সময় সিল্লী, পাতকুম, বাঘমুন্ডি, তামাড়, ঝরিয়া, জামতাড়া, পঞ্চকোট প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্ত রাজা মহারাজা, জমিদারেরা ঝুমুরের কদর করতেন এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই সমস্ত সামন্ত রাজা-জমিদার ও

তাঁদের আশ্রিত বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ধন্য শিল্পী-কবিদের পরিচয় ও তাঁদের অবদানের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে।

ঝুমুরের বিকাশের পর্যায় গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে— টাঁইড় ঝুমুর থেকে দাঁইড় ঝুমুরে এবং সেখান থেকে দরবারি ঝুমুরে। অর্থাৎ একক ব্যক্তি থেকে সামাজিক আখড়ায় সমবেত মানুষের গানে এবং সবশেষে রাজার দরবারে উত্তরণ। সেখানে মার্জিত হয়ে আবার আপামর রসিক মানুষের হৃদয়ে। গায়নের দিক থেকে ঝুমুর হাঁকা থেকে ঝুমুর গাওয়া। আদি রস থেকে শৃঙ্গার রসে পরিণতি। আদিতে আকার ছিল দুই চরণের। সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে ৪, ৬, ৮, ১০ বা আরো বেশি চরণ বিশিষ্ট ঝুমুর রচিত হয়েছে। এই রূপান্তর সম্পর্কে বিশিষ্ট ঝুমুর কবি, শিল্পী ও গবেষক হারাধন মাহাত মহাশয়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়— "এই অবধি যেটুকু জানা গেছে তাতে বলা যায় ঝুমুরের এরূপ পরিবর্তনের অর্থাৎ তার ক্ষুদ্র অবয়ব দুই ছত্রের খণ্ড পদের রূপের পরিবর্তে ভণিতা যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পদের রূপদানের জনক মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি।"[২] তিনি আরো বলেছেন— "বিদ্যাপতির প্রথম জীবনে রচিত লৌকিক রসের পদগুলি সবই ঝুমুর।"[৩] পরবর্তীকালে "প্রান্তিক বাংলার বৈঠকী ঝুমুর বিদ্যাপতি প্রবর্তিত মৈথিল রীতিকে গ্রহণ করে বিশেষ মাধুর্য আহরণ করেছে।"[৪] বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে ঝুমুরের আদি রূপ পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর গানের ধারায় রচিত।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারক ও সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ বসন্ত রঞ্জন রায় বলেছেন— "এসব গান ঝুমুর, এই ধরনের বহু গান বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় গাওয়া হয়।"[৫] যাইহোক বিদ্যাপতিকে ঝুমুর রচয়িতা ধরলে ঝুমুরের প্রাচীনতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মিথিলার রাজা শিব সিংহের নাম করতে হয়। কেননা বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজ সভাকবি এবং মিথিলার একাধিক রাজা ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। যাইহোক আমরা মূলতঃ সাবেক মানুভূম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সামন্ত রাজাদের অবদানের উপরই আলোকপাত করতে চাই।

ঝুমুর গান সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালকে ঝুমুর গবেষক শ্রদ্ধেয় গিরীশ মহন্ত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

১. আদি যুগ— ঝুমুরের সৃষ্টিকাল থেকে ১৭৫০ খ্রি. পর্যন্ত।

২. মধ্যযুগ— ১৭৫০-১৮৫০ খ্রি.

৩. কাব্যযুগ বা স্বর্ণযুগ— ১৮৫০-১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত এবং

৪. আধুনিক যুগ বা সবুজ যুগ— ১৯৫০ খ্রি. পরবর্তীকাল।

আসলে, তিনি মধ্যযুগকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন। ১৭৫০ খ্রি. থেকে ১৯৫০ খ্রি.

পর্যন্ত পুরো সময়কালকেই ঝুমুরের মধ্যকাল ধরা যেতে পারে। এই সময়কালে এই অঞ্চলে সমাজ জীবনে মোটামুটি স্থিরতা ছিল। এই সময়কালে মানভূম তথা জঙ্গলমহলে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার বিস্তার ঘটে। অধিকাংশ সামন্ত রাজা-জমিদারেরা বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় নিজেদের দীক্ষিত করেন। এই সূত্রেই লৌকিক ঝুমুরের পথ ধরে রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক দরবারি ঝুমুরের বিস্তার ঘটে। সমাজ জীবনের গান উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের রূপ ধরে রাজদরবারে পৌঁছাল। এই অঞ্চলের সামন্ত রাজা-জমিদারেরা ঝুমুর ও অন্যান্য সঙ্গীত ও নাচের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তরিকভাবেই এগিয়ে এলেন। ফলে ঝুমুর কবি-শিল্পীদের অনেকেই বিভিন্ন রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এক-একটি রাজপরিবারে আমন্ত্রিত ঝুমুর গায়কদের গায়কী কণ্ঠ, বিষয়বস্তু সমস্তই ছিল স্বতন্ত্র। এক একটি অঞ্চলকে ঘিরে এক একটি ঘরানা তৈরী হয়। যেমন পাতকুম্যা, তামাড়িয়া বা পাঁচপরগণিয়া, সিল্লিয়াড়ি, বাঘমুড়িয়া, বরাহভূঞা, নাগপুরিয়া ইত্যাদি। এই নানান ঘরানার দরবারি ঝুমুর রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে রেখেছিল। রাজা-জমিদারদের আসর অনুযায়ীও ঝুমুরের নানান বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন— বৈঠকী, জমিদারী, নাচনী শালিয়া ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবোধ বসু রায় বলেছেন— "লোকনৃত্য, লোকগীতিকে আভিজাত্য দিতে একসময় সামন্ত রাজারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই করেই এসেছে ভণিতাযুক্ত তাত্ত্বিক, সাংকেতিক, বৈঠকী, পৌরাণিক পালা ঝুমুর, ভাদুপালা, ছো-নাচ, দরবারি নাচনী নাচ।"[৬]

রাজা মহারাজাদের উৎসাহে রচিত হয়েছে পালাকীর্তনের ধাঁচে পালা ঝুমুর। এছাড়াও যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, ন্যায়-অন্যায়—এসব বিষয়ও রাজাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ফলে বিভিন্ন রকম পুরাণ ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ঝুমুর কবি-গায়কেরা পুরাণের বিভিন্ন জনপ্রিয় কাব্যকথাকে কাহিনি পালার রূপ দিয়ে সর্বসাধারণের করে তুলেছিলেন। মানুষ ও দেবতা এখানে একাকার হয়ে উঠেছেন। রাজা-জমিদারেরা রাতের পর রাত সেই অনিঃশেষ পালাগানের রসোপলব্ধি করতেন। সাধারণ মানুষও ঝুমুরের কথায় ও সুরে মাতোয়ারা হয়ে উঠত। আমরা এইসব পৃষ্ঠপোষক সামন্তরাজা ও তাঁদের আনুকূল্য পাওয়া কবিদের পরিচয় ও অবদানকে ক্ষুদ্র পরিসরে স্মরণ করতে পারি।

আদিকাল থেকেই সিল্লী হল ঝুমুরগানের এক প্রসিদ্ধ পীঠস্থান— "সিল্লীর রাজবাড়ী ঝুমুরের এক মস্ত বড় আড়ৎ"।[৭] এই অঞ্চলের জনজীবনে বরাবরই ঝুমুরের প্রভাব অপরিসীম। এখানের পরমার বংশীয় রাজপুত রাজবংশের রাজা পৃথ্বিনাথ সিংহের ছোট রানীর তৃতীয় পুত্র বিনন্দ সিংহ ছিলেন ঝুমুরের একজন প্রথিতযশা কবি ও শিল্পী। তিনি কেবল পাঁচ পরগণার ঝুমুর রসিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্থানীয় সংস্কৃতির ও লোকগীতির

অদ্বিতীয় সংস্থাপক।' সমগ্র রাঁচী, মানভূম, সিংভূম, হাজারিবাগ ব্যাপী ঝুমুরিয়া বিনন্দ সিংহ-এর নাম জানে এবং তাঁর গান গায়। তিনি বহু ঝুমুর রচনা করেছিলেন। অকৃতদার বিনন্দ সিংহ বৈষ্ণব ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন— "যে ব্যক্তি রসিক সুজন হয় সে অবশ্যই অন্তিম কালে কৃষ্ণদর্শন লাভ করে। ভগবৎ প্রেমে আত্মোৎসর্গ করলে একদিন না একদিন পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন ঘটবেই।" তাঁর রচিত প্রেমমূলক ঝুমুর গানে এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে— "বিনন্দ সিংহ কয়, যে জন রসিক হয়, অবশেষে দরশন পায়।" মূলত বিনন্দ সিংহ-এর মধ্য দিয়ে যথার্থ দরবারি ঝুমুরের প্রতিষ্ঠা। যে সময় ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে সভ্যতার সূর্যালোক সেভাবে পৌঁছায়নি, সেই সময় বিনন্দ সিংহ নিজের সভ্যতা সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। স্থানীয় কুড়মালি— পাঁচ পরগণিয়া ভাষার সঙ্গে তৎসম-অর্ধতৎসম শব্দের সমাহারে তাঁর গান হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়, অতুলনীয়। লোক কবি বিনন্দ বা বিনন্দিয়া কেবল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুরই রচনা করেন নি, তিনি রামায়ণ আর ভাগবতের কাহিনি নিয়ে শ্রীরাম ও কৃষ্ণলীলামৃত পরিবেশন করেছেন ঝুমুরগীতে পাঁচ পরগণিয়া ভাষায়। তাঁর লেখা 'দধিসংবাদ পালা' ঝুমুর এখনো বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামচন্দ্রের পুরুষোত্তম রূপটি তাঁর ঝুমুরে প্রকাশ করেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। ভাব, ভাষা, তাল, রস, প্রেম বৈচিত্র্য যেভাবে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে আজও অমলিন করে রেখেছে তা তাঁর অমর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। ছোটনাগপুরের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর গায়কী পদ্ধতিটিই ঝুমুরের ইতিহাসে সিল্লিয়াড়ি ঘরানা রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই বংশেরই উত্তরপুরুষ রাজা শ্রী উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহদেও ঝুমুরের সিল্লিয়াড়ি ঘরানাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনিও কম রসিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঝুমুরের এক বড় ওস্তাদ। মাদলে পাখোয়াজের আওয়াজ তুলতে পারতেন। তাঁর অমর কৃতিত্ব হল তাঁর দুই পূর্বপুরুষ বিনন্দ সিংহ ও গৌরাঙ্গ সিংহ রচিত ঝুমুর সংগ্রহ করা এবং 'আদি ঝুমুর সংগীত' নামে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত করে প্রকাশ করা। এছাড়াও দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সাত বছর পরিশ্রম করে তিনি রচনা করেছিলেন 'ছোটনাগপুরের তালমঞ্জরী' নামে ঝুমুরের একতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচপরগণিয়া ভাষাতে লেখা। পরবর্তীকালে 'ছত্রাক' পত্রিকায় 'তালমঞ্জরী'র বাংলা তর্জমা ধারাবাহিকভাবে (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা থেকে ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

বিশ শতকের আটের দশকে রাজত্ব না থাকা রাজা উত্তরপুরুষ বীরেন্দ্র সিংহ 'ছত্রাক'কে সঙ্গে নিয়ে ঝুমুর বিষয়ে এক আন্দোলনে সামিল হন। রাজা উপেন্দ্রনাথের সময়েই জমিদারী লোপ পেয়েছিল। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম বীরেন্দ্রনাথ কখনো রাজা হন নি। তবে আমজনতা

রাজা বলেই ডাকত। তিনিও নাচ গানের নামে পাগল ছিলেন। 'ছত্রাক' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক সুবোধ বসুরায় এই পরমার বংশীয় রাজা বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন— "জালি গেঞ্জি আর সিল্কের লুঙ্গি পরনে। চোখ চেটিয়ে গেল, যেন রূপকথার রাজপুত্তুর। গা দিয়ে রঙ ফেটে পড়ছে। টিকালো নাক, টানা চোখ। চাহনিটা অদ্ভুত, শিশুর মতো কৌতুক মাখা, আর বাঘের মতো জ্বলজ্বলে। গলায় সোনার হার, পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা।"[৮] তাঁর বৈঠকখানাটিও তাঁর সঙ্গীত সাধনার সাক্ষর বহন করে— "দেয়ালের পাশে তানপুরা, পাখোয়াজ, ডুগি তবলা, মাদল, হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, ঝাঁঝর, ধামসা, শিঙা, ঘুঙ্গুর। মাঝ বরাবর বড় একটা চৌকি। চাদর, তাকিয়া। প্রকাণ্ড এক বাঘের ছাল দেয়াল থেকে নেমে এসে তার উপর বিছানো।"[৯] ঝুমুর বিলাসী বীরেন্দ্রনাথ 'গুন গুন' করে মনের আনন্দে গাইতেন, নাচতেন যেন আবেশে।' রাজবাড়িতে নিয়মিত ঝুমুরের আসর বসাতেন। আর ঝুমুরের আসর বসলেই রাজবাড়িতে বন্দী আত্মা যেন স্বাধীন হয়ে উঠত। আভিজাত্যের খোলস থেকে বেরিয়ে ঝুমুরিয়া, নাচনি, বাজনদারদের সঙ্গে হাসি মস্করায় মেতে উঠতেন। খাঁটি পাঁচ পরগণিয়া বোলিতে বলে উঠতেন— "ইহা সচ্চা ঝুমুর, দেখ চরি করি ময় ভাদরিয়া গাঁউ।"[১০] ঝুমুরের রসিক এই 'রাজা সাহেব' ঝুমুর প্রসঙ্গে আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগ্ন হয়ে যেতেন। অধ্যাপক সুবোধ বাবুর সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে টানা রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত ঝুমুর নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অসাধারণ 'সাধা', 'মিষ্টি' গলায় ঝুমুর গানও গেয়ে শুনিয়েছিলেন।[১১] তিনি নিজে যেমন ঝুমুরের রসিক ছিলেন, তেমনি যাঁরা ঝুমুরের চর্চা করতেন, ঝুমুর নিয়ে ভাবতেন, ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাঁদেরও তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন। কোন ঝুমুরের আসরে আমন্ত্রিত হয়ে যাবেন বলে কথা দেওয়া থাকলে কখনো কথার খেলাপ করেন নি। ডাকাতদের দ্বারা আহত হয়ে 'কাটা গোড়ালি, হাঁটুর উপর মোটা ব্যান্ডেজ এবং পাঁজরার দগ্‌দগে ঘা' নিয়েও নিজে বাইক চালিয়ে পৌঁছে যান ঝুমুরের আসরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সেখানে আবেগ ধরে না রাখতে পেরে অসুস্থ শরীরেও নাচ করতে নেমে পড়েন আসরে। একবার পুরুলিয়া শহরে ছত্রাক পত্রিকার উদ্যোগে কবি-সাহিত্যিক সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নাচ-গানের আসরে তিনি আমন্ত্রিত হন। রাতে আসার সময় পথে গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। নিরুপায় হয়ে রাতের অন্ধকারে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর মালবাহী ট্রাক ধরে ভোর তিনটায় পৌঁছান অনুষ্ঠানের আয়োজক ছত্রাকের সম্পাদক সুবোধ বাবুর নডিহার বাড়িতে। জানতেন ততক্ষণে নাচগানের আসর শেষ হয়ে যাবে। তবুও এসে পৌঁছেছিলেন, কেন না— 'কথা দেয়া ছিল।''[১১] আসলে ঝুমুরের রসে যারা একবার ডুবেছেন তাঁদের আর নিষ্কৃতি নেই। বীরেন্দ্রনাথও তাতেই মজেছিলেন।

ঝুমুর গানের অন্যতম পীঠস্থান হল বাঘমুন্ডি। এই অঞ্চলের ঝুমুর নিজের স্বাতন্ত্র্যের গুণেই 'বাঘমুড়িয়া' ঘরানায় নিজেকে চিহ্নিত করেছে। কয়েক শতাব্দী জুড়ে বহুবিখ্যাত ঝুমুর শিল্পী এই অঞ্চলে জন্মেছেন কিংবা এসেছেন। বাঘমুন্ডির সামন্ত রাজা-জমিদারদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোকতা ও অংশগ্রহণে এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ্বনিত হয়ে চলেছে ঝুমুরের সুর। ভণিতার যুগের (১৮শ শতাব্দী) আদিতম ঝুমুর কবি হিসেবে স্বীকৃত বরজুরাম দাস (তাঁতি) জন্মেছিলেন এই বাঘমুন্ডি অঞ্চলেই, কালিমাটির সারজম হাতু গ্রামে। সহজিয়া ধর্মে দীক্ষিত এই ঝুমুর শিল্পী সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের ঝুমুর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচিত ঝুমুরগুলি 'চর্যাপদের ন্যায় সাংকেতিক'। কথিত আছে যে, তিনি হলেন নাচনি শালিয়া ঝুমুর ও নাচনি-নাচের প্রবর্তক। তিনি একবার— 'হেঁসলার রাজবাড়িতে ঝুমুর গাওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেখানে রাজার রক্ষিতার মেয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সেজে নাচ পরিবেশন করেন।' সেটাই হল নাচনি নাচের শুরু।

বাঘমুন্ডি রাজঘরানার সম্বর্ধিত আরেকজন বিশিষ্ট ঝুমুর কবি ও শিল্পী হলেন শ্রী গৌরাঙ্গ সিংহ। ইনি সিল্লীর রাজপরিবারের সন্তান এবং বিনন্দ সিংহের সমসাময়িক। দরবারি ঝুমুরের অন্যতম এই শিল্পী বাঘমুন্ডির রাজার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ঝুমুরের ছন্দ ও সুর নিয়ে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর ঝুমুরের কথা ও সুরের শক্তির প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়। বাঘমুন্ডি ছিল কাশীপুরের মহারাজার অধীনে। একবার বাঘমুন্ডি জমিদারীর খাজনা বাকি থাকায় নিলামে ওঠে। তখন গরুড়নারায়ণ সিংহ ছিলেন কাশীপুরের মহারাজা। বাঘমুন্ডির রাজা সুহৃদ গৌরাঙ্গ সিংহকে পাঠালেন কাশীপুরে, জমিদারীর নিলাম রদ করার অনুরোধ জানিয়ে। গৌরাঙ্গ সিংহ ঝুমুর গানে বন্দনা করলেন মহারাজার— 'এই গরুড়নারায়ণ, তব পদে শরণাগত'। এক ঝুমুরেই কিস্তিমাত। মহারাজ খুশি হয়ে বাঘমুন্ডিকে নিলাম থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। খাজনা মুকুব হল। অসহায় এক রাজা আস্থা রেখেছিলেন তাঁর প্রিয় ঝুমুর শিল্পীর উপর। আর এক ঝুমুরের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক রাজা মান রেখে ছিলেন সেই ঝুমুর শিল্পীর ও তাঁর ঝুমুরের। ঝুমুর দেশের রাজা-জমিদারদের ঝুমুরের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা এতেই প্রমাণিত হয়। এই ঘটনা ঝুমুর গানের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।

ঝুমুরের ইতিহাসে বাঘমুন্ডির যে সামন্ত রাজার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি হলেন রাজা মদনমোহন সিংহদেও। উনিশ-বিশ শতকের এই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঘমুন্ডির ছোনাচ ও ঝুমুর দুটোরই প্রসার ঘটেছে। ছো-শিল্পী এবং ঝুমুর শিল্পী (নাচনি নাচসহ) দুয়েরই সমান পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ছো-শিল্পীদের প্রতি বছর নতুন নতুন পালা তৈরীতে উৎসাহ দিতেন— 'আগে সুর পরে তাল, শেষে নাচ। মদনমোদনের কড়া

নজর ছিল এদিকে।'[১৩] রাজা মদনমোহন নিজে অনেক ঝুমুর লিখেছেন। বৃন্দাবন সিং-কে দিয়েও অনেক ঝুমুর লিখিয়েছেন। তাঁর ছো-ঝুমুরের প্রীতির কথা বলছেন খুদিডির শ্রীসুচাঁদ মাহাত— "রাজা মদনমোহনের এক কথা— পুরা করা চাই। নাই-ত বার কর। যেমন ইন্দ্ররাজ তেমনি মদনমোহন। সারা রাত নাই উঠতেন আসর ছা'ড়ে। উনার হুকুম ছিল ছ'টা করে নাগ্‌ড়া বাজবে, লোক যদি নাউ আসতে পারে ত ঘুমাই ঘুমাই শুনবেন।"[১৪]

রাজা মদনমোহনের সভাকবি ছিলেন ঝুমুর কবি ও শিল্পী জগৎ কবিরাজ। আসল নাম জগৎচন্দ্র সেনগুপ্ত। বৈদ্য বংশের কবিরাজি চিকিৎসকের সন্তান। নিজেও ছিলেন পেশায় কবিরাজি চিকিৎসক। তবে স্বনাম ধন্য হয়ে উঠেছিলেন ঝুমুরের জন্যই। একবার জগৎচন্দ্র ঝুমুরের তীর্থস্থান বাঘমুন্ডির রাজসভায় গিয়ে রাজা মদনমোহনকে রামায়ণ পাঠ করে শোনান। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে রাজবৈদ্য এবং সভাকবি হিসেবে নিযুক্ত করেন। জগৎ কবিরাজ ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চা করতেন। তাঁর ছিল অসাধারণ গলা। বলা হয়— 'যেমন হারমোনিয়ামের গৎ, তেমনি কবি জগৎ।' তাঁর সমসাময়িক আরেক কিংবদন্তী ঝুমুর কবি ও শিল্পী রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি বলেছিলেন 'ধন্য কবি জগৎ। জগতের ঝুমুর শুনলেই আমার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের উদয় হয়।' শিল্পী কবি জগতের সমাদর ছিল অন্যান্য রাজা-জমিদারের সভাতেও। ঝালদা, জয়পুর, বেগুনকোদর, তামাড় প্রভৃতি জমিদার বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। মানবাজারের হিকিম রাজা তাঁর ঝুমুর শুনে তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। (তাঁর জন্মও মানবাজারের পলমি গ্রামে, ১২৬৪ বঙ্গাব্দে)। পণ্ডিত ও প্রতিভাধর এই শিল্পী বাংলা ও কুড়মালি উভয় ভাষাতেই বহু ঝুমুর ও পালা ঝুমুর লিখেছিলেন। তাঁর রচিত একটি জনপ্রিয় পালা হল 'জলসংবাদ'। তবে ছোট ছোট ঝুমুর রচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর শব্দ চয়ন, ছন্দের ব্যবহার ও অলংকার প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা ও কুড়মালি শব্দের সঙ্গে সাধুভাষার প্রয়োগে তাঁর ঝুমুরে একইসঙ্গে ছন্দ লালিত্য ও ভাষা মাধুর্য ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষার অন্য একটি বিশেষ দিক হল দ্ব্যর্থক শব্দ প্রয়োগ ও অনুপ্রাস প্রয়োগ। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"চলহুঁ ধনি মঞ্জুতর কুঞ্জমাঝে
যথা অতনু অনুগঞ্জিত সুর সরাজরাজে।
নীল নীচোল কর তরল পবনাকুলে
অল্প করি দরশাঅবি বদন কমলে।
… … …
নবীন কিশলয় রচিত কুঞ্জ সদনে,

শুতবি শ্যাম কোমল উঠে হসিত আননে।
স্বপনে প্রাণ বঁধূয়া কহি খজবি শেষে
জগতে নেহি পাঠায়বি আনহি কাজে।"

বলাবাহুল্য, তাঁর প্রতিভার এই স্ফুরণে যথাযথ উৎসাহ দিয়েছিলেন ও সহযোগিতা করেছিলেন সমসাময়িক সামন্ত রাজা জমিদারেরা। সুধী ব্যক্তিবর্গ, জমিদারবর্গ ও জনাসাধারণ সকলেই সমভাবে তাঁর ঝুমুরের সমাদর করেছিলেন এবং এখনো ঝুমুর গায়কেরা তাঁর ঝুমুর সযত্নে সগৌরবে গেয়ে থাকেন।

রাজা মোদনমোহনের আশ্রিত অপর একজন বিশিষ্ট কবি ও ঝুমুরিয়া হলেন দুর্যোধন দাস। বাগমুন্ডির শ্যামনগর গ্রামে এক গোস্বামী পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম। পিতা শত্রুঘ্ন দাস রাজা বিচন্দিত সিং-এর দেওয়ান ছিলেন এবং সেই সুবাদে নিজেও একজন বড় জমিদার ছিলেন। দুর্যোধন ছিলেন স্বভাব কবি। যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে ঝুমুর গান রচনা করতে পারতেন। রামায়ণ গানও খুব ভালো করতেন। অসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী দুর্যোধনের ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্য হল— ভাবের স্বচ্ছতা, অনায়াস প্রকাশ ভঙ্গি এবং হৃদয় কাড়া আবেগ। নিজের জমিদারি এলাকা পলাশডি ও হেসালঙ গ্রামে ছিল তাঁর ঝুমুরের আখড়া। একটি নাচনিও রেখেছিলেন। রোজ সেখানে ঝুমুরের আসর বসত। বাঘমুন্ডি ও পাতকুমের রাজদরবারে প্রায়ই তাঁর ডাক পড়ত। তিনি রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সঙ্গেও ঢোল বাজিয়ে সঙ্গত করতেন। (দুর্যোধন রামকৃষ্ণের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন)। তাঁর সমকালে বাঘমুন্ডি তথা সমগ্র ঝুমুর দেশে যে তিনজন প্রবাদপ্রতিম ঝুমুর শিল্পী ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন তিনি। অন্য দুজন বীরভির রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি ও রসিক শ্রেষ্ঠ কাঁড়দার অজমৎ শেখ। লোক প্রবাদেই বলা হয়েছে— "রামকৃষ্ণের গলা, দুর্যোধনের বলা, অজমতের চলা।"

রাজা মদনমোহনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন রসিক শ্রেষ্ঠ অজমৎ শেখ। বলা যায় বাঘমুন্ডির রাসমেলার মধ্যমণি ছিলেন তিনি। ঝুমুরিয়া রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অজমৎ শেখ। রাজা মদনমোহন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সুকৌশলে জিইয়ে রেখেছিলেন এবং ঝুমুর ও নাচনি নাচের মাদকতা, উৎকর্ষতা ও জনপ্রিয়তাকে চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে এই নাচ ছিল জমিদারি চালের নাচনি নাচ। যার মূল বিষয় হল কৃষ্ণলীলা। এতে 'রস্‌ক্যা' হলেন নাগর-কৃষ্ণ, প্রধানা নাচনি রাধা ও অন্যান্য নাচনিরা সখি। রসিক কৃষ্ণই হলেন আসরের মূল আকর্ষণীয় চরিত্র, তিনিই প্রেরণা ও নাচের সূত্রধর। নাচনিদের সেই নাচায়, কিন্তু ইঙ্গিতে, ভাবে, ভঙ্গীতে। বাঘমুন্ডির রাজবাড়ির আসরে একাদি ক্রমে সাতদিন ধরে অজমতের নাচ হত। এরকম এক আসরেই রামকৃষ্ণ

গাঙ্গুলির সঙ্গে অজমৎ শেখের কথা কাটাকাটি হয় এবং পরস্পর চির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন। অজমতের মতো প্রতিভাই ধ্রুপদী গানের শিল্পী রামকৃষ্ণকে ঝুমুরের আসরে টেনে নামিয়েছিল। বার বার প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা— 'সুরে গাহে, রূপে নাচে'— অজমতের শ্রেষ্ঠত্ব নাচে, রামকৃষ্ণের গলায়। 'মাঠায় নিগৃহীত অজমৎ' তো 'রামকৃষ্ণ নিষ্প্রভ বাঘমুন্ডিতে।' রসিক শ্রেষ্ঠ অজমৎ ছিলেন নাচনি নাচের অপরাজেয় শিল্পী। চোখের চাউনি, মুখের হাসি এবং রুমাল চালনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। 'মাঝারি গড়ন, কোঁকড়ানো বাবরি চুল পেছনে ঝুলানো, সদাহাস্যময় মুখে পাগড়িবাঁধা অজমত শেখ এসে দাঁড়ালেই মনে হত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-নাগর।' অতি যত্নের সঙ্গে প্রায় ৪-৫ ঘণ্টা ধরে সময় নিয়ে তিনি পাগড়ি বাঁধতেন। এ হেন অজমতের সঙ্গে রাজা মদন মোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি জানা যায় একটি ঘটনা থেকে। "দীনা তাঁতির ঝুমুর— নাচ হচ্ছে বাগমুন্ডিতে। কিন্তু ব্যাপার কি ? অজমতের দেখা নেই, তাল দিতে পারছে না কোন রসক্যাই। ঘন ঘন লোক পাঠাচ্ছেন রাজা মদন মোদন। কিন্তু সেই একই জবাব বারে বারে; পাগড়ি বাঁধছে। শেষে এক নতুন নাচনি এসে তুলে নিল মাদল। আর, আশ্চর্য্য ব্যাপার, তালও লাগল। তাজ্জব হয়ে গেল জনতা, কালো হয়ে গেল মদন মোহনের মুখ। অশ্রাব্য গালি গালাজ দিয়ে বললেন, 'কোন লাট হয়েছে অজমৎ'। নতুন নাচনি তখন চুল খুলে ফেলে হাসতে হাসতে বলল— 'কেনে হুজুর, সেই সন্ধানেই তো নাচছি'। এমনি পরিহাস প্রিয়, এমনি কান্তিময় পুরুষ ছিল অজমৎ।'[১৫] যেমন রসিক রাজা তেমনি রসিক শিল্পী।

বাঘমুন্ডির রাজদরবারে সমাদৃত আরেক জন বিশিষ্ট ঝুমুরশিল্পী হলেন নরোত্তম সিংহ মানকি (১৮৭৫-১৯৫৮)। তিনি নরোত্তম দাস নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম ঝালদা তোড়াং-এর মানকি জমিদার বংশে। বাঘমুন্ডি রাজ ঘরানার মতো এই জমিদার বংশেরও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্য ছিল। কয়েক শত ঝুমুর ও বহু পালা ঝুমুরের স্রষ্টা নরোত্তম দাস ছিলেন অগাধ স্মৃতি শক্তির অধিকারী। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুরাণ বিষয়ে ছিল গভীর জ্ঞান। তাঁর রচিত কয়েকটি পালা ঝুমুর হল— জলসংবাদ, রাধাবিরহ, মুক্তলতা, নিঠুর কালা, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি। বিরহের ঝুমুর রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ঝুমুর কবি-শিল্পী কৃত্তিবাস কর্মকারের কথায়— "বিরহেতে নরোত্তমা ডালে পাতে ভাসে হে।" নরোত্তম বাঘমুন্ডির রাজ-দরবারের বিবরণ দিয়ে যে ঝুমুর রচনা করেছেন তাতে বাঘমুন্ডির রাজা মদনমোহনের কৃতিত্ব যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ঝুমুরের বিকাশে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পেয়েছে—

"বাঘমুন্ডি রাজধানী আইলাম পত্রজানি
দেখিলাম অপূর্ব ঘটনা

গান বাদ্য অবিরত, নৃত্যকার করে নৃত্য
হেন সভা হয় না হবে না।
অপূর্ব মহিমা, দিতে নারি সীমা
যশেতে ভরিল ভুবন,
জন্মিয়া কীর্তি জগতে উৎপত্তি
কেউ তো করে না কখনো।
রং।। রাজন হে মনোরঞ্জন, ভূপতি মদনমোহন।"

ঝুমুর ছাড়াও তিনি অন্যান্য গীত— যেমন বিয়ের গীত, নাটুয়া নাচের গান রচনা করেছিলেন। নিজে নাটুয়া ও ছো-নাচ নাচতেন। বৃন্দাবন সিং মানকি বলেছেন— 'ছো নৃত্যের প্রথম রূপকার নরোত্তম সিং মানকি। তিনি নাটুয়া নাচকে একটু নতুন রূপ দিয়েছিলেন। শাস্ত্রের উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে ঝুমুর রচনা করে তিনিই প্রথম ছয়টি নাটুয়ার একত্র নাচ দেখান এবং নাম দেন ছ-নাচ। যেহেতু এই নাচে ছয়টি নাটুয়া থাকত।'

এইভাবেই দেখা যায় বাঘমুন্ডির রাজা-জমিদারেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছো-ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকতা করার ফলে বামমুন্ডি হয়ে উঠেছে ছো-ঝুমুরের পীঠস্থান। এই পীঠস্থানেই পরবর্তীকালে গৌর সিং, রুহিদাস গরাই, রজনী ঠাকুর, আনন্দ সিং, হৃদয়নাথ সিং প্রমুখ ঝুমুর সাধকেরা ঝুমুরের 'বাঘমুড়িয়া' ঘরানাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং অত্যুচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানভূমের ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট ঘরানা হল 'পাতকুম্যা' ঘরানা। ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহন্ত ঝুমুরের কাব্যযুগ বা স্বর্ণযুগ বলে যে সময়কাল (১৮৫০-১৯৫০) চিহ্নিত করেছেন, সেই সময় পাতকুম ছিল ঝুমুরের স্বর্ণখনি। ইচাগড়-পাতকুম রাজার প্রত্যক্ষ মদত পেয়েছেন পাতকুম ঘরানার পাঁচ কবি— রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, দুর্যোধন দাস, উদয় কবি, দীনা তাঁতি ও বিনোদ ঘোষাল। এঁদের মধ্যমণি ছিলেন বীরডির রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি (১২৮৮-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। তিনি নিজেও ছিলেন পাতকুম ইচাগড় রাজার অধীনে জমিদার। প্রথম জীবনে ছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাধক ও শিল্পী। অসাধারণ গলার অধিকারী এই শিল্পীর বিভিন্ন রাজসভায় কদর ছিল ধ্রুপদী সঙ্গীতের গায়ক হিসেবেই। কিন্তু পর পর দুটি ঘটনা তাঁর সঙ্গীত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একবার সেরাইকেলার রাজবাড়িতে ওস্তাদি গান গাইছেন। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছেন। হঠাৎ বেজে উঠল অজমত শেখের নাচনি নাচের ঢোল ধামসার আওয়াজ। শ্রোতার দল ছুটল সেদিকে। ঝুমুর নাচের আকর্ষণের কাছে হার মানল তাঁর ধ্রুপদী সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ভাব। আরেকবার এসেছেন ইচাগড়ের রাজসভায় ধ্রুপদী

গান শোনাতে। এসে শুনতে হল অপেক্ষা করতে হবে, কেননা— 'নাচনি নাচ হচ্ছে। তাঁর শিল্পী সত্ত্বা আহত হল। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে তিনি চলে যান এবং প্রতিজ্ঞা করেন ঝুমুরিয়া হয়েই ফিরে আসবেন ইচাগড়ে। দেখাবেন নাচনি নাচ। সুরেলা মিষ্ট গলার অধিকারী প্রতিভাধর এই কবি শিল্পী সে কথা রেখেছিলেন। নিজের জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের বলে কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তী ঝুমুর শিল্পী এবং সকলের মধ্যমণি। অলংকৃত করেছিলেন ইচাগড় রাজার সভাকবির পদ। বলতেন "আমি পাতকুমের রাজার বেতনভোগী ব্রাহ্মণ।"

রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির জীবিতাবস্থায় সন্নিহিত অঞ্চলের প্রায় সব কবি-শিল্পীরই যাতায়াত ছিল তাঁর বীরডির গ্রামে। নতুন ঝুমুর রচনা, শোনানো এবং সংশোধন চলত। তিনি প্রত্যেককেই প্রশংসা করে উৎসাহিত করতেন। ঝুমুরের প্রত্যুত্তরে ঝুমুর রচিত হত। এইভাবেই ঝুমুরের একটি পরম্পরা গড়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির মতো গানের গলা মানভূমে আর কারো ছিল না। তাই তাঁর নাম প্রবাদে স্থান করে নেয়— 'অজমতের চলা, দুর্যোধনের বলা আর রামকৃষ্ণের গলা' কিংবা 'যেমন জৈষ্ঠ্যমাসে আম মিষ্ট, তেমনি ভাবে রামকিষ্ট।' কাশীপুর রাজবাড়িতেও রামকৃষ্ণের সমাদর ছিল। একবার কাশীপুর থেকে গান গেয়ে ফিরছেন। আদ্রা স্টেশনে হাওড়া চক্রধরপুর ট্রেন ধরবেন। ট্রেন এসে গিয়েছে, কিন্তু দলের লোকজন সবাই এসে পৌঁছান নি। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে রামকৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন ঝুমুর। রেলের গার্ড হুইসেল দিতে ভুলে গেলেন। গান শেষে যখন ট্রেন ছাড়ল তখন ১৫ মিনিট লেট। এই ঘটনায় প্রমাণ করে ঝুমুর শিল্পী হিসেবে তাঁর অসাধারণত্ব।

পাতকুমের পঞ্চকবির অন্যতম কবি হলেন দীনা তাঁতি। পোষাকী নাম দীননাথ তন্তুবায়। পাতকুম পরগণার সিরাম গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। প্রতি বছর যোগ দিতেন ইটাগড়ের চতুর্মুখী মেলায়। পৌরাণিক, নির্গুন ও জীবনমুখী সব ধরণের ঝুমুর রচনাতে তিনি নিপুণ ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অবলীলায় তাৎক্ষণিক ঝুমুর রচনা করতে পারতেন। তাঁর রচনার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল ও লালিত্যপূর্ণ। তাঁর ঝুমুরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সুরের বৈচিত্র্য। একটি ঝুমুরেই একাধিক সুরের ব্যবহার রয়েছে। ফলে তাঁর ঝুমুরগুলি সুরে ও নৃত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাঁর রচিত গীতি কবিতাত্মক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঝুমুরগুলি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁর রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি পালা হল— অভিসার, মিলন, রাসলীলা ও বিরহ। এছাড়াও পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, পুতনা বধ ও নৌকাবিহার হল তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পালা ঝুমুর। প্রতিভাবান ও লোকপ্রিয় এই ঝুমুর কবি— শিল্পীও লোক প্রবাদে স্থান লাভ করে অমরত্ব লাভ করেছেন— "যেমন ফুলের মধ্যে হেনা, তেমনি মূলে আছে দীনা। ধন্য ধন্য দীনা, কি দিবি তার তুলনা।"

মানভূম তথা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে লোক সংস্কৃতির পীঠস্থান কাশীপুর রাজ ঘরানাকে বাদ দিলে চলে না। ঝুমুর গানের বিকাশেও তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। আর ঝুমুরের কথায় সর্বাগ্রে উঠে আসে ভবপ্রীতানন্দ ওঝার নাম (১৮৮৬-১৯৭০ খ্রি.)। ঝুমুরের এই স্বনামধন্য কবিকে প্রতিষ্ঠিত হতে সর্বাঙ্গীণভাবেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কাশীপুরের মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও। ভবপ্রীতার জন্ম বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘরের নিকট কুন্ডা গ্রামে। তাঁরা ছিলেন বৈদ্যনাথ ধামের পান্ডা এবং সেই সূত্রে কাশীপুর পঞ্চকোট রাজার রাজপান্ডা। এই পরিচয়ের সূত্রেই অল্প বয়সে পিতৃহারা অসহায় বালক ভবপ্রীতা মহারাজা জ্যোতিপ্রকাশ সিংহ দেও-এর বিশেষ রাজানুগ্রহ লাভ করেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ২০শে ফাল্গুন একটি পত্রে ভবপ্রীতা লিখেছেন— "মহামানবের প্রবল প্রতাপান্বিত, সদ্‌গুণাশয়, শরণাগত বৎসল, পরম উদার হৃদয়, পঞ্চকোট বীরেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রী শ্রী মহারাজাধিরাজ জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও বাহাদুর আমার দুরবস্থা দর্শন করুণাদ্রচিত্ত হইয়া আমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তিদান করিয়া, আমার অরণ্যবাস নিবারণ পূর্বক বৈদ্যনাথ ধামে দুই হাজার টাকার পোক্তা দালান খরিদ করিয়া বসবাসের জন্য আমায় দান করিয়াছেন। শ্রী শ্রী মান মহারাজ-বাহাদুর আমার প্রতি এই প্রকার কৃপা প্রকাশ না করিলে, অদ্যাবধি আমার জীবন রক্ষায় সংশয় ঘটিত, অতএব শ্রী শ্রী মহারাজ বাহাদুর আমার ভয় ত্রাতা এবং অন্নদাতা পিতাস্বরূপ।"[১৬]

পরবর্তীকালে অধ্যাপক সুধীর করণ মহাশয়কে বলেছিলেন— "মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, তা আমি কোনদিনই ভুলব না। বলতে গেলে, আমাকে শিবের সম্মান দিয়েছিলেন পঞ্চকোট মহারাজ। আমার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধুতাই নয়, দেওঘরে একটি বাসগৃহ ক্রয় করেও আমাকে দান করেছিলেন। এতো শুধু আমাকেই মর্যাদা দান করা নয়, ঝুমুর গানকে মর্যাদা দান করা।"[১৭] কখনো কখনো নিজেকে 'পঞ্চকোট রাজের আশ্রিত ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

কবি-শিল্পী ভবপ্রীতা ঝুমুর গানে মহারাজার কীর্তিকাহিনি লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—

"শ্রীজ্যোতি ভূপাল পরম দয়াল
কাশীপুর রাজেশ্বর হে।
রূপেতে মদন প্রতাপে তপন
শান্তিগুণে সুধাকর হে।।
রং।। রাজন জনরঞ্জন প্রভু-করুণা রস সাগর হে।"

কাশীপুর রাজবাড়ির বর্ণনায় লিখেছেন—

"ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী প্রায় কাশীপুর দেখা যায় গো
শ্রীরাজভবন চমৎকার—
চারুকারু কার্যময় কাঞ্চনে নির্মিত হয়
কত পুষ্পলতার আকার হে।
রং।। হেরি সুখ অপার।

ঝুমুর সংগীতের অবিস্মরণীয় শিল্পী-কবি ব্যক্তিত্ব ভবপ্রীতা মানভূমের লোকমুখে 'ভবপিতা'। আর পণ্ডিত সমালোচক তাঁকে ভূষিত করেছেন 'ঝুমুর সম্রাট' ও 'অভিনব বিদ্যাপতি' অভিধায়। ভবপ্রীতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বৃহৎ ঝুমর রসমঞ্জরী' গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ১০টি পালায় মোট ২২৭টি ঝুমুর স্থান পেয়েছে। এছাড়াও অসংখ্য ঝুমুর সর্বত্র লোকমুখে প্রচলিত আছে। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেকগুলি পালা ঝুমুরের মধ্যে কয়েকটি হল— 'অথ শ্রীরাধার দুর্জয় মানভঞ্জন পালা', 'অথ জল সংবাদ পালা', 'শ্রীরাধার বিরহ' ইত্যাদি। ভবপ্রীতার রাধা এক অসামান্য সৃষ্টি। তাঁর ঝুমুরে 'বহিরঙ্গের দিকে নজর বেশি, চরণগুলি তুলনায় ছোট, ছন্দচপল, ধ্বনির চেয়ে শব্দের ব্যঞ্জনা অধিক।'

ভবপ্রীতা জামতাড়ার রাজা শ্যামলাল সিং ও লক্ষ্মীপুরের ঘাটোয়াল রাজা প্রতাপ নারায়ণ এবং মহারাণীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তিনি নিজের মুখে সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন— "গুণীর সমাদর করতেন রাজা প্রতাপ নারায়ণ। আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আমার নামে দানপত্র লিখে দিলেন সাড়ে সাঁইত্রিশ বিঘা জমি। দিলেন স্বর্ণপদক। আমার দারিদ্র দূরীভূত হল। কৃতজ্ঞতার অবধি নেই আমার, রাজার কাছে।"[১৮]

ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও বিকাশে জামতাড়া, জয়পুর, বেগুনকোদর, সরাইকেলা প্রভৃতি স্থানের সামন্ত রাজা-জমিদারদের অনেক অবদান আছে। সংক্ষেপে সে কথা তুলে ধরে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানা যেতে পারে। ভবপ্রীতার মতো আরেক ঝুমুর শিল্পী চামু কর্মকার জামতাড়ার রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। চামুর গানে সন্তুষ্ট হয়ে জামতাড়ার মহারাজা শ্যামলাল সিং চামুকে দশ বিঘা জমি দান করেছিলেন। প্রবাদপ্রতীম এই ঝুমুরিয়ার ঝুমুরের সুর ও ছন্দের মূর্ছনায় নাকি গৃহস্থ ঘরের বৌ-মেয়েরা নাচনি বৃত্তি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হত। ফলে সে সময়ে সমাজপতিরা জামতাড়ার রাজার নিকট নালিশ জানিয়ে পুরো ডুমকা জেলায় তাঁর গান নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল। ঐ একই অভিযোগে ইংরাজ সরকারও তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। চামু রাজার শরণাপন্ন হলে রাজা তাঁকে নিজের রাজপ্রাসাদে বন্দী রাখেন এবং তাঁরই হস্তক্ষেপে চামু গ্রেফতারির পরোয়ানা

থেকে মুক্ত হন। সমকালীন শিল্পী ভবপ্রীতাও চামুর গুণগ্রাহী ছিলেন। চামু কাশীপুরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন। কাশীপুরের মহারাজা তাঁকে রাজদরবারে সমাদরে নিয়ে আসার জন্য পাইক পাঠাতেন। সারা ভাদ্র মাস ধরে চলত তাঁর ঝুমুর গানের আসর। চামুর নাচনি 'সমীরানা' একমাত্র নাচনি যিনি কাশীপুরের মহারানীদের অন্দরমহলে গান ও নাচ পরিবেশন করেছিলেন। মহারানী খুশি হয়ে 'সমী'কে হার প্রদান করেন। পরে অবশ্য চামুর আদেশে 'সমী' সেই হার রানীকে ফেরত দেন। সমগ্র মানভূমে চামু কর্মকার একজন জনপ্রিয় ঝুমুর শিল্পী ছিলেন এবং এখনো তাঁর গান শ্রদ্ধার সঙ্গে গাওয়া হয়।

জয়পুরের রাজা ভিক্ষাম্বর সিং দেও সঙ্গীতজ্ঞ ও ঝুমুর কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ভণিতায় নিজের নাম ছাড়াও পুত্র রঘুনন্দন ও হরিনন্দনের নাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত ঝুমুরের সংখ্যা তিন শতাধিক। অনেকগুলি পালা ঝুমুর রচনা করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য পালা হল 'রাসপালা'। উল্লেখ্য জয়পুরে রাজার উদ্যোগে রাসমেলা অনুষ্ঠিত হত, এখনো জনসাধারণের উদ্যোগে হয়। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'ঝুমুরিকা' নামে তাঁর রচিত ঝুমুরের সংকলন প্রকাশিত হয় কিরিটিভূষণ পাঠকের সম্পাদনায়।

বেগুনকোদর জমিদার বংশে জন্মেছিলেন প্রসিদ্ধ ঝুমুরকর্তা কানাই সিং। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনি অবলম্বনে তিনি অনেকগুলি পালা ঝুমুর রচনা করেছিলেন। যথা— 'নৌকা খন্ড', 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা', 'চান্দমাগা পালা', 'সুভদ্রাহরণ', 'সমুদ্রমন্থন', 'অভিসার মিলন', 'বনপর্ব', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' ও 'দুর্জয়মান'। তার রচিত পালাগুলির গঠন প্রশংসনীয়। উক্তি-প্রত্যুক্তি বেশ স্বাভাবিক এবং মাঝে মাঝে নাটকীয় মাধুর্য সমৃদ্ধ।

সরাইকেলার রাজবাড়িতেও ঝুমুরের বিশেষ কদর ছিল। রাজা ছিলেন ঝুমুরের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। রাজবাটিতে গুণীজনের কদর ছিল। বিশিষ্ট ঝুমুরিয়া জগন্নাথ মণ্ডল ওরফে বাউল দাস সেখানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। একবার দীনা তাঁতি রাজবাড়িতে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় নেন। সেখানে রাজাকে একটি ঝুমুর গেয়ে শোনান। রাজা তাঁর কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কম্বল, টাকা পয়সা পাথেয় হিসেবে দিয়ে পুরস্কৃত করেন। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলিও সরাইকেলার রাজদরবারে গান গেয়েছেন।

এইভাবেই দেখা যায় ঝুমুরের মধ্যকালে (১৭৫০-১৯৫০ খ্রি.) সামন্ত রাজা-জমিদারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও উৎসাহে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ঝুমুরের নানা বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে দরবারি ঝুমুরের নানান ঘরানা। রাজা মহারাজাদের উৎসাহে ও আগ্রহে রচিত হয়েছে পালাকীর্তনের ধাঁচে পালা ঝুমুর। বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কবি-গায়কেরা পুরাণের বিভিন্ন কাহিনিকে পালার রূপ দিয়ে সর্বসাধারণের করে তুলেছেন।

বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথিত 'লোকশিক্ষা'য় এক বড় ভূমিকা পালন করেছেন ঝুমুর কবি-শিল্পীরা। রাজা-প্রজা-জমিদার— সকলেই ঝুমুরের সুরে ভেসে একাকার হয়েছেন। রাজা থেকে ভিখারি, হিন্দু-মুসলমান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রগাঢ় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল ঝুমুর। ঝুমুর দেশ হয়েছে মহিমান্বিত। ঝুমুর হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের প্রাণের আবেগ, প্রাণের ভাষা, প্রাণের সামগ্রী। শিক্ষিত, পন্ডিত, নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত মানুষ মনের মধ্যে ঝুমুরের মাধ্যমে একাত্মতা গড়ে তুলেছিল। সামাজিক তথা মানবিক মূল্যবোধগুলি সর্বস্তরের মানুষের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল ঝুমুর। তাই বলা যায় বহুভাষাভাষি জনজাতি গোষ্ঠীগুলিকে একসূত্রে বেঁধে একটা সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করে এসেছে ঝুমুর। আর এই সেতু বন্ধনের প্রধান সহায়ক ছিলেন সামন্ত রাজা জমিদারেরা।

তথ্যসূত্র

১. মাহাত হারাধন— আদি রসকলা ঝুমুর পদাবলী, পৃ. ২

২. তদেব, পৃ. ৩

৩. তদেব, পৃ. ১৪

৪. সিংহ, শান্তি— 'ঝুমুর গান ও ঝুমুর কবি ভবপ্রীতানন্দ', লোকভূমি মানভূম, পৃ. ৩১৯।

৫. মিত্র, রাজেশ্বর ও বসু রায়, সুবোধ— 'ঝুমুর সম্পর্কে পত্রালাপ', ছত্রাক, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

৬. বসু রায়, সুবোধ— 'যা দেখেছি যা শুনেছি', ছত্রাক, ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা।

৭. তদেব

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. তদেব

১৩. বসু রায়, সুবোধ— 'বাঘমুন্ডির সাক্ষ্য', 'লোকভূমি মানভূম', পৃ. ৫৭২

১৪. তদেব, পৃ. ৫৭১

১৫. বসু রায়, সুবোধ— 'বীরডির রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি' (নাচখণ্ড), ছত্রাক, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

১৬. সিংহ দেও, মিহিরলাল— পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের ঝুমুর, পৃ. ৬২

১৭. করণ সুধীর— অভিনব বিদ্যাপতি দর্শন, ছত্রাক, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

১৮. তদেব

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকা

১. আদি রসকলা ঝুমুর পদাবলী— হারাধন মাহাত (বিরচিত ও সম্পাদিত), ১ম প্রকাশ, ১৪১৩।

২. লোকভূমি মানভূম, সম্পা. শ্রমিক সেন ও কিরীটি মাহাত, ১ম প্রকাশ, ২০১৫

৩. ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য— বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, বাণীশিল্প, কোলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৮।

৪. ঝুমুর সমগ্র, সম্পাদনা ও সংগ্রহ— কিরীটি মাহাত, অভিযান সং, ২০২১, কলকাতা- ৯।

৫. মানভূম সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড), বিজয় পন্ডা, অনৃজু, পুরুলিয়া, ২য় সংখ্যা, ২০১৭

৬. মানভূমের ঝুমুর— ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. দিলীপকুমার গোস্বামী, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ১ম প্রকাশ- ২০১৫।

৭. 'ছত্রাক' –সম্পাদক : সুবোধ বসু রায়, পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত।

৮. পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের ঝুমুর— মিহিরলাল সিংহ দেও, ১ম প্রকাশ, ২০১১।

টুসু গীত : লোকসমাজে নারী জীবনের এক অনন্য উদ্ভাষণ

শ্যামাপদ মাহাতো

লোকসমাজের লৌকিক দেবী রূপেই পরিচিত 'টুসু'। টুসু দেবী, লোক দেবী। এই দেবী কোনো শাস্ত্রীয় দেবী নন। লোকসমাজের মনে উদ্ভূত দেবী 'টুসু'। এর পূজা মূলত ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়খণ্ডে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পুরো এক মাস পূজিত হন লোকসমাজের মনে, যার বহিঃপ্রকাশ সকাল-সন্ধ্যা গীতে গীতে।

টুসু সম্পর্কে লোকসমাজে নানারূপ লোককথার প্রচলন রয়েছে। এই সমস্ত কাহিনির একটিতে টুসু এক ব্রাহ্মণ কন্যা যার জন্ম হয়েছিল মোগল শাসনের আমলে। রূপ যৌবনে অনন্যা টুসু ঘটনাচক্রে এক মুসলমান রাজার দৃষ্টিতে পড়ে এবং তিনি টুসুকে ছিনিয়ে নিতে সক্রিয় হন। এই পরিস্থিতিতে টুসু আত্মগোপন করে পালিয়ে যান; রাজা ও তার চরবৃন্দ টুসুর পেছনে ধাওয়া করে। তখন উপায়হারা হয়ে টুসু সতীত্ব রক্ষার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যে ঘাটে টুসু আত্মবিসর্জন দেন, তার নাম সতীঘাট। টুসু সম্পর্কিত অপর কাহিনিতে টুসু কুড়মি সমাজের কন্যা। টুসুর সঙ্গে প্রতিবেশী এক কুড়মি যুবকের ছিল ভালোবাসা। ঐ যুবকের সঙ্গে বিবাহের দিন টুসু ও তার স্বামী মুসলমান দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়। কিন্তু শূকরের মাংস টুসুরা গ্রহণ করে শোনে দস্যুগণ টুসুদের পরিত্যাগ করে। অবশ্য মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হওয়ায় টুসুর সঙ্গে স্থানীয় আত্মীয়-স্বজনরা কুড়মি যুবকের সঙ্গে আর বিবাহ দিতে রাজি হন না। এই অবস্থায় যুবক সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যায় এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য টুসু গৃহত্যাগ করে। অনেক কষ্টের পর টুসু স্বামীকে সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে খুঁজে পান। কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় অসুস্থ টুসুর মৃত্যু ঘটে। অপর একটি কাহিনিতে দেখা যায় টুসু কাশীপুরের রাজার মেয়ে। সর্বজনপ্রিয় অপূর্ব সুন্দরী টুসু অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পৌষ সংক্রান্তিতে তার অকালমৃত্যু হয়। সাধারণত মাটির সরা প্রতীকে টুসু

ব্যাপকরূপে পূজিতা হন। পূজার মন্ত্র গীত।

প্রতিনিয়ত মনের কথায় সুর হয়ে ভাসে গীতে গীতে। আর যে গীত লোকমুখে প্রবাহিত হয়, সেই গীতই হলো লোকসংগীত। লোকসংগীতের চাষ কলমের চেয়ে লোকসাধারণের মুখে ও মননেই বেশি। টুসু গীতও সেরকম চলে আসা সংগীতপ্রবাহ। যে ঢেউয়ের রসালো আবেদন পুরুলিয়া তথা মানভূম ছোটনাগপুর এলাকার মাটি ও মনকে ভিজিয়ে রাখে। এই গীতই এই দেবীর মন্ত্র, সঞ্জীবনী সুধা। এই গীত বিশেষত গ্রামীণ নারীসমাজের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত। সুতরাং তাদের মনের, যাপনের কথা স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন— "অনুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশই হলো বাংলা লোকসংগীতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য"[১]

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং ঝাড়খণ্ডের ধলভূম, সিংভূম অঞ্চল টুসু পরবের প্রধান কেন্দ্র। কেন্দ্রের বাইরে এই উৎসব অন্যত্র কমবেশি প্রচলিত থাকলেও লোকপ্রিয়তা, ব্যাপকতা ও কিংবদন্তীর সূত্রে পুরুলিয়াকেই টুসু উৎসবের মূল কেন্দ্র রূপে অভিহিত করা যায়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিপালিত হয় এই উৎসব। আমন ধান খামারে ওঠার সময় অগ্রহায়ণ, সে সময় সব নারী মাঠে-ঘাটে একত্রিত বা কাছাকাছি হলে গেয়ে ওঠে গীত। টুসু এতদঞ্চলে জায়া-জননী-কন্যা রূপে প্রতিভাসিত হয়। জায়া রেগে বলে ওঠে—

'আইসছে মকর দু'দিন সবুর কর্
তোরা পিঠা মুড়ি জোগাড় কর।'

সাংসারিক জীবনে জায়াদের অবস্থান গীতে গীতে প্রকাশিত হয় এভাবে—

"আমি রইব না শ্বশুর ঘরে
লিতে আমায় যাবে মকরে।"

তাছাড়া জায়াদের বাপের বাড়ির প্রতি টুসু পরবের টান প্রকাশিত হয়ে থাকে উজ্জ্বলরূপে। যেমন—

"তুই বিহা কর আর সাঙ্হা কর
পৌষ পরবে যাবই বাপের ঘর"

শ্বশুরবাড়িতে শ্বাশুড়ির বধূ নির্যাতনও প্রকাশিত হয়েছে গীতে গীতে এভাবে—

"ই চালে পুই, উ চালে পুই, পুই এর খাব
আর যাব না শ্বশুরবাড়ি, ধরে ঠুকবেক শাশুড়ি।"

এখানে যেমন রান্নাঘরের পরিচয় রয়েছে, রয়েছে লোকজ পরিবেশ বাড়ির চালে পুইলত, সঙ্গে লোকসমাজে নারীদের অবস্থান পরিস্ফুটিত। লোকসাহিত্য সম্পর্কে 'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে' গ্রন্থটিতে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন— "সাহিত্য সমসাময়িক সমাজজীবনকে প্রতিবিম্বিত করে"[২]

দুই জায়ার মধ্যে সতীন সম্পর্কে অহিনকুল। তারও প্রকাশ গীতে গীতে দেখা যায়। যেমন—

"উপরকুলি গেলে টুসু, নামমো কুলি যাইয়ো না
উখানেতে সতীন আছে, পান দিলে পান খাইয়ো না"

জায়া ও ননদী সম্পর্কও অম্লমধুর। তারও প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—

"জৈড় পাতা চাকা চাকা
বাঁশ পাতা সরু
বিঘা জড়ে বাসাড় দিব
ননদিনী মরুক"

—গ্রামজীবনে নারীদের তথা লোকজীবনে নারীদের অবস্থানটাও প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই গীতে স্পষ্টরূপে।

জায়া, জারা অর্থাৎ সতীন সম্পর্কের তিক্ততাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে গীতে—

"এক গাড়ি কাঠ, দু গাড়ি কাঠ, কাঠে আগুন লাগানো
আগুন যখন হুদহুদাবে, সতীনকে টানে দিব"

নারীমনের ক্ষোভ, ক্রূরতা, সবই রসিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয় টুসু গীতে।

নারীরা পৌষ সংক্রান্তির মেলায় নতুন পোশাক পরে আসে— সেই পোশাকের উৎফুল্লতা প্রকাশিত হয় গীতে—

"দিদি তোর কাপড়ের পাড় ভাল
আলি বল্যে ভাও দেখা টহল"

নারীদের মধ্যে সখ্যতার সম্পর্কও প্রকাশিত হয় টুসু গীতে—

''চল সারোদা চল বরোদা
কুল্হিতে বাঁধ বাঁধাব
কুল্হির জলে চান করিনে
বারান্দায় চুল শুখাব"

টুসু কৃষক পরিবারের জায়া বা বধূ রূপে চাষ করার কথা ভাবেন— তিন বলেন—

"আমার টুসু চাষ করেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু
আমার টুসু কামিন রাখবে দাঁত মোটা, কোমর সরু।"

প্রসঙ্গত স্মরণে আসে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথাটিই—"টুসু গৃহস্থের পরিবারভুক্ত মানবীমাত্র, কোনও দেবী চরিত্র নহেন। তিনি তেলের বাটি লইয়া স্নান করেন, মাথার চুল ঝাড়েন এবং গলায় সোনার হার পরিয়া থাকেন।"

"টুসু সিন্যাছেন গা হিল্যাছেন
হাতে তেলের বাটি
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাটি।"[৩]

জায়া বা বধূ দেবরদের উদ্দেশ্যে বলে—

"মকর দিনের ছাঁকা গুড় পিঠা
বন্ধু খাতে দিব মিঠা মিঠা"

—ভাবের মানুষের সঙ্গে রসিকতা, নারী জীবনের এক অনন্য উদ্ভাসন।

রান্নাঘর থেকেও জায়াদের মুখে ভেসে ওঠে টুসু গীতের সুর—

"কি দিনকাল পড়েছে কাকা
পেঁয়াজের দাম হইল দু'শো টাকা।"

গবেষক অভিজিৎ সরকার তাই সত্যই বলেছেন— "টুসু গানগুলিতে যে সার্বিক সমাজচিত্র ফুটে ওঠে তা সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তার খোরাক।"[৪] বলাইবাহুল্য, এও নারীমনেরই উদ্ভাসন।

টুসু পূজিতা দেবী অর্থাৎ জননী রূপেও গীতে গীতে প্রতিষ্ঠিত। তাই গীতে শোনা যায়—

'টুসু আইল এক মাসের মতন
আমি করব গো কত যতন'

শুধু তাই না, মাকে যত্ন করে সাজিয়ে রাখার জন্য মনে আকুল, ব্যাকুলতা চূড়ান্ত তাই বলে—

'আকন ফুলের গাঁথেছি মালা
টুসুর গলে দিলে হয় আলা'[৫]

একমাসে দেবীর প্রতি নিবিড় টান তৈরি হয়ে যায়। জননীর টানের মতো দেবীর টান ভীষণ কাছের হয়ে যায়। তাই দেবীকে বিসর্জন দিতে ব্যথিত হৃদয় বলে ওঠে—

"টুসু ধনকে জলে দিব না
আমার রইলো মনে বেদনা"

—বিসর্জনের এই বেদনা যে নারী মনেরই উদ্ভাসন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নারীজীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা সন্তান, সন্ততি। কন্যা ভীষণভাবে জড়িয়ে থাকে মায়ের সঙ্গে। মায়ের আঁচলও আলোকিত হয় কন্যার পরশে। তাই টুসুও কন্যার ভূমিকা নেয় গীতে গীতে। তাই গীতে উঠে আসে—

"আমার টুসু মাটির পুতুল
ধুলোবালিতে খেলো না
কোনো সতীনে ধূলা দিল গো
ধূলার চিহ্ন গেলো না"[৬]

ধুলোবালি যাতে না লাগে সন্তানের প্রতি সেই স্নেহ টুসু গীতে প্রকাশিত।

সন্তান-সন্ততি সংসারে মন ভালো করা এক আশ্রয়। তাই বলে—

"যার ঘরে ছানা নাই মন কেমন করে রে
হুবকি ডুবকি ছানা মুতে কাদা করে রে"

টুসু শুধু দেবী রূপে না থেকে কন্যা সন্তান রূপে যেন আঁচলে বসেছেন, আর গীত শুনছেন—

"চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব
রানীগঞ্জের বড়তলা
খেলতে খেলতে দেখাই আইন্‌ব
কয়লা খাদের জল তোলা।"

সন্ততির প্রতি মমতা টুসু গীতে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—

"বাগমুন্ডির পাহাড়ে বড় হনু হাঁকে রে
আই নুন্যা কোলে লিব বড় দয়া লাগে রে"

—বালিকা থেকে কিশোরী কন্যার প্রতি মায়ের মনোভাবের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় গীতে গীতে—

"একটা নাকে দুটা নাক ছাবি
বিটি থাক্‌বি ন বাহিরাঁই যাবি"

তাছাড়া পণপ্রথা চলা সমাজে মায়ের মনে ধাক্কা মারে কন্যাদায়, যে দায়িত্বকে লোকসমাজ বড় দায়িত্ব মনে করেন। তাই বড় মেয়েদের মায়ের মনের কথা ভেসে ওঠে গীতে—

"বিটির বিহা দিব কি করে
হামদের টাকা পয়সা নাই ঘরে"

লোকজীবনের মধ্যে কন্যাদায়ের ভার যে কতটা জটিল তা নারীসমাজের মুখে মুখে গীত হয়ে প্রবাহিত হয়।

এই সব গীতগুলো শুনলে প্রতিটি গীত যে নারীজীবনেরই অনন্য উদ্ভাসন তা বলারই অপেক্ষা রাখে না নারীমনের আকুতিতে তাই বলতেই হয়—

পিরিতে ল্যাঠা, পৌষে পিঠা আজও আছে, আছে ভাবের মানুষ, ভাবের গীত, গীতের গরব। এই গর্ব লোকসমাজের, লোকজীবনের।

উপসংহার : মাটির কাছাকাছি মানুষের মনেই লোকদেবী টুসুর আশ্রয়। লোক-কথা যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন সবারই মধ্যে জীবন, সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক নারীমনের কৌতুহল, অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে টুসুগীতে। তিরিশ দিনে তিরিশটি ফুল দিয়ে পূজিত এই দেবী কুমারীর আবেগ, বধূর হর্ষ ও শাশুড়ীর সংসার জীবনের রসিকতার রসদ। গীতের মধ্যে সাধারণত স্বরবৃত্তই স্থান পায়। ছন্দ তাদের মনে মনে, গানে গানে জীবনানুভূতি। যে অনুভূতি লোকজীবনের, নারীমনের। তাই টুসু গীত শুধু সুরেই মানুষকে বাঁধে না, বাঁধে কথায়। বলাইবাহুল্য সেকথা নারীমনেরই। গবেষক তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বাংলার লোক উৎসব : তৃপ্তিহীন জিজ্ঞাসা ও মহান সম্বল" প্রবন্ধে বলেছেন—'টুসু পূজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কুমারী মেয়েরাই প্রধান।' তবে এটাও স্বীকার্য যে, কুমারী মেয়েদের অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও থাকেন। গীতে গীতে শুধু কুমারী জীবন নয়, সমগ্র নারীজীবনেরই উদ্ভাসন যে লক্ষ করা যায়, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ২৭৯।
২. চক্রবর্তী. ড. বরুণকুমার, 'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে', বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রো,

কলকাতা-৯, প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ২৪৭।

৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড), কলিকাতা, পৃ. ১৩৭।

৪. সরকার, অভিজিৎ, 'অন্য ভাবনা : পুরুলিয়া ও লোক', আশাবরী, ২০১২, পৃ. ৯০।

৫. মহন্ত বীরেন (লোকশিল্পী); সাক্ষাৎকার— ১৫.৭.২০২০ (ঠিকানা— ডাহা, মানবাজার, পুরুলিয়া)।

৬. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, 'লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ', বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রো, কলকাতা-৯, প্রকাশ কোজাগরী লক্ষীপূজা, ১৩৮৭, পৃ. ৫৮।

৭. সরকার, সঞ্জীব ও রায়, অরুণকুমার (সম্পা); 'লোকায়ত সংস্কৃতি' (পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা), উইলিয়াম কেরি স্টাডি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১১৮।

গ্রন্থঋণ

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, ২০০৭।

২. করণ, ড. সুধীরকুমার, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ-১৯৯৯।

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা লোকসাহিত্য', কলকাতা, ১৯৫৩-৫৭।

৫. সরকার, অভিজিৎ, 'অন্যভাবনা : পুরুলিয়া ও লোক', আশাবরী, ২০১২।

৬. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, 'লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ', বুকট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রো, কলকাতা-৯, ১৩৮৭।

৭. সরকার, সঞ্জীব ও রায়, অরুণকুমার (সম্পা.); 'লোকায়ত সংস্কৃতি', উইলিয়াম কেরী স্টাডি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮০।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা : বৈপরীত্যে ও সামীপ্যে

মিলনকান্তি সৎপথী

এই আলোচনার দুটি প্রধান দিক— ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান পরে ১৯৭১র ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রবীন্দ্র বিতর্ক, বর্জন গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধিজীবী মহলে সাংস্কৃতিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা দেশভাগ পরবর্তী পর্যায়ে সময়ের বাঁকে রাষ্ট্রিক পট পরিবর্তনে বারে বারে প্রশ্নোত্তরে, তর্কে-প্রতর্কে, মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গরূপেই বিবেচিত হয়েছে। সৃজনশীল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাও এক নিবিড় পর্যবেক্ষণের বিষয়।

রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্বের দিক থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতাকেন্দ্রিক যে বিভাজন তা বঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গভীর একটি সংকট তৈরি করে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল উপনিবেশবাদের এক নতুন পর্ব। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকের চোখে পূর্ব বাংলা ছিল মৃগয়া ক্ষেত্র। বিপুল সংখ্যক গণমানুষের সমৃদ্ধির প্রশ্নে যে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে— সেখানে সমষ্টি মৌলিক দাবি বা চাহিদাগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। দেখা গেল রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার এক নতুন কাঠামো। যেখানে হাজার বছরের বাঙালি সত্তার উত্তরাধিকার বিসর্জনের সর্বমুখী প্রয়াস। প্রথম ধাক্কা ভাষার প্রশ্নে। বর্ণমালা সংস্কার ও সরলীকরণ, প্রয়োজনে রোমান আরবির সংযুক্তিকরণ— প্রতিক্রিয়াশীলতার এক একটি দিক। মৌলিক পরিবর্তনের নাম দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব (১৯৫৮-'৬৮) চেয়েছিলেন বাংলা ও উর্দুর মিশ্রণে নতুন পাকিস্তানি ভাষা সৃষ্টি করতে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিশ্বস্ত কর্মচারি মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বাদ দেবার উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগ পরবর্তীকালে নজরুলের সাহিত্যে হিন্দু বাচক শব্দ, দেব-দেবীর বর্জনে বা রবীন্দ্র সাহিত্য পরিমার্জনের মতো হীন চেষ্টার পথে এগিয়ে ছিল— যদিও বাঙালির শুভবোধে তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষার দাবিতে যে আত্মত্যাগ তা বাংলাদেশ,

বরাক উপত্যকাসহ (১৯মে ১৯৬১ অসমে ১১ জন শহিদ) যে কোনো দেশের ভাষার প্রশ্নে আত্মবিকাশের দাবি— যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রাষ্ট্রসংঘে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশে উর্দু বাংলার যে দ্বন্দ্ব— তা বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্যসম্মেলন'এ রবীন্দ্র বক্তব্যে ছিল সতর্ক সংকেত— "সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দেবার প্রস্তাব। বাংলাদেশে শতকরা নিরানব্বই এর অধিক সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি ?"—পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাকেন্দ্রিক ফতোয়া বাংলাদেশ মেনে নেয়নি, যেমন মেনে নেয়নি রবীন্দ্র বিরোধিতা।

দেশভাগ— পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনে ইতিহাসের যে টানাপোড়েন, সত্তার পুনর্জাগরণের যে লড়াই— সেখানে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন সাংস্কৃতিক চেতনার আলোকবর্তিকা। ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে বাঙালির যে ঘরে ফেরা নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখার প্রশ্ন— সেখানে রবীন্দ্র সংস্কৃতি বহন হয়ে উঠেছিল এক অনিবার্য সত্তাস্রোত। সামরিক শাসনামলে পাকিস্তানি সার্বিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে লড়াই সেখানে রবীন্দ্র উপলব্ধি চর্চা যেন সেই সহায়কশক্তি যা বাঙালিকে চেতনাঋদ্ধ— সংঘবদ্ধ হতে শিখিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা এসেছে১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে। সরকারি প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যা উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারিত হয়নি। ১৯৬৭ তে ২২ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তথ্যমন্ত্রীর যুক্তি ছিল— রবীন্দ্রসংগীত, পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুনীর চৌধুরী রচিত উনিশজন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরসহ একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে বলা হয়— 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্যদান করেছে, তার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতাদান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।'—এই বিবৃতির পাল্টা বিবৃতি দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অধ্যাপক এম সাহাবুদ্দিন (আইন বিভাগ), কে এম মুনিব (ইংরেজি বিভাগ), ড. মেহের আলী (ইতিহাস বিভাগ), এ.এফ.এম. আবদুর রহমান (গণিত বিভাগ), সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (ইংরেজি বিভাগ)। এঁদের বক্তব্য ছিল পূর্বোক্ত রবীন্দ্রপন্থী— 'স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানি ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোন

পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।'—রবীন্দ্র বর্জনের উস্কানি দিয়ে পরে এই বিবৃতির সঙ্গে চল্লিশজন বিবৃতি দিলেন— 'যে তমুদ্দনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সেই ভিত্তি অস্বীকৃত হয়। ঐ কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূল নীতি বিরোধী বলে মনে করি।'—এখানে যে বিবৃতিকে আক্রমণ করা হয়েছে সেটি মুনীর চৌধুরী সহ উনিশ জনের দেওয়া। আমরা জানি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই প্রতিক্রিয়াশীলতা পরাজিত হয়। রবীন্দ্রগান হয়ে উঠল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাণের মন্ত্র।

১৯৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ইসলামী ঘরানা, চিরায়ত উপলব্ধি, দায়বদ্ধ মানবিক কবিতা, তিরিশের উত্তরাধিকার ও অর্জন এই সময়ের বাংলা কবিতাকে বৈচিত্রমন্ডিত করেছে। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের প্রচলিত ছক ভেঙে বাংলা কবিতা হতে চেয়েছে নতুন কবিতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বর্জন তো নয়ই বরং আত্তীকরণে এর সিদ্ধি। ফররুখ আহমেদ, তালিম হোসেনের মতো ইসলামী ঘরানার কবিদের মধ্যেও রবীন্দ্র অনুরণন। শাহাদাৎ হোসেন, সুফিয়া কামাল, আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহসান, আদুল মান্নান সৈয়দ, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমানের মতো কবিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে রবীন্দ্র আবগাহনে কাব্যকলাকে স্বকীয় করেছেন। এই ঐতিহ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কবিতাতেও দেখি। যদিও দেশ-কাল-ব্যক্তি অভিজ্ঞতার পরিধি পাল্টেছে— তাই শামসুর রাহমানকে বলতে শুনেছিলাম— 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমার সব অনুভূতির প্রকাশ নেই।' লিখেছিলেন 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' কবিতায়—

'মধ্যপথে কেড়েছেন মন
রবীন্দ্র ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি।'

—এই দূরত্ব শামসুর রাহমানে যে সাময়িক তা বিভিন্ন কাব্যের কবিতা পাঠে স্পষ্ট হয়। অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রেও স্বপ্ন সৌন্দর্য কল্পনা, প্রেমানুভবে রবীন্দ্র-অনুভব সঞ্চারিত। রবীন্দ্র রোমান্টিক চেতনা, আন্তর্জাতিক মানবিক বোধে আস্থাজ্ঞাপনে কবি শিল্পীদের অনুরাগ প্রগাঢ়। না হলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রতিবাদ স্মারক লিপি, পথসভা, মিছিল, আলোচনা সভায় বাঙালি অংশগ্রহণ করতো না। 'আমার সোনার বাংলা', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা' প্রভৃতি গান জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেই শামসুর লিখেছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথের বেসামাল স্তাবকবৃন্দ যে বিগ্রহটি নির্মাণ

করেছেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সৃষ্টিকর্ম থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে— আমাদের তৈরি করতে হবে নতুন পথ। আমাদের অভিযানে তিনি কোনো বৈরীশক্তি নন, বরং সহায়ক শক্তি' (পান্থজনের সখা, কবিতা এক ধরনের আশ্রয়, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬৭)

আলতাফ চৌধুরীকে লেখা একটি পত্রে (রূপরেখা, ১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন— 'আধুনিককালে সাহিত্যকে আশ্রয় করে মানবমনের যে উৎকর্ষসাধন হয়েছে ভেদনীতির দ্বারা তার বিনাশ ঘটবে এই আমার আশঙ্কা'।—এই উপলব্ধি ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক— স্বৈরতান্ত্রিক, সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে এগিয়ে চলা ব্যক্তিও সৃজনশীল সত্তায় অনুভূত হয়েছে বারে বারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে যে অর্জন তা হুমায়ুন আজাদের মন্তব্যে স্পষ্ট— 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালিত্বের জন্য বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে' ('রাজনীতি ও দুই বাংলা কবিতা', 'চোখের দুটি তারা', অশ্রুকুমার শিকদার, পৃ. ৩৬)। শামসুর রাহমান তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা 'কালের ধূলোয় লেখা'য় ২৬.১.১৯৯৭ তারিখের ডায়েরিতে লিখেছিলেন— 'আমার নিজের কথা তো রবীন্দ্রনাথের বিপুল ভান্ডার থেকে ঋণ করে উচ্চারণ করেছি।' এই রবীন্দ্র পরিগ্রহণ বাংলাদেশের কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে বার বার, তার কয়েকটি উদাহরণ—

ক) 'সমুদ্রের ভাষা আছে বাউলের মতো
ঠিক বাউলের মতো নয়, আরো কিছু।'

আসাদ চৌধুরীর 'জলের মধ্যে লেখা জোখা' কাব্যের আলোচ্য 'সমুদ্রের ভাষা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার কথা মনে করায়। আসাদ চৌধুরীর উক্ত কাব্যের 'কৃষ্ণকলি' কবিতাতেও রাবীন্দ্রিক আবহ—

'ময়না পাড়ার মাঠে মাঠে খোঁজেন
তোমার মরাল গ্রীবা হতে
ধসে যাওয়া বাউলের পুষ্প মাল্যখানি।'

খ) রাষ্ট্রিক আবেষ্টনে নাগরিক ভাবনার একজন কবি শহিদ কাদরী। তাঁর 'উত্তরাধিকার' (১৯৬৭), 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' (১৯৭৪), 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই' (১৯৭৮) কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় রবীন্দ্রচেতনায় আত্ম ও সমষ্টি বিকাশের পথ খোঁজেন। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় উঠে এল সেই নির্দ্বিধ উচ্চারণ—

'আমাদের চৈতন্যপ্রবাহে তুমি ট্রাফিক আইল্যান্ড
হে রবীন্দ্রনাথ

… …
মেধার ভেতরে তুমি, মজ্জায়, শিরায়, মর্মে।'

গ) হাসান হাফিজুর রহমানের 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার' (১৩৮২) কাব্যের 'ফুরাবো আমরা তাহালে' কবিতার শেষাংশে ধ্বনিত হ'ল হাসানের কবিতার অভিমুখ—

'প্রাণের বদলে
এইটুকু সত্য বলে দিতে চলো আমরা সবাই
রাবীন্দ্রিক অধিকার উঁচু করে ধরি আজীবন
ফুরাবে রবীন্দ্রনাথ, ফুরাবো না আমরা তাহলে'

ঘ) 'বাঙলা ছাড়ো' (১৯৭২) কবি সিকানদার আবু জাফরের সর্বশেষ কাব্য। ২৬টি কবিতায় কবির ঐতিহ্য সচেতন মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'রবি প্রসারিত' কবিতায় রবীন্দ্র গান ও কবিতার স্বতস্ফূর্ত প্রাণাবেগে লিখেন—

'সেখানে যখন দেখি আমন্ত্রিত বাঙলার
ঘাসের ঘুঙুর
সমস্ত সবুজ ঢেকে অনায়াসে তোলে
আপনার তৃপ্ত কণ্ঠে সহজ সঙ্গীত
আমি মুগ্ধ হই।'

ঙ) বাংলার সৌন্দর্যের প্রতিরূপ রবীন্দ্রনাথ। তাই আবু জাফরের হাতে লেখা হয় 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা। কবি আত্মউন্মোচনের পথ খুঁজেন এইভাবেই—

'বাঙলার রবি প্রসারিত
অন্তহীন দাক্ষিণ্যের হাতে
উজ্জীবিত জীবনের সুবর্ণ সলিলে
পৃথিবীর মুখ
যে রবি দিয়েছে ধুয়ে মৃত্যুহীন প্রেমে
… …
সেই রবি আমাদের বাঙলার রবি।'

চ) বাংলাদেশের কবি সার্বভৌম শামসুর রাহমান— রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন সময়ের অস্থিরতা থেকে উত্তরণের শক্তি অর্থে। মহামানবের যাত্রী রূপে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা কোথায় তা একাধিক প্রবন্ধে, গদ্যে, ডায়েরি, চিঠিতে তিনি যেমন উল্লেখ করেছেন— ঠিক একই ভাবে বাংলা কবিতার ক্রমযাত্রায় রবীন্দ্রসংস্কৃতির উত্তরাধিকারে তিনি পথিকৃত শিল্পী।

'রৌদ্র করোটিতে' (আষাঢ় ১৩৭০) কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় লেখেন—

'আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছো ভরে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে।'

একেবারে শেষ দিকে লেখা 'অন্ধকার থেকে আলোয়' (ফেব্রুয়ারি ২০০৬) কাব্যে সার্বিক স্খলন বৈনাশিকতার মধ্যে মানবতাবাদী বাউলের গান শোনাতে চান, রবীন্দ্র অনুভবের স্নিগ্ধতার কথা বলেন— 'পর মুহূর্তেই দেখি আমার আঁধার ঘরে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক উপস্থিতি নেই, শুধু রয়ে গেছে অপরূপ চিরন্তন ঘ্রাণ' (অপরূপ চিরন্তন ঘ্রাণ—২.৮.২০০৫)

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নং ধানমণ্ডি ভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে দেশ হেঁটেছে একনায়কী স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের আবেষ্টনে। জিয়াউর রহমান, জেনারেল এরশাদ এদের শাসনামলে (১৯৭৭-৮৯) সাংস্কৃতিক সংকটের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথকেও পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এই প্রবণতা মাঝে মাঝেই উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্র জন্মের সার্ধশতবর্ষে ভারতে যেমন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে কমিটির প্রধান করা হয়েছিল বাংলাদেশে সেই দায়িত্বটি পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুই দেশের যৌথ সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধনের প্রতিশ্রুতি প্রয়াস রবীন্দ্রচর্চাকে প্রসারিত করেছে।

বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পূর্বে যাঁরা রবীন্দ্র বিরোধিতা করেছেন— পরে তাঁদের অনেকেই হয়ে উঠলেন রবীন্দ্র অনুরাগী আলোচক। রবীন্দ্র ধ্যান-ধারণা সার্বিক চিন্তাচেতনা গ্রহণে একটি জাতি কতটা গৌরবান্বিত— রবীন্দ্র বিরোধ বিচার হওয়া উচিত ছিল সেই দৃষ্টিকোণে। সৈয়দ আকরম হোসেন তাই 'বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রবিচার' (বেতার বাংলা, তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৭৪) প্রবন্ধে লিখেছেন— 'স্বাধীন বাংলায় রবীন্দ্রবিচারের প্রচ্ছদ উন্মোচিত হওয়া উচিত স্বায়ত্বশাসিত মনোভূমি ও দেশভূমির চেতনা চরিত্র অনুসারে। অকারণ মুগ্ধতা নয়, অবিশ্বাসী গ্রহণ নয়, বরং কাল নামক চরম কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে রবীন্দ্রনাথ কি।'—রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কৃত্রিম সমস্যা তুলে ধরে আত্মঘাতি হওয়ার একটি প্রবণতা স্বাধীনতার পরেও দেখা গেছে। নজরুল ইসলামের বিপরীতে রবীন্দ্রনাথকে দাঁড় করিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস তাতে উভয় স্রষ্টাকেই বিকৃত করা হয়েছে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায় অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের

যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?'— এই প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে প্রতিপক্ষ নয়— আত্মগরজে রবীন্দ্র অনুভবের প্রাসঙ্গিকতা।

এই আত্মসমীক্ষা নিয়েই বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ১০-১২ অক্টোবর ১৯৮৭ তে 'সমকালীন বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনা সভার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এসেছে— যা খান সারওয়ার মুরশিদের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ জুন ১৯৮৯ এ সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়। সংকলনটি 'সমকালীন বাংলাসাহিত্য' নামেই প্রকাশিত। এই প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ কিভাবে গৃহীত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ অর্জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য সংগীত, চিন্তা প্রাসঙ্গিক অধ্যায় বলেই বিবেচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জাতিসত্তার সংকটে আল মাহমুদের মতো অনেকেরই মনে হয়েছে—

'শুনুন রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা ঠাকুর।' ('রবীন্দ্রনাথ'/কালের কলস)

কিন্তু এই নৈরাশ্য সময় শাসিত ব্যক্তিবোধে চালিত নয়। 'মুক্তিযুদ্ধ : নির্বাচিত কবিতা' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭) সম্পাদন করেন সাইফুদ্দিন মাহবুব দুলাল একশজন নবীন ও প্রবীণ কবির কবিতা নিয়ে। যুদ্ধ পূর্ব ও পরবর্তী পর্যায়ের অবক্ষয়, অস্থিরতা, স্বপ্নভঙ্গতার মধ্যেও পেয়েছি প্রত্যয়— সত্তার প্রাণিতরূপের দ্যোতনা। জীবনানন্দ দাশের ভাষায়— 'রণরক্ত সফলতা সত্য কিন্তু সব সত্য নয়।'

বাংলাদেশে রবীন্দ্র গবেষণার একটি প্রধান দিক উত্তর আধুনিক চিন্তা চেতনার রবীন্দ্র বিচার। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় প্রবল রাষ্ট্রিক বিরোধিতার মধ্যে উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীমহল রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি সংস্কৃতির মহত্তম শিল্পী বলে গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীল আধুনিকদের সঙ্গে মানবতাবাদী আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে এই উদ্‌যাপন মগ্নশৈলের মতো বাহ্যিক ঘটনা বলে মনে হলেও এর মূলে ছিল ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট রেখচিত্র-সাংস্কৃতিক চেতনা বাঁচিয়ে রাখার কৌশল। তাই উত্তর আধুনিক দৃষ্টিকোণে এই রবীন্দ্রচর্চা অবশ্যই নতুন দিক— কিন্তু খেয়াল রাখা উচিত তা যেন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে না দেয়।

শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর তুলনামূলক আলোচনা

প্রশংসনীয়। 'কুমুরবন্ধনে' (যোগাযোগ) আলোচনায় তাঁর পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশশৈলীর সূক্ষ্মতা প্রশংসা যোগ্য, 'কুমু প্রকৃত দাসত্বের মধ্যেও চিত্তের স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছে' —এ ধরনের মন্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আবদুল হালিম মার্কসীয় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রবিচারের যে ধারা দেখান তা সমালোচনা সাহিত্যে প্রশ্ন তুলে। আবদুল্লা আবুসাইদ সম্পাদিত 'সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ' সংকলনেও (১৯৬৭) বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যার বিচারে নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছেন। যদিও এর মূলে পাকিস্তান ও তৎপরবর্তী স্বৈরাশাসকের ভূমিকা। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে প্রশাসক গ্রহণ করতে চায়নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধুয়ো দেখিয়ে। এই প্রতর্কের মধ্যে রবীন্দ্রচর্চার পরিধি বেড়েছে। গোলাম মুরশিদ, সৈয়দ আকরম হোসেন, সনজিদা খাতুন, মুহম্মদ হাবীবুর রহমান, আনিসুজ্জামান প্রমুখর রবীন্দ্রচর্চা সমালোচনা সাহিত্যের মানবৃদ্ধি করেছে। আমরক হোসেনের রবীন্দ্র উপন্যাসের আলোচনা পাঠককে প্রাণিত করে। তাঁর একটি মূল্যায়ন লক্ষণীয়— 'শেষের উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বহির্জগৎকে প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছেন এবং আন্তর্জগৎ ও ব্যক্তিত্বকে দিয়েছেনপরিপূর্ণ প্রাধান্য এবং এই শেষের উপন্যাসগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছে' (বাংলাদেশের সমালোচনা : বর্তমান পরিস্থিতি, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সমকালীন বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৪২) রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' গীতিনাট্যের ওপর রশীদ করিমের প্রবন্ধ মনোজ্ঞ। রশীদ করিম তাঁর 'উপন্যাসে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক'—শীর্ষক আলোচনায় জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি'তে যা করেছেন তা অবাস্তব, 'চোখের বালি' নিয়ে অভিযোগ সমসময়ে বিধবা বিবাহের চল থাকলেও উপন্যাসে বিহারী ও বিনোদিনীর বিয়ে হয়নি। আর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এক পা এগিয়ে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে এলেন। সমালোচক শুধু 'নষ্টনীড়'কে প্রশংসা করেছেন। করিমের পূর্বোক্ত অভিমতগুলি খণ্ডন করেছেন কবীর চৌধুরী। তাঁর অভিমত— 'নষ্টনীড় ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় নারী পুরুষের সম্পর্কের বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিমণ্ডল চিত্রিত হয়েছে, যেখানে দেহজ কামনা বাসনার দিকটি মোটেই উপেক্ষিত হয়নি, তবে তা পরিবেশিত হয়েছে তাঁর বৈশিষ্টময় সংযত, রুচিশীল ভঙ্গিতে, মৌলিক ইঙ্গিতময়তায় (সমকালীন সাহিত্য, পৃ. ৩৬১)। এইভাবে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে রবীন্দ্রচর্চা পরিধি বেড়েছে, সমালোচনা সাহিত্য সঠিক দিশা দেখিয়ে চলেছে।

রবীন্দ্র উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিকতার দিকটি সৃজনশীল উপন্যাস সাহিত্যে গুরুত্ব পেয়েছে। শামসুল হক, রাজিয়া খান, হুমায়ুন আহমদ, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন সহ বিশিষ্ট লেখকরা বিষয়টিতে অবগাহন করেছেন। 'গোরা'র মতো মহাকাব্যিক উপন্যাসের একটি দিক বহন করেছেন— আবু জাফর শামসুদ্দিন (পদ্মা থেকে মেঘনা- ১৯৭৪), আবু ইসহাক

(পদ্মার পলিদ্বীপ- ১৯৮৬), রিজিয়া রহমান (বং থেকে বাংলা- ১৯৭৮) প্রমুখ ঔপন্যাসিক। নাটক অভিনয়ে শুধু ১৯৪৭-১৯৭১ পর্বটি নয়, আজও রবীন্দ্র নাটক সমাদৃত। আমরা জানি এ দেশে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা অভিনয়ে 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সৌখিন নাট্যকর্মীরা এই কাজটি করেন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ড্রামা সার্কেল, বুলবুল, ঐকতান সহ বিভিন্ন নাট্যদলের বা গোষ্ঠীর যে ভূমিকা— সেই ভূমিকাটি পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। অনুবাদে রবীন্দ্র নির্দেশিত পথ অনেকেই গ্রহণ করছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন— 'আমাদের সাহিত্যে গেঁয়োমি প্রকট, তুমি আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বপটভূমিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করো'। বিদেশি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশি শিক্ষিত জনের পরিচয় করানোর দিকটিতে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে। ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে আহমদ শরীফের মতো মানুষ বলেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, সম্পদ নন। বরং তাঁর সাহিত্য আমাদের জন্য বর্তমানে আর অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে না।' (রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন, ১৯৮৬)। ১৯৭৩ এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রবীন্দ্র মূল্যায়নের গভীর বিরোধিতা করেন— শামসুর রাহমান, হায়াৎ মামুদ, হুমায়ুন আজাদ, রফিক উল্লাহ খান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান সহ অনেকেই। সৈয়দ মনজুর ইসলাম লিখলেন— ' গণমানবের অর্থনৈতিক মুক্তির কোনো চাবিকাটি রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যাননি সত্য, কিন্তু তার আত্মিক মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথের সর্বত্র আছে'। (উত্তরাধিকার, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ. ১৫১-৫২)। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনাথের সমবায়িক ভাবনা ও দেশীয় লোকশিল্প ভাবনায় অর্থনৈতিক বুনিয়াদটিকে পাকাপোক্ত রূপ দিয়েছে।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দেই গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র। রৈবিক সৃষ্টিশীলতার বহুমিখিনতার গ্রাহিকাশক্তির ওপর ও সরকারি কাঠামোর ওপর বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাস কখনো বাধাপ্রাপ্ত কখনো তর্ক বিতর্কে প্রসারিত। নব মূল্যায়ন বিশ্লেষণে পরিশ্রুত। মনে রাখতে হবে একসময় (আইয়ুব খানের সময়ে) মোনায়েম খানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে জোর করে রবীন্দ্র সংগীত ও গীতাঞ্জলি রচনার নির্দেশ দিতেন— স্বাধীন বাংলাদেশে এই ঘটনা নেই। কারণ বাঙালি ভাষাদীর্ণ জাতি নয় যাকে অন্য শক্তিশালী জাতির ভাষায় কথা বলতে হয়, সরকারি কাজ চালাতে হয়। বাণীনির্ভর শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক রবীন্দ্রনাথ একথা আমরা এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে কি প্রাত্যহিক দিনযাপনে, কি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে বারে বারে উপলব্ধি করি। আর এই অনুভবের সামীপ্যেই বাঙালির আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রবিরোধী নয়।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা

১. ‘সময়ের মুখ তাহাদের কথা’, মুস্তাফা নূরুল ইসলাম,ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
২. ‘পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সাংস্কৃতিক কবিতা’, সাঈদ উর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১
৩. ‘শামসুর রাহমানের গদ্য সংগ্রহ’, পুনশ্চ, ২০০৫
৪. ‘কবিতা এক ধরনের আশ্রয়’, শামসুর রাহমান, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রয়ারি ২০০২
৫. দেশে বাংলাদেশে, জুন ২০০২
৬. মাসিক পরিক্রমা, মহাকবি স্মরণোৎসব সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৮
৭. দৈনিক স্টেটসম্যান, শারদীয় ১৪১৭
৮. মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ১৯৯১
৯. মাসিক উত্তরাধিকার, বৈশাখ ১৪১৮, সম্পাদক- শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সুন্দরবনের জনজীবন

উদয় সরদার

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৩ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলায় ঢাকার বিক্রমপুরের কয়কীর্তন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার কর্মসূত্রে তাঁর শৈশব কেটেছে জামসেদপুরে। বাবার ইচ্ছায় বরেন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আগেই তাঁর অন্তরের মধ্যে সুপ্ত থাকা শিল্পী-সত্তার জাগরণ ঘটে এবং সেই সূত্রে তিনি বহু উপন্যাস ও গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় স্থান পান। কর্মজীবনে তিনি সুন্দরবনের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। চরম অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েও এই সময় তিনি চাকরি ছেড়ে লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। 'দেশ' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। যুগান্তর বন্ধ হলে তিনি কিছুদিন 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তিনি লেখনি ধারণ করলেও সত্তর ও আশির দশকে তাঁর হাতে বহু গল্প-উপন্যাসের জন্ম হয়। লেখক জীবনের সময় পর্বে তিনি যেসব গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করেন তাঁর সবগুলিই শিল্প সুষমা লাভ করে কালের খাতায় স্মরণীয় আসন পেয়েছে— এমনটা বলা যাবে না। তবে সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসগুলি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। এই ধরনের গল্প-উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজস্বতার দাবীকে অস্বীকার করতে পারেনা। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকাকে কেন্দ্র করে তিনি বেশকিছু গল্প যেমন— 'ক্ষুধা', 'অন্নদাতা', 'দধীচির হাড়' প্রভৃতি, এবং 'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৫৮ খ্রি. বা ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), 'বাগদা' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ও 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৮২ খ্রি.), তাঁর উল্লেখযোগ্য সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাস। এদের মধ্যে 'বনবিবির উপাখ্যান' ও 'বাগদা' এই উপন্যাস দুটিতে উপস্থাপিত নোনাভূমির জীবন-সংগ্রামী মানুষের জীবন-জীবিকাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গল্পকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর উপন্যাস গুলিকে নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তাই তাঁর সুন্দরবন কেন্দ্রিক এই দুটি উপন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঔপন্যাসিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসেই আমার এই প্রবন্ধ।

সুন্দরবন অঞ্চলের নদী-সমুদ্রে ঘেরা ছোট বড় দ্বীপগুলিতে ইংরেজ আমল থেকে বন কেটে লট নম্বর দিয়ে মাপ জোক করে ভেড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর নোনা জল থেকে পৃথক করে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি। কোথাও বা হাজার হাজার বিঘে জলাশয় জুড়ে গড়ে উঠেছে মাছ চাষের বিশাল জলকর। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান' উপন্যাসে এই অঞ্চলের মানুষের বহুমুখী জীবন সংগ্রামের কথা লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সুন্দরবনের দ্বীপ গুলিতে— "একদিকে অরণ্যের ঠাসা বুনোট, অন্যদিকে সাপ, বাঘ, কামট-কুমীরের তাণ্ডব। সে কী প্রচণ্ড লড়াই। মানুষকে যেন নেশায় পেয়ে বসল। হয় আমরা, না হয় অরণ্য।"[১] ভূমিহীন মানুষেরা জমি পাওয়ার আশায় নির্বিচারে বনের গাছপালা কেটে প্রকৃতির ভয়ার্ত পরিবেশকে দিনে দিনে নিজেদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ও প্রাণের ভয়কে উপেক্ষা করে জল-জঙ্গলে আবৃত বাসের অযোগ্য পরিবেশকে মানুষ বাসযোগ্য করে তুলেছে।

কলকাতার চৌধুরীবাবুদের হঠাৎ করে সুন্দরবনে জমি আবাদ করার খেয়াল চাপে। আর বিশ্বস্ত মানুষ দয়াল ঘোষের ওপর একাজের সমস্ত দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়। সুন্দরবনের বুড়ো বাসুকির তীরে বিস্তৃত জঙ্গল ধ্বংস করে নতুন আবাদ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে তারা। ভাটিরদেশের মানুষকে বারমাস-ই নদীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। বুড়ো বাসুকি মানুষের দৌরাত্মকে মেনে নিতে পারে না। তাই— "বুড়ো বাসুকি চোখে-মুখে আক্রোশ নিয়ে সারাক্ষণ যেন ফুঁসছে। যেন টের পেয়ে গেছে নদী, এখানে নতুন একটা জনপদ বসাবার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। জঙ্গল উৎখাত করে মানুষে এখানে নিজের প্রতিপত্তি ছড়াতে চায়। নদীর অট্টহাসিতে ব্যঙ্গ।"[২] চৌধুরীবাবুদের আবাদ গড়ার একমাত্র সহায় বিশ্বস্ত দয়াল ঘোষ ও রজনী। পঞ্চাশের অধিক বয়সী রজনী সুন্দরবনের পাকা অভিজ্ঞ লোক, জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জলে-জঙ্গলে। বিখ্যাত শিকারী হিসেবে রজনী বিশেষ পরিচিত। এদের সঙ্গে আছে কাকদ্বীপের ঈশান, লাঠি সম্বল করে সে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ফিরেছে। চৌধুরীদের ছোটকর্তা সুন্দরবনের এই আবাদে বসতি গড়তে চায়। "...তাঁর স্বপ্ন এই সুন্দরবনের জমিটুকু। এখানে জনপদ বসুক, হাট হোক, বাজার হোক। এই বুড়ো বাসুকির উপর দিয়ে হাজারে হাজারে নৌকো চলুক। ব্যাপারী আসুক, ঘাটে

ভিড়ুক। হোক স্কুলবাড়ি, পাঠশালা, মক্তব। আর সবার উপরে এর নাম হোক চৌধুরীর আবাদ।"[৩] ছোটকর্তার দয়ায় আবাদ গড়ার কাজে নোনাভূমির জঙ্গলে আসে ঈশান। ভয়াবহ অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় জন্ম হয় তার। জন্মসূত্রে জল-জঙ্গলে বেড়ে ওঠায়— "ঈশানের চেহারায় রুক্ষতা বড় প্রকট। আর এ-রকম ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়েছে বলেই বোধ হয় এত নির্ভয় আর গোঁয়ার ও। ভয় নেই সাপে কাটায়, ভয় নেই বাঘে খাওয়ায়, কুমীর কামটের সঙ্গেও রোখ চাপলে লড়ে আসতে পারে। জন্ম থেকেই সাহসী আর নির্ভয় হতে শিখেছে ও।"[৪] নোনাভূমির বহুমুখী প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী মানুষদের এরকম সাহসী না হলে চলে না।

'বাগদা' উপন্যাসে ঈশানের মতো হরিণচকের অক্ষয়বাবুদের আবাদের জলকরে মাসিক বেতনের বিনিময়ে কাজ করা সাহসী বিনোদের দেখা মেলে। জীবিকার তাগিদে বিনোদ ঝিলখালির ধান কলের অস্থায়ী কাজ ছেড়ে ভটভটেতে তিন-চার ঘন্টার পথ এসে এখানে কাজে যোগ দেয়। "চাকরিতে আসার আগে বিনোদ বলেছিল, বুইলি পার্বতী, সরকার বাবুদের ধান কলে কাজের জন্য আর আমাদের হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে না। মাসে মাসে সত্যি যদি এবার তিনশ' টাকা করে দেয় ওরা, তা হলেই আমাদের চলে যাবে, কি বলিস ?[৫] পার্বতীর কথায় জানা যায় ঘর না ছাইলে তারা আর ঘরে থাকতে পারবে না। তাই সংসারের শত অভাব সত্ত্বেও বিনোদের উপার্জিত টাকায় ঘরের চাল মেরামতির কাজটাই প্রথম করা দরকার বলে তারা মনে করে।

'বনবিবির উপাখ্যান'-এ কলকাতার চৌধুরীবাবুদের মতো 'বাগদা' উপন্যাসেও কলকাতার অক্ষয়বাবুরা নোনাভূমির হরিণচকের আবাদে মাছের ঘেরি করে। ঘেরির ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে বিশ্বস্ত মানুষ ভাইদা। ইতিপর্বে ভাইদা বহুবার ঘেরির বাগদা চিংড়ি বিক্রির টাকা কলকাতায় অক্ষয়বাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে নোনা আবাদের মানুষের জীবনধারা ও অর্থনীতির বদল ঘটে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ বা বাংলা ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বনবিবির উপাখ্যান'-এ উন্নত অর্থনীতির তেমন কোনো প্রকাশ ঘটেনি, শুধুমাত্র খ্রিস্টান পাদরিদের ছোট্ট সমবায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বাগদা' উপন্যাসে দেখা যায় সুন্দরবনে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে হরিণচকের লঞ্চঘাটে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে, ব্যাঙ্ক সার্ভিস চালু হয়। অক্ষয়বাবুদের জলকর ছাড়াও শিবতলা এবং হাঁসুয়ার জলকর থেকে প্রতিদিন মাছ আসে কাঁটাদারদের আড়তে। শেষরাতে মাছের বাজার বসে ভোর হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়। বাজারের মাছ সড়ক পথে 'লরি-টেম্পো' বোঝাই হয়ে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছে যায়। জনজীবনেও উন্নতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। "আগে ছিল কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় সে রাস্তায় চলাচল করার

উপায় থাকত না। এখন টনটনে পিচের পথ। অনায়াসে ভারি লরিও চলতে পারে। সার্ভিস বাসও হল বলে।"[৬]

সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতে সারাবছর একবার মাত্র ধান চাষ হয়ে থাকে। তীব্র নোনাজল বেষ্টিত ব-দ্বীপ অঞ্চলে নদীবাঁধের পাশে অবস্থিত জমিতে লবণতার কারণে ফসল তেমন ফলে না। কোনো কোনো বছর যদি বৃষ্টির জলে জমির লবণতা ধুয়ে গিয়ে সামান্য পরিমাণে ফসল ফলে, তাও আবার নদীবাঁধ ভেঙে বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। একবার নোনা জল ঢুকলে সেই জমিতে প্রায় তিন-চার বছর ফসল ফলে না। এসব কারণে নদীবাঁধের কাছে বসবাসকারী মানুষেরা কৃষিকাজে তেমন কোনো লাভের মুখ দেখতে না পেয়ে জমির চারধারে উঁচু বাঁধ দিয়ে নোনা জলে সারাবছর চিংড়ি চাষ করে। ফলে অধিক পরিমাণে অর্থ তাদের হাতে আসে। চিংড়ি বিক্রির টাকায় সংসারের সংস্থান সহজেই হয়ে যায়।

বাজারের কাঁটাদারেরা মাছ কিনে কলকাতায় পাঠানোর আগে বরফ চাপা দেয়। এই বরফ তৈরির জন্য জোতদার সুরেশ ডিঙাল বাজারে জেনারেটর বসায়। সেখানে গড়ে ওঠে সিনেমার হল, যা জনজীবনে সামান্য বিনোদনের অভাব মেটায়। ঘরে ঘরে রেডিওতে সংবাদ শোনা যায়। বদলে যায় নোনাভূমির মানুষের দৈনন্দিন জীবন-প্রণালী।

অক্ষয়বাবুদের জলকরে পাহারাদারের কাজ করে শিবু, বিনোদ, ভোলা, বিষ্টু, বলাই ও নন্দ। এদের মধ্যে শিবু আলা পাহারার নামে রাতে ঘেরির গইবাক্সের কাছে জিয়োন মাছ চুরি করে রাতারাতি নিজের মেয়ে হাসির হাতে থলি ভর্তি করে তুলে দেয়। হাসি মাছের থলি নিয়ে নদীবাঁধ ধরে ছুটে আসে কাঁটাদারদের কাছে। নব্বই-একশ' টাকা কিলো দরে বাগদা বিক্রি করে প্রতি রাতে শিবু অনেক টাকা কামায়।

শিবুর স্ত্রী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে কামটের শিকার হয়। মেয়ে হাসিকে সঙ্গে নিয়ে নদীর জলে মাছ ধরতে গিয়ে হঠাৎ নদীর হিংস্র কামট এসে তাকে টেনে নিয়ে যায়। জীবিকার তাগিদে এ অঞ্চলের মানুষ মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে। নদীর প্রবল স্রোতে ডুবে মরার ভয়ও এদের নেই। "আসলে ভয় অন্য জায়গায়। বাদার এ নদীর চরিত্র তো কারো না বোঝার নয়। জলের ভাঁজে কামট লুকিয়ে আছে কিনা কে বলবে। কামট যে মাঝে মাঝে না দেখা যায় এমন নয়।"[৭] সুন্দরবনের নদী-নালায় ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায় কামট। সমুদ্রের মোহনা থেকে উঠে আসে ভয়ানক কুমির। "কুমির শিকারী জন্তু।...মানুষ শিকার করিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া ভক্ষণ করে।...হাঙর বা কামট সুদরবনের এক ভয়াবহ জলজন্তু।...সুন্দরবনের নদীনালায় অসংখ্য হাঙর থাকে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত হাঙর মানুষকে আক্রমণ করিয়া হস্তপদ ও শরীরের অন্যান্য অংশ কর্তন করিয়া লইয়া যায়। ...

ব্যাঘ্র ও কুমির অপেক্ষা হাঙরের দন্ত অধিকতর প্রখর।"[৮] তবু জীবিকার তাগিদে জীবনকে বাজি রেখে শিবুর স্ত্রী ও মেয়ের মতো আবাদের বহু মানুষ নদীতে মাছ, কাঁকড়া ধরে। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতি বছর হাঙর, কামট, কুমিরের মুখে প্রাণ হারায় অনেকে।

"বনবিবির উপাখ্যান'-এ চৌধুরীদের ছোটকর্তা নরেন্দ্র নারায়ণের আবাদে বন কাটার জন্য কাকদ্বীপ থেকে ভাসান নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়। বন কাটতে গিয়ে আকস্মিক ভাবে বাঘের শিকার হয় ভাসান। দলের অন্য সকলে জঙ্গল তোলপাড় করে তিন দিন পর তার মৃত-পচা কাদামাখা ক্ষতবিক্ষত দেহটি খুঁজে পায়। লেখকের কথায়— " . . .লোকটার নাম ভাসান। নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপের কাছাকাছি একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা কেউ বলতে পারল ন। ফলে ওর বাড়ি ঘরে যে একটা খবর পাঠানো হবে তারও উপায় রইল না।"[৯] ভাসান-এর সঙ্গী রজনীর কথায় জানা যায় জঙ্গল কেটে আবাদ তৈরির কাজে যে সকল কাঠুরেরা আসে, ভাসান-এর মতো প্রায় নব্বই ভাগ মানুষেরা এভাবেই অকালে বাদার হিংস্র জন্তুর মুখে প্রাণ হারায়। তাদের বাড়ির লোকেরা একান্ত আপনজনের মৃত্যুর শেষ খবরটাও পায় না। আসলে অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত, দরিদ্র মানুষেরা আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে জঙ্গলে আসে অর্থ উপার্জনের আশায়। ভাসান, রজনী ও অন্যান্য কাঠুরেরা এদেরই প্রতিনিধি।

কাঠুরে দলের শুকদেবের কথায় প্রকাশ পায় সুন্দরবনের বিষধর সাপের বিষ বিক্রির কথা। আবাদ তৈরির কাজে এসে একটি বিষধর সাপ ধরে শুকদেব বলে— "জীবনে এরকম কত সাপ ধরেছি তার ইয়ত্তা নেই। আগে সাপ ধরতাম, আর বিষ বার করতাম। সাপের বিষ বিক্রি হয় জান;"[১০] শুকদেবের মতো নোনাভূমির বহু মানুষের কাছে সাপের বিষ বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি অজানা নয়। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ আর পায়ে পায়ে বিষধর সাপ। তাই এই অঞ্চলের মানুষকে প্রতিনিয়ত হিংস্র বাঘ, কামট-কুমির ও বিষধর সাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। আবার এরই পাশাপাশি আছে প্রকৃতির রুষ্ঠতা। যুগ যুগ ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদ তৈরির কাজে দলে দলে মানুষ এসে নির্বিচারে গাছ কেটে অরণ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। ফলে প্রকৃতিও তার হিংস্র-করাল রূপ নিয়ে দিনে দিনে মানুষের প্রতিস্পর্ধী হয়ে সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠেছে বলে মনে করে কাঠুরে দলের শুকদেব। নদীর জলে হঠাৎ একটি মৃত মানুষ ভেসে আসতে দেখে দলের অন্যদের কাছে সে বলে— "কে যে ওকে ওভাবে মেরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে আমার কাছে এখন তা পরিষ্কার। . . .এই জঙ্গলই ওকে দাঁত বসিয়ে খতম করে ভাসিয়ে দিয়েছে। . . .বিশ্বাস করলে না তো ? এখনও আমি বলব এই জঙ্গল বদলা নিয়েছে গো। জঙ্গলের কীর্তি তো আর জানে না, টেরটি পাবে একদিন। . . .কুছ

পরোয়া নেই, আমরাও একদিন জঙ্গলের বিষদাঁত তুলে ডুগডুগি বাজাব দেখে নিশ।"[১১] নোনাভূমির হিংস্র অরণ্য-প্রকৃতি মানুষের কাছে হার মানতে চায় না। জীবিকার তাগিদে জল-জঙ্গল, হিংস্রশ্বাপদ ও জন্তুতে ভরা অরণ্যভূমিতে এই অঞ্চলের মানুষকে নিত্য যাতায়াত করতে হয়। মানুষ ও প্রকৃতির লড়াই তাই যুগ যুগ ধরে নিরন্তর বহমান। তবু সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে নরেন্দ্র নারায়ণবাবুর অধীনে ঈশানের মতো ভূমিহীন, গৃহহারা ছিন্নমূল মানুষেরা বুড়ো বাসুকির তীরে গড়ে ওঠা নোনা দ্বীপের জঙ্গল হাসিল করার কাজ করে। লেখকের কথায়— "জঙ্গল পুরোপুরি সাফ করে আবাদ বানাতে পারলে নাকি ভাগ্য খুলবে। এখানকার সব কজনকেই জমি দেওয়া হবে। চাষের জমি, বাসের জমি। তখন যে যার ইচ্ছে মতো নিজের জমিতে ঘরদোর বানিয়ে নিতে পারবে। হ্যাঁ, একমাত্র এই আসাতেই এতগুলো লোক এসে হাজির হয়েছে এখানে।"[১২] শত বিপদ ও প্রতিকূলতার মধ্যে ভূমিহীন মানুষেরা দলবেঁধে জল-জঙ্গলাকীর্ণ নোনা দ্বীপে এসে বহুমুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

'বাগদা' উপন্যাসেও দেখা যায় মাসিক বেতনের বিনিময়ে বিভিন্ন দ্বীপ থেকে জলকরে কাজ করতে এসেছে বিনোদ, ভোলা, নন্দ, বলাই, বিষ্টু ও ম্যানেজার ভাইদা। শুধু তাই নয়, নোনা দ্বীপের বহু মানুষ কর্মের সন্ধানে, অর্থ উপার্জনের আশায় নদী ও তার শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যায়। ক্যানিং-এর কালী কাঁটাদার ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বাবা-মাকে ফেলে একা একা হরিণচকে এসে মাছের ব্যবসা শুরু করে। কালী কাঁটাদার সম্পর্কে শিবু জানায়— "একা মানুষ। ওর বাপ মা থাকে ক্যানিংয়ের কাছে। ওখানে ও এদের মাছের ব্যবসা। বাপের সঙ্গে বনে না বলে কালী এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেচে।"[১৩] কালী কাঁটাদারের মতো সুন্দরবনের বহু মানুষ এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে এসে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে অর্থ উপার্জন করে।

জলকর ছাড়া শিবুকে অন্যভাবে আয়ের পথ দেখায় হরিণচকের পঞ্চায়েত প্রসন্নবাবু। আসলে শিবুকে হাতে রেখে বিরোধী দলের শিবুর দাদা ভরতকে জব্দ করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রসন্নবাবু শিবুকে নিজের বাড়িতে কাজের সুযোগ দেয়। তিনি বলেন— "মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে কাজ করে যাস। এই ধর মাটি কুপিয়ে দিয়ে গেলি, পুকুর থেকে কিছু মাছ তুলে দিলি, কিংবা চাষের সময় তো কত কাজ। আমাকে তো জন লাগিয়েই করাতে হয়। এবার থেকে না হয় তোকে দিয়েও করাব। তুই তো দু'চার পয়সা পাবিই, আলায় না খেয়ে এখানেই ভাল মন্দ যা রান্না হয়, খেয়ে যেতে পারবি।"[১৪] অক্ষয়বাবুদের জলকরে পাহারাদারের চাকরির পাশাপাশি পঞ্চায়েত প্রসন্নবাবুর বাড়িতে নানা প্রকার কাজ করে কিছু অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ পেয়ে শিবুর জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন দেখা দেয়।

কৃষিকাজ অপেক্ষা অধিক লাভের আশায় সুন্দরবনের নোনা আবাদে দিনে দিনে জলকরের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। প্রথমে হরিণচকে পরে পুঁইখালি ও হাঁসুয়ায় নতুন জলকর গড়ে উঠেছে। শিবতলার দু'কিলোমিটার দূরে হাঁসুয়ার ঘেরিতে উন্নত পদ্ধতিতে ব্যাপক হারে চিংড়ি চাষের জন্য কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়েছে। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে নোনা আবাদে চিংড়ি চাষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইঞ্জেকসন দিয়ে কম সময়ে বেশি সংখ্যক বড় বড় চিংড়ি পায় হাঁসুয়ার ঘেরিদাররা। এরই পাশাপাশি মানুষের চিরন্তন বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রকাশ ঘটেছে হরিণচকের জলকরে। সেখানে মাছের দেবতা মাকাল ঠাকুরের পুজো দিয়ে দৈব বলের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে সবাই।

নোনা আবাদে মানুষের কর্মহীনতা, অভাব ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে চুরি ডাকাতি বেশি হয়। এছাড়া— "দস্যুবৃত্তির পক্ষে সুন্দরবন এক অতি উত্তম ক্ষেত্র। এখানে জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা করিয়া বনাঞ্চলে আত্মগোপন করা সহজ। জঙ্গলাভ্যন্তরে নদীনালার প্রাচুর্য। তন্নিমিত্ত পলায়নের পথও সুগম। দক্ষ দস্যুদের নিকট গহীন অরণ্যের নৌপথও অজানা থাকে না।"[১৫] অক্ষয়বাবুদের ঘেরির বাগদা ভোরের বাজারে সতীশ কাঁটাদারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতি হয়ে যায়। ডাকাত দলের প্রধান মামু ও তার সঙ্গী দেবু এবং পচা লাঠির ঘায়ে মাছ বাহক বিনোদের মাথা ফাটিয়ে মাছের ঝুড়ি নিয়ে পালায়। সর্বাঙ্গে রক্তের ফুলঝুরি নিয়ে উঁচু বাঁধের ওপর থেকে নদীর ভিতর আছড়ে পড়ে বিনোদ। ডাকাত দল ধরা যায় নি, কিন্তু ডাকাত দলের মামু ভালো মানুষ সেজে আলায় এসে ভাইদার কাছে জোর করে কার্তিক পূজোর নামে পাঁচশ' টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে হুমকী দেয় সে। রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য বিনোদকে তুলে এনে আলায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ভাইদা। জ্ঞান ফিরে যন্ত্রণা-কাতর বিনোদ বাড়ির কথা ভাবে। ভাবে তার এই মর্মান্তিক জখমের খবর স্ত্রী পার্বতী বা পরিবারের অন্য কেউ কোনো ভাবে জানতে পারে না। বাড়ি থেকে আসার সময় সে প্রতিমাসে টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু ঘেরির কাজে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘ আড়াই মাস সে বাড়ি যেতে পারেনি। তার স্ত্রী পার্বতী যে কেমন করে সংসার চালায় তাও সে জানে না।

নদী-সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন, জল-জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপগুলিতে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলের ওপর প্রশাসনিক দৃষ্টি তেমন তীক্ষ্ণ না হওয়ায় এই অঞ্চলে চুরি-ডাকাতির পাশাপাশি মানুষ মানুষকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করে না। 'বনবিবির উপাখ্যান'-এ দেখা যায় চৌধুরী আলার ঈশানের নেতৃত্বে বিনা অপরাধে লক্ষণকে আলার সকলে নির্মমভাবে হত্যা করে নদীর জলে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু এই অপরাধের জন্য তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। আলার নতুন ম্যানেজার— "রজনী বলল, সব সময় মাথা গরম না করে কাজ

করবি, . . .ভাগ্যিস এ সব জায়গায় থানা-পুলিশের ভয় নেই, নইলে সব ব্যাটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেত।"[১৬] 'বাগদা' উপন্যাসে মাছের কাঁটাদার সতীশের কণ্ঠেও নোনা দ্বীপের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবনতির কথা শোনা যায়। সামান্য মাছের কাঁটাদারের ব্যবসা তার, তবু পুলিশ-দারোগার পকেটে টাকা গুঁজে দিতে হয়। জলকরে ডাকাতি হলে জীবন দারোগা এসে তল্লাশির চেষ্টা না করে বাছাই সাইজের বাগদা নিয়ে বাড়ি ফেরে।

উপন্যাসের শেষে মামু ডাকাতের দল জলকরে এসে অন্যায় ভাবে চড়াও হয়। ভাইদাকে মেরে, আলাঘর লুট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। জলকরের মালিক অক্ষয়বাবু নিজের চোখে এই সর্বনাশের ছবি দেখে। " . . .অক্ষয়বাবু বুঝতে পারেন ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই গেছে। ভেড়ির মাছ কোঁচড় ভরে নিয়ে ওরই চোখের সামনে দিযে পালিয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু বলার উপায় নেই। এই বাদাবনের দেশে এ সবই বুঝি স্বাভাবিক।"[১৭] এই ঘটনায় ভাইদা ও বিনোদ ঘেরি উঠে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে থাকে। হরিণচকের জলকর বন্ধ হলে ভাইদা ও বিনোদ সহ বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। তবু সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও আবাদের দরিদ্র মানুষেরা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। শিল্পী বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে আবাদের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক সংকটের প্রতি আলোকপাত করে তাদের জীবন-সংগ্রামের নানা দিক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। বহু চরিত্রের সমাগমে এই উপন্যাসদ্বয়ের আখ্যায়িকায় আদ্যন্তই নোনাভূমির জীবন-সংগ্রামী মানুষের জীবনচিত্রকে সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. বনবিবির উপাখ্যান, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, ডিসেম্বর, ১৯৫৮, পৃ.-২

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-১১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪২

৫. বাগদা, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭১, পৃ.-৪৫

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৩

৮. সুন্দরবনের ইতিহাস, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৯৫-৯৬

৯. বনবিবির উপাখ্যান, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, ডিসেম্বর, ১৯৫৮, পৃ. ১১১

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৪৯

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৫৮

১৩. বাগদা, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭১, পৃ.-৫৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৮

১৫. সুন্দরবনের ইতিহাস, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ.-১৪৭

১৬. বনবিবির উপাখ্যান, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, ডিসেম্বর, ১৯৫৮, পৃ.-২৬৬

১৭. বাগদা, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭১, পৃ.-১৪৭

গ্রন্থপঞ্জি

১. বনবিবির উপাখ্যান, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, ডিসেম্বর, ১৯৫৮

২. বাগদা, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭১

৩. সুন্দরবনের ইতিহাস, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০

৪. সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ, ধূর্জটি নস্কর, শ্যামলী পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭

৫. সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সমকালের জিয়নকাঠি, দুলাই-ডিসেম্বর,স ২০১১

৬. সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সমকালের জিয়নকাঠি, জানুয়ারি-জুন, ২০১৪

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

মহামারী ও বাংলা কথাসাহিত্য

ড. জয়ন্ত কুমার সিন্‌হা মহাপাত্র

উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত বিচ্ছিন্নভাবে মহামারীর কবলে পড়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে মহামারী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৮ সালে প্লেগ, ১৮৯৯ সালে কলেরা ও ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু বাংলা তথা সারা ভারতকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় মহামারী নিয়ে যেমন গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে ভারতে সেরকম হয়নি। বাংলা সাহিত্যেও খুব একটা তার পরিচয় নেই, যা আছে তা নিতান্তই অল্প। অথচ বিদেশের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় ইতালিয় গল্পকার জোবান্নি বোকাচ্ছোর ১৪ শতকে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে ব্ল্যাক প্লেগ নামক মহামারীর মৃত্যু নিয়ে লিখে ফেললেন একশোটি গল্পের একটি সংকলন 'ডেকামেরন'। আমেরিকান লেখক এডগার এলান পো লিখলেন 'দ্য মাস্ক অব দ্য রেড ডেথ' গল্প। আলবেয়ার কামু লিখলেন বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য প্লেগ'। এছাড়া মহামারী নিয়ে লিখেছেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা', স্টিফেন কিং 'দ্য স্ট্যান্ড', দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক ডোয়েন মেয়ার 'ফিভার' এর মতো উপন্যাস। 'অথচ আমাদের এখানেও মহামারী নিয়ে লেখার উপাদান কম ছিল না। আমরা যেটুকু পাই তা মহামারীর কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা, মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কথা।

বাংলা সাহিত্যে মহামারীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। সেখানে মহামারী শব্দ ছিল না, ছিল মড়ক। কারণ মহামারী শব্দের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক আছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-কালীন মহামারীর সে যোগ ছিল না। কিন্তু মড়ক বা মারী যেভাবেই বলা হোক না কেন সে সময়ের মানুষের যাপন-চিত্রকে অস্বীকার করা যায় না। লেখক লিখেছেন 'রোগ সময় পাইল। জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহাকে চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা

আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া পালায়।'[১] বাংলা উপন্যাসের আদিপুরুষ এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন ১৭৭০ সালের মহামারীর। কিন্তু আজকের মহামারীতে জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে যে সব বিধি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার পরিচয় আমরা প্রথম পাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' (১৯১৮) উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকান্ত বর্মার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য কলকাতার জাহাজ ঘাটে এসে পৌঁছে দেখেন প্রায় চোদ্দ পনেরশো মানুষ লাইন দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে। কারণ তখনও বর্মায় প্লেগ যায়নি। পাশ করতে না পারলে যাবার ছাড়পত্র মিলবে না। আবার রেঙ্গুন পৌঁছনোর পূর্বে জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কিরকম ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক লিখছেন 'চারদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিত লাগিল, কেরেন্টিন-কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine। তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র জোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য অলাদা কথা।'[২] বর্তমানে এই অতিমারীর সময় Quarantine শব্দটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু দেখা গেছে এটি একটি মহামারী থেকে বাঁচার বিধিব্যবস্থা যা একশো বছর আগেও ছিল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তার প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য সরকারি Quarantine শ্রমিক শ্রেণির জন্যই করা হতো এবং বন্দোবস্ত ছিল অত্যন্ত খারাপ। উপন্যাসটিতে ডাক্তারবাবু শ্রীকান্তকে তাই বলেছেন 'Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোনরকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্মান্তিক ব্যাপার।'[৩] শরৎচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসটিতে বর্মায় প্লেগের ভয়াবহতার চিত্র নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে বর্মা বাসকালে প্লেগের ছোবলে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। রেঙ্গুনে থাকার সময় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর স্ত্রী শান্তিদেবী ও এক বছরের শিশুপুত্র। স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু তাঁর জীবনে খুব প্রভাব ফেলেছিল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তাই প্লেগ ও তার ভয়াবহতার কথা স্পষ্টভাবেই এসেছে। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসেও প্লেগের কথা স্বল্পভাবে আছে। এই উপন্যাসের নায়ক সুরেশের মৃত্যুও হয় প্লেগ মহামারীতে সংক্রামিত হয়ে। শরৎচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও প্লেগ ও মহামারীর প্রসঙ্গ আছে। প্লেগের খেসারত দিতে হয়েছে ঠাকুরবাড়িকেও। উনিশ শতকের শেষ দশকে কোলকাতায় প্লেগের বাড়বাড়ন্তর সময় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন

রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো বোন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শোভা। তাঁর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। পরে ঠাকুরবাড়ির দুই চাকরও প্লেগে মারা যান। রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালও খুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪) উপন্যাসে সর্বনাশা প্লেগ ও মহামারীর কথা লিখলেন। সৃষ্টি করলেন জ্যাঠামশায়ের মতো চরিত্র। প্লেগের অত্যাচারে যখন কোলকাতার মানুষ দিশেহারা তখন স্বল্প সামর্থে সাময়িক হাসপাতাল খুলে উদ্বুদ্ধ যুবকদের নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যাঠামশাই জগমোহন। শ্রীবিলাস লিখছেন, 'আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না।'[৪] নিজের তৈরি হাসপাতালে আর্ত মানুষদের সেবা করতে গিয়ে নিজেই মহামারীর কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেন। রবীন্দ্র-উপন্যাসে ফুটে উঠলো প্লেগের মহামারীতে (১৮৯৮-১৯০৮) কোলকাতায় কি ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল তার চেহারা। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করে ১৮৯৮ সালে। এই মহামারী কালে স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের সহ-সন্ন্যাসীরা মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'মহাস্থবির জাতক' (১৯৪৪) উপন্যাসে। সে সময় টিকা আবিষ্কার হয়েছে। কর্পোরেশন থেকে টিকা দিতে চাইলে সাধারণ মানুষ তা নিতে চায়নি। গুজব ছড়ায় টিকা নিলে অচিরেই মৃত্যু ঘটবে। ফলে সংক্রমণ বাড়ে শহরে। মৃত্যু হয় বহু মানুষের।

তবে ব্রিটিশ-ভারতে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল ১৯১৮ সালের স্পেনিশ ফ্লু। ভারতে সেবার আশি লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই মহামারীর সাহিত্যে সেরকম পরিচয় নেই। হিন্দি কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর স্ত্রী এই ফ্লু'তে মারা যাবার পর তিনি লেখেন 'গঙ্গা' কবিতা। এতে রয়েছে মহামারীর মর্মস্পর্শী বিবরণ। তবে ১৯১৯ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক চিঠিতে এই ফ্লু ও চিকিৎসার কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বৌমার খুব কঠিন রকম নিমুনিয়া হয়েছিল। অনেকদিন লড়াই করে কাল থেকে ভালো বোধ হচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগছেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেছেন কিন্তু সুকেশীর জন্য এখনো ভাবনা আছে। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাচন খাইয়ে আসছি। ছেলেদের অনেকেই ছুটির মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যু শয্যা থেকে এসেছে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে কিন্তু একটু সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাসপাতাল প্রায়ই শূন্য পড়ে আছে— এমন কখনও হয় না— তাই মনে ভাবছি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণেই হয়েছে।'[৫]

তবে স্বাধীনতাপূর্ব বঙ্গদেশে কলেরার দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি। কলেরা মাঝে মাঝেই গ্রামাঞ্চলে দেখা দিত। কিন্তু কলেরা ভারতে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে ১৯১৫ সালে। তাই দেখা যায় শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ লেখকদের লেখায় কলেরার কথা বারবার উঠে এসেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-ছোটগল্পে কলেরার প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি এসেছে। তাঁর পথের দাবী (১৯২৬), শেষপ্রশ্ন, (১৯৩১), পণ্ডিতমশাই (১৯১৪), লালু প্রভৃতি লেখাতে কলেরার কথা আছে। কলেরায় গ্রামের পর গ্রাম কিভাবে উজাড় হয়ে যেত তার ছবি যেমন আছে, তেমনি আছে 'পণ্ডিতমশাই'এর মতো উপন্যাসে কলেরাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ দ্বন্দ্বও। গ্রামের একমাত্র পানযোগ্য পুকুরে কলেরা রোগীর পোশাক ধোওয়া হলে সেই জল পান করে গ্রামে মড়ক লাগে। পণ্ডিতমশাই তাই সংকল্প করেন গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা তিনি করবেন। শরৎচন্দ্র লিখছেন 'সেদিন তারিণী মুখুজ্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সংকল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহু পরিমাণে মারী ভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে।'[৬] কিন্তু ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস যে সারা গ্রামবাসীর জন্য যাঁর এত ভাবনা সেই পণ্ডিতমশাই-এর মা ও সন্তানকে হারাতে হয় কলেরাতেই। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে কলেরায় হারিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে। শমীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সরোজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মামার বাড়ি মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হন এবং মারা যান। এ শোক রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি। তাই 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে হরিমোহিনীর স্বামী ও পুত্র কলেরায় মারা যাবার পর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'যে দুঃখ কল্পনা করিলেও অসহ্য বোধ হয় তাহাও যে সয় ইহাই জানাইবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।'[৭] এ যেন রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধি। এছাড়া তাঁর দিদি, দুর্বুদ্ধি গল্পেও কলেরা ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। কলেরার ভয়াবহতার পরিচয় আমরা পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও। তাঁর 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে শুয়োরমারি বস্তিতে কলেরা কি চেহারা নিয়েছিল তা তিনি সত্যচরণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। 'সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল'। কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়। এখান হইতে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন অনেক লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই।'[৮] কলেরা মৃত্যুদূত হয়ে এসেছিল বিভূতিভূষণের পরিবারেও। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবী ও শাশুড়ী।

তারাশঙ্করও কলেরা থেকে রেহাই পাননি। কলেরায় মারা যান তাঁর পিসেমশাই ও পিসতুতো ভাই। পিসি শৈলজাদেবীর শোক তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এই পিসির আদলেই 'ধাত্রীদেবতা'য় (১৯৩৯) নির্মাণ করেন পিসিমা চরিত্র। ধাত্রীদেবতা'য় কলেরার প্রসঙ্গ আছে। শিবনাথের গ্রামে কলেরার মড়ক-মহামারী দেখা দিলে কলকাতা থেকে সুশীল আর পূর্ণ আসে কলেরার ওয়ার্ক করার জন্য। তারা বলে 'এসেছি আমরা কলকাতা থেকে। আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্টে কলেরার ওয়ার্ক করার জন্যে একটা আপীল দিয়েছিলেন কাগজে। আমরা তাই এসেছিলাম।'[৯] এছাড়া তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসেও কলেরার কথা আছে। সেখানে কলেরা মারীর বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন লেখক। গ্রামে কলেরা ছড়িয়ে পড়লে নায়ক দেবনাথ যুবক বন্ধুদের নিয়ে অনেক চেষ্টা করে কলেরার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখত। কিন্তু তাঁর নিজের ঘরেই কলেরা প্রবেশ করে। তাঁর ছেলের যে কলেরা হয়েছে তা সে খবর পায় প্রতিবেশী দুর্গার কাছে। তারাশঙ্কর লিখছেন 'অন্ধকার পথের ওপর আলো হাতে দুর্গাই দাঁড়াইল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল 'বাড়ী এস শিগগির খোকার অসুখ করেছে'। দেবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক লাফে পথে নামিয়া ডাকিল। শুধু খোকা নয়, কলেরায় মারা যায় খোকার মা বিলুও। দেবু পাথরের মত অশ্রুহীন নেত্রে নীরব নির্বাক হইয়া সব দেখিল, বুক পাতিয়া নিদারুণ আঘাত গ্রহণ করিল। বিলুর সৎকার যখন শেষ হইল, তখন সূর্যোদয় হইতেছে।'[১০] তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) উপন্যাসেও রয়েছে কলেরার কথা এবং তা থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষিত ছেলেদের আপ্রাণ চেষ্টা। তারা কলেরা আটকাতে বিশুদ্ধ জলের আশায় কুয়ো খুঁড়তে কোদাল ঘাড়ে নিয়েছে। তাদের নাম হয়েছে 'কোদলি ব্রিগ্রেড'। লেখক লিখছেন, 'শুকনো পুকুরের তলায় কুয়ো কেটে তার জল বের করলে। কথাটা কারুর আগে মনে হয়নি। স্যানিটারি ইনস্পেকটরেরা পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলে দিয়ে জলকে শোধন করলে। এন্টি কলেরা ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিলে। 'কলেরার টিকে।'[১১] এছাড়া বাংলাদেশের লেখক জাহির রায়হান-এর 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) ও হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি' (২০০৬) উপ্যাসেও কলেরা মারী মড়কের কথা আছে। তবে কলেরাকে উপজীব্য করে বাংলা কথাসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প লেখা হয়েছিল তার লেখক নজরুল ইসলাম। নজরুলের 'স্বামীহারা' গল্পটিতে কলেরায় আক্রান্ত মানুষদের সেবায় দুই নারীর স্বামী ও পুত্রের লড়াই-এর জন্য গর্ব, ভয়, আতঙ্ক এবং মনস্তাত্ত্বিক নানাদিক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন নজরুল।

বিশ শতকের 'চারের দশক পর্যন্ত ম্যালেরিয়া ছিল গ্রামাঞ্চলের আতঙ্কের অসুখ। মাঝে মাঝে তা প্রায় মহামারীর আকার নিত। স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যেও তার ছায়া পড়েছে। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (১৯১৮), 'কাশীনাথ' (১৯১৭),

'আলোছায়া' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গ আছে। তবে সেকালে ম্যালেরিয়ার জ্বর ও মৃত্যুকে গ্রাম বাংলার মানুষ স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই দেখতো। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র লিখছেন, 'তোমাদের সব আদিখ্যেতা, বলিয়া বৌ চলিয়া গেল। রান্নাঘর হইতে পুনরায় কহিল, জ্বর হয়েছে কবরেজ ডেকে পাঁচন সিদ্ধ করে দাও। ম্যালেরিয়ার জ্বরে আবার খায় না কে ? আমাদের দেশে ওসব উপোস-টুপোসের পাঠ নেই বাপু!'[১২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর কথা আছে। 'পথের পাঁচালী'র (১৯২৯) দুর্গা তো ম্যালেরিয়াতেই মারা যায়। বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'কিছুদিন পরে দুর্যোগের শেষে এক প্রসন্ন শারদ প্রভাতে যখন সমস্ত পৃথিবী সূর্যালোকে উজ্জ্বল, তখন ম্যালেরিয়া জ্বরের শেষ পর্যায়ে খুব জ্বরের বিরামে দুর্গার-হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল।[১৩] প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পেও ধরা পড়েছে গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্তের কথা। ম্যালেরিয়ার মতো বসন্তও টীকা আবিষ্কারের পূর্বে মহামারীর আকার নিত। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), শিবরাম চক্রবর্তীর 'দেবতার জন্ম' গল্পে সে চিত্র ধরা আছে।

তথ্যসূত্র

১. আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ১৪১৭, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬৫৪।

২. শ্রীকান্ত (২) শরৎচন্দ্র রচনাবলী (১) যূথিকা বুকস্টল, বইমেলা ২০০৬, পৃ. ৪৪০।

৩. তদেব।

৪. চতুরঙ্গ, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, নবম খণ্ড, প.ব. সরকার, ১৯৬১, পৃ. ৬৬৭।

৫. চিঠিপত্র (৬) ৩০ নং চিঠি, বিশ্বভারতী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৮-৬৯।

৬. পণ্ডিতমশাই, শরৎচন্দ্র রচনাবলী (১) প্রকাশক : যূথিকা বুক স্টল, বইমেলা ২০০৬।

৭. গোরা, ৩৭ পরিচ্ছেদ, রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক নবম খণ্ড, সংস্করণ ১৯৬৯, পৃ. ১৭১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৮. আরণ্যক, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭১, পৃ. ৫২-৫৩।

৯. ধাত্রীদেবতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, পৃ. ৭২।

১০. গণদেবতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রকাশকাল ২০০৮, পৃ. ২২৫।

১১. আরোগ্য নিকেতন, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৪০৫, পৃ. ২০৬।

১২. অরক্ষণীয়া, শরৎচন্দ্র রচনাবলী (১) প্রকাশক : যূথিকা বুক স্টল, বইমেলা ২০০৬।

১৩. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ২০০-২০১

শরৎ সাহিত্যের সমাজ ভিত্তিতে অতিমারীর স্বরূপ সন্ধান

ড. রামশঙ্কর প্রধান

জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন, মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে" (সুচেতনা)। আমরা এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, মনে হচ্ছে আমরা যেন এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতে পা বাড়িয়েছি, যে ভবিষ্যতে কোন আশা নেই, উদ্দেশ্য নেই, ভালোবাসার আনন্দ নেই। কেবল 'কিছু নেই' কে সঙ্গী করে সঙ্গোপনে সকলের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে শুধু কালযাপনই যেন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই জীবনানন্দীয় ভাষায় বলতে হয় আমাদের সামনে 'কোথাও কোন আলো নেই/কোন কান্তিময় আলো।' যা আমাদের জীবন ও সমাজ তথা এ বিশ্বকে এই মহামারীর সংকট থেকে মুক্তি এনে দিতে পারে। সারাবিশ্বে অজানা এক আতঙ্কের নীলবিষ যেন ছড়ানো। করোনা ভাইরাস এর মহামারীর প্রকোপে মৃত্যুভয়ে মানুষ আজ গৃহবন্দি— শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের মতো আমরা তো বলতে পারি না, মৃত্যু ভয় আবার ভয় কি ?— না, ভয় নিশ্চয়ই করব না। 'জন্মিলে মরিতে হবে'—এই বিজয় মন্ত্র আওড়েও নিশ্চিন্তে বসে থাকব না। মানুষই তো 'দেবতা গড়ে'। আজ থেকে ১০০ বছরের আগে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে আজকের মতো এক মহামারীর কবলে বিশ্ববাসী আক্রান্ত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টায় মানুষই প্রতিষেধক আবিষ্কার করে মানুষের জীবন দান করেছিল। আজ একবিংশ শতাব্দীতে আমাদেরও স্থির বিশ্বাস, পৃথিবী আবার শান্ত হবে— সুস্থ হবে, সব অসুখ কেটে যাবে, মানুষের জয় হবে।

এই জয়, তথা মানব জাতির এগিয়ে চলার নেপথ্যে আমাদের সমাজকে অনেক প্রতিকূল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সমাজ তো আসলে অবশ্য পালনীয় নিয়ম নিগড়ে বাঁধা বিশিষ্ট জনপদ। স্থান-কাল, জাতি-ধর্ম ও সংস্কার সেই সমাজকে বিশিষ্টতা দান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের অন্দরে যে সংকীর্ণ সংস্কার মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত

ছিল, সেখানে উচ্চ-নীচ, জাত-অজাত, বর্ণবিচার সমাজ ভিত্তির মূলে অবস্থান করত। শিক্ষার সার্বিক প্রসার না থাকার কারণে গ্রামবাংলার জীবনে সংস্কারের প্রসারিত আলো, সর্বদা সর্বস্তরে পৌঁছাত না। এই বাস্তব ভিত্তিতে রমেশ, পণ্ডিতমশাই-এর মতো কিছু সমাজ সেবকদের সাহসে ভর করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র পীড়িত জীবন মহামারী থেকে বাঁচার শক্তি সঞ্চয় করত। শরৎ সাহিত্যের সমাজ ভিত্তিতে সংস্কারের নিগড়ে মহামারীর সন্ধানে আমরা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি।

শরৎচন্দ্র পল্লী জীবনের রূপকার। ভবঘুরে লেখক দেবানন্দপুর-ভাগলপুর-কলকাতা-ব্রহ্মদেশ সর্বত্র বসবাসের অভিজ্ঞতায় উপন্যাস তথা সাহিত্যের স্থানিক পটভূমি ফুটিয়ে তুলেছেন। হুগলী তথা দেবানন্দপুরের বর্ণপ্রধান ব্রাহ্মণ শ্রেণির রূপচিত্র ফুটে 'উঠেছে অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) প্রভৃতি অধিকাংশ উপন্যাসে। বিহার তথা ভাগলপুর মজঃফরপুরের পটভূমি আছে 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭) প্রথম পর্বে। আংশিকভাবে 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে (১৯১৮), 'পথের দাবী' (১৯২৬) প্রভৃতি উপন্যাসে বার্মা তথা রেঙ্গুনের বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থার কথা আছে। এবং 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০) প্রভৃতি উপন্যাসে আছে কলকাতার সমাজচিত্র। সুতরাং শরৎ সাহিত্যে যে স্থানিক বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য এবং সমাজব্যবস্থার রকমভেদ চোখে পড়ে তা বঙ্কিম কিংবা রবীন্দ্র উনপ্যাসে মেলে না। বিহার-রেঙ্গুন কিংবা কলকাতার ও হুগলীর সমাজচিত্র আলোচনা করলে শরৎচন্দ্রের সমাজ ও দূরদৃষ্টির গভীরতা চোখে পড়ে।

বাংলা সাহিত্যে অতিমারী বা মহামারী সেইভাবে সাহিত্যের বিষয় হয়ে দেখা দেয়নি। বিদেশী সাহিত্যে প্লেগ, কিংবা জ্বর নিয়ে অতিমারীর স্বরূপ বোকাচ্চিও, স্টিফেন কিং ইত্যাদি সাহিত্যিকদের সাহিত্যে উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ মন্বন্তর জনিত মড়কের চিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'-এ প্লেগের কবলে সমাজ জীবনে কখনো কখনো যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার পরিচয় পাই। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বউ' (১৯১৪) উপন্যাসে বসন্ত রোগের পরিচয় পাই। সেকালে বসন্ত হলে সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ত পাড়ায় পাড়ায়। তখনো বসন্ত রোগের টীকা আবিষ্কার হয়নি, তাই যে বাড়িতে বসন্ত দেখা দিত প্রতিবেশীরা সেই বাড়ি কিংবা ওই মানুষদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলত। বিরাজ বউ-এর কণ্ঠে সেই আশঙ্কার আভাস পাই উপন্যাসে—

> "বিরাজ বলিল, যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পুজো পাঠিয়ে দিই গে, বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়ে স্বামীর কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, না জ্বর নেই। জানিনে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কান্ড

যে শুরু হয়েছে— আজ সকালে শুনলাম, আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্বাঙ্গে মার অনুগ্রহ হয়েছে— দেহে তিল রাখবার স্থান নেই।"[১]

'পন্ডিতমশাই' (১৯১৪)উপন্যাসে কলেরা উপসর্গে সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও সমাজের মানুষের সংকীর্ণ সংস্কারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বাংলার গ্রামে গ্রামে তখন বসন্ত কলেরা বাৎসরিক উৎসবের মতো এক একবার হত। লেখকের কথায়—

"প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বছর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যার রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্যন্ত টিকিয়াছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টাখানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।"[২]

যে বাড়িতে কলেরা দেখা দিত সেই বাড়ির বেশিরভাগ সদস্যই কলেরায় মারা যেত। সেদিন রাত্রেই শিবু গোয়ালার ছোট ছেলেও ভেদবমি করে গ্রামের গোপাল ডাক্তারের বিশ্ববিশ্রুত হাতযশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল। দিন কয়েকের মধ্যে বৃন্দাবনের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ও কলেরায় ভুগে মারা গেল। গ্রামে যেন মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল— 'এইবার গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পালাইবার স্থান ছিল সে পালাইল।' এ ব্যাধি ক্রমে যেন সংক্রামক রূপ ধারণ করল—লেখকের কথায়— "মৃতদেহ সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।"[৪]

তখনো গ্রামের মানুষ— খাদ্য ও পানীয় জল হিসাবে পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করত। ব্যবহারের জন্যও ঐ পুকুরের জলই ভরসা ছিল। ফলে গ্রামের মানুষ যে পুকুর থেকে খাবার জল নিয়ে যেত, সেই পুকুরেই নিজেদের স্নান, গবাদি পশুকেও স্নান করাত, ময়লা কাপড় ইত্যাদি কাচাকাচির কাজও সবই ঐ পুকুরের জলেই সমাধা করত। ফলে পুষ্করিণীর জল যে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে তা তারা বুঝতে চাইত না। গ্রামের বিশিষ্ট তারিণী মুখুজ্জের ছেলে কলেরায় মরেছে। সেই মড়ার কাপড় চোপড় নিয়ে মুখুজ্জেদের এক বিধবা স্ত্রীলোক বৃন্দাবনদের পুকুরে কাচতে বসেছে। বৃন্দাবন দেখতে পেয়ে তাকে ঐ নোংরা কাপড় পুকুরে কাচতে বারণ করায় মুখুজ্জে ঠাকুর বৃন্দাবনকে ছোটলোক বলে যা নয় তাই গালি গালাজ দিলেন। কিছু পরে তারিণী মুখুজ্জের আত্মীয় ঘোষাল মহাশয় এসে বৃন্দাবনকে রুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"এ তোমার অন্যায় জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্র মতে প্রতিষ্ঠা করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না, দু-পাতা ইংরাজী পড়ে শাস্ত্র না মানলে

> চলবে কেন বাপু ? বৃন্দাবন একথা একশবার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মনগড়া শাস্ত্র আমি মানিনে। যা বলেছি তাই হবে। আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ মলে ও সব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন। আমার পুকুরে ও সব চলবে না...শাস্ত্রজ্ঞানী তারিনী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।"

গ্রামের একমাত্র পানীয় জলের আধার এই পুষ্করিণীর জল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজের তথাকথিত জ্ঞানীগুণীজনই নোংরা করে চলেছেন। অথচ বৃন্দাবনের টাকার জোর থাকলেও যেহেতু সে বোষ্টম জাতের তাই ব্রাহ্মণেরা নিজেদের উচ্চজাত বলে প্রতিপন্ন করার জন্য তাদের অস্তিত্বরক্ষার একমাত্র অস্ত্র অভিসম্পাদ সম্বল করে অন্য জাতের মানুষকে পদানত করত। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি, তারিণী মুখুজ্জে বৃন্দাবনকে ব্রহ্মশাপ দেন, বৃন্দাবন যেন নির্বংশ হয়।

দিন কয়েক পরে বৃন্দাবনের গ্রাম বড়ালে ওলাওঠার প্রভাব ভয়ানক আকার ধারণ করে। দিনে প্রায় দশ-বারোজন লোক মারা যাচ্ছে। একদিন রাত্রে বৃন্দাবনের মা বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। বৃন্দাবনের মায়ের শ্রাদ্ধের দিন— তার একমাত্র পুত্র চরণের ভেদবমি শুরু হয়। এই অংশে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার নিম্নরুচির সংস্কার ও হীনমন্য স্বার্থপর মানসিকতার নগ্ন চিত্র শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহযোগে বিষয়টি গোচরে আনতে চাই—

> ঘণ্টাখানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা-দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক, কিন্তু সে নির্দোষ। অতি শিশু। ডাক্তারবাবু একবার পায়ের ধুলো দিন, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখিলে আপনারও মায়া হবে।
>
> গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুজ্জ্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা ? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা-দুটোই মাথায় ধরতে হবে!
>
> বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছু মাত্র অপমান করিনি। যা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম—

> সমস্ত গ্রামের ভালোর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি তো জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়।
>
> গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া, বলিলেন, অন্যায় বৈকি। মামা ভারি অন্যায় করেছে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু-ছত্তর ইংরিজী পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছ। এতবড় পুকুরে দু-খানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়। আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই। নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও ? এত বড় দর্প! এত অহংকার যাও-যাও-যাও— আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।... ...গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হলে খুলে বলি, ওখানে গেলে আমাকে এক ঘরে হতে হবে। এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন— না বাপু, তারিণী মামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি। টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সে তো হবার জো নেই! তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলে মেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু! কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু ? তখন তোমাকে নিয়ে তো আমার কাজ চলবে না![৬]

শরৎ উপন্যাসে সমাজের শ্রেণি বিভাজন ও পল্লী জীবনের অনুপুঙ্খ বাস্তব সমস্যার চিত্র জীবন্ত। 'পল্লী সমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি প্রায় সব উপন্যাসেই দেখতে পাই, কেউ যদি গ্রামের মূল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে 'তৎক্ষণাৎ ক্ষমতাহীনতার ভয়ে ক্রুদ্ধ দিশেহারা হয়ে পড়ে শাসক প্রভু' (শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)। এখানে মুখুজ্জে বা ঘোষালরা জমিদার নন, শাসকও নন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যত্বের মিথ্যা অভিমানে, নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য, মিথ্যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে গ্রামের মানুষের ক্ষতিসাধন করছেন। জাতের নামে বজ্জাতি বোধ হয় একেই বলে। ডাক্তার সাধারণ লোকের কাছে ভগবান স্বরূপ। সমাজের হিতে তার বিধান সকলে মেনে চলে। কিন্তু এখানে গোপাল ডাক্তার যেন মূর্তিমান কুসংস্কারের প্রতিমূর্তি। সমাজের হিতের চাইতে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমাজকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে তার বাধে না। এর ফলে পরিণামে বৃন্দাবনের ছেলে চরণ, বিনা চিকিৎসায় বিসূচিকায় ভুগে ভুগে অচৈতন্য অবস্থায় তার মা কুসুমের কোলে নিঃশব্দে প্রাণ ত্যাগ করে। সমাজনীতির যূপকাষ্ঠে সে সময় অতিমারীর কবলে গ্রামের মানুষ সবদিক দিয়েই সর্বশান্ত হত।

বর্তমানে আমরা বিশ্ব মহামারীর কবলে আক্রান্ত, শঙ্কিত জীবন অতিবাহিত করছি। মৃত্যুভয়ই সভ্যতার সমস্ত গতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই অতিমারী যেন প্রকৃতির নিয়মে

ঘুরে ফিরে আসে। আগেও এসেছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৮) উপন্যাসে বিশ্বমহামারীর প্রেক্ষাপটে সুদূর বার্মা প্রদেশে এই অতিমারীর প্রভাবের চিত্র পাই। সময়টা ১৯১৮ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবয়তার মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বোস্টন শহরের সেনা ছাউনিতে সৈনিকদের মধ্যে প্রথম জ্বরের প্রকোপ দেখা দেয়। সেনা ব্যারাকের ডাক্তার এই জ্বরকে প্রথমে মেনেঞ্জাইটিস বলে সন্দেহ করেন।

> "সে সন্দেহ পাল্টে গেল পরদিন। দেখা গেল এক ডজন সেনাও ওই একই লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ১৬ সেপ্টেম্বর ভর্তি হল ৩৬ জন। ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যারাকের মোট ৪৫,০০০ সেনার মধ্যে অসুস্থ ১১৬০৪ জন। মহামারী চলল প্রায় দেড় বছর। আক্রান্ত ব্যারাকের এক-তৃতীয়াংশ সেনার মৃত্যু। প্রায় ৮০০ জনের।"[৭]

এই মহামারী স্প্যানিশ ফ্লু নামে পরিচিত। যা আসলে এক ভাইরাসের কারণে ছড়িয়েছিল। মানুষকে সেদিন নিরাপদে থাকার ও সাবধানে থাকার সব রকম নিদান দিয়েছিল— রেডক্রশ সোসাইটি। বিজ্ঞান এই অতিমারীর উৎস খুঁজে বের করতে করতে সমাজে মড়ক মহামারীর আকার ধারণ করত। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ সেই অতিমারির এক একটি নাম। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে প্লেগের আক্রান্ত হবার চিত্র আছে। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় সে অভিজ্ঞতা ভাগ করা যেতে পারে—

> "পরদিন বেলা এগার-বারোটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্মেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটা তারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়"[৮]

বাংলা সাহিত্যে বোধকরি এই প্রথম quarantine শব্দের প্রয়োগ দেখা গেল। কিছু দিনের মধ্যে রেঙ্গুনে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। শ্রীকান্তের পরিচিতি মনোহর চক্রবর্তী শহরের একটা গলিতে বাস করতেন। সেখানে হিন্দু-খ্রিস্টান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। কিন্তু বিপদের সময়ে কেউ কারুর ছায়া পর্যন্ত মাড়ান না। শ্রীকান্ত সেদিন ঐ গলির মধ্যে মনোহরবাবুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। মনোহরবাবু প্লেগে মারা যান। শ্রীকান্ত তাঁর সমস্ত সেবা করে নিজেও আক্রান্ত হন। শহরের জীবন যাত্রায় নিজে বাঁচলে

বাপের নাম। অসুস্থ হয়ে পড়লে সরকারী হাসপাতাল ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভাগ্যিস অভয়া ছিল তাই এ যাত্রায় শ্রীকান্ত প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। বর্তমানের সঙ্গে যেন কোথাও এর যোগসূত্র আমরা দেখতে পাই।

'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসে বিহারের ডিহরী অঞ্চলে প্লেগ রোগের প্রভাবে যে মহামারী দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুরেশ ডিহরীতে মানুষকে প্লেগ রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য মাঝুলি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্লেগের ভয়বহতা এমনই ছিল যে গ্রামের পর গ্রাম প্রায় জনমানব শূন্য হয়ে গেছে, মৃতদেহ সৎকারেরও লোকজন পাওয়া কঠিন। সুরেশকে ফিরিয়ে আনার মানসে অচলা দোলায় করে মাঝুলি যাবার পথে দেখতে পায় একটা মৃতদেহর একখণ্ড বাঁশে বেঁধে জনা কয়েক লোক বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে গ্রামের স্ত্রীলোকদের কান্নার রোল যেন থামতে চায় না। কোথাওবা গোটা দুই অর্ধগলিত শব নদীর ঘাটের কাছে আটকে আছে। গ্রামের লোক জন এই অতিমারী থেকে বাঁচতে গ্রাম ছেড়ে তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেছে— লেখকের কথায় সেই ভয়াবহ চিত্র যেন চাক্ষুস হয়—

> "ইহার পর হইতে প্রায় গ্রামগুলাই পরিত্যক্ত, শূন্য, কদাচিৎ কোন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি ভিন্ন যে যেথায় পরিয়াছে পলায়ণ করিয়াছে। কোথাও শব্দ নাই, সাড়া নাই, ঘর দ্বার রুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন— মনে হয় যেন কুটীরগুলো পর্যন্ত মরণকে অনিবার্য জানিয়া চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।"[৯]

'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসে বার্মা মুলুকের সমাজ পটভূমিতে বসন্ত রোগের পরিচয় লেখক দিয়েছেন। রেঙ্গুনে অপূর্ব চাকরি নিয়ে পৌঁছানোর কিছুদিন পরে সেখানে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। ইংরেজ, বর্মী, চন, খ্রিস্টান, তেলেগু, পর্তুগীজ, মাদ্রাজী, ইহুদি প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের মিশ্রণে রেঙ্গুনের বিচিত্র সমাজ জীবন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম সংস্কার ও জাত্যাভিমান নিয়েই বর্তমান। অপূর্ব ব্রাহ্মণ সন্তান তাই সঙ্গে করে কলকাতা থেকে তেওয়ারীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তেওয়ারী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বর্মায় তখন বসন্তের প্রকোপ মহামারীর আকার নিয়েছে। বসন্ত রোগ হয়েছে জানলে পুলিশ এসে সেই সব রোগীকে হাসাপাতালে ভর্তি করে দিচ্ছে। আর হাসপাতালে গেলে প্রায় বিনা চিকিৎসায় বেশিরভাগ লোক মারা যায়। সে কারণে অনেকে গোপনে বাড়িতে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে। অপূর্বর বাসার পাশে দিন কয়েক আগে কয়েকজন তেলেগু কুলিকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তেওয়ারীও দরজা খিল দিয়ে পড়েছিল। অপূর্ব তখন ভামোতে অফিসে ছিল। ভারতীর অনেক ডাকাডাকিতে বসন্ত ক্লিষ্ট তেওয়ারী দরজা খুলে— "ভারতীর পা দুটো সে দু হাতে চেপে ধরে একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, মাইজী,

আমাকে পেলেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমি আর বাঁচব না। কথাটা মিথ্যা নেহাত নয়, ফিরতে কাউকে বড় শোনা যায় না। সেই ভয়ে সে দোর-জানালা দিবারাত্রি বন্ধ করে পড়ে আছে— পাড়ায় কেউ ঘুণাক্ষরে জানলে আর রক্ষে নেই।"[১০] সে যাত্রায় ভারতী ছিল বলে অপূর্ব ও তেওয়ারী অন্তত প্রাণে বেঁচেছিল।

'শেষ প্রশ্ন'-এ দেখা যায় আগ্রা ও বৃন্দাবন অঞ্চলে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের প্রকোপ সে সময় এপিডেমিক ফর্মে শুরু হয়। বিশেষত বস্তি এলাকাগুলোতে এই জ্বরের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ায় শহরবাসীর মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ঐ বস্তি এলাকাগুলো থেকেই তো শহরের বাড়িগুলোতে কাজের মাসিরা কাজ করতে আসত। আজকের মতো তখনও কমিউনিটি সংক্রমণের ভয় মানুষকে তাড়া করত। কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ছিল ছোঁয়াচে। মথুরা বৃন্দাবনের মতো ঘনবসতি যুক্ত এলাকায় ইনফ্লুয়েঞ্জা তখন মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সেই আশঙ্কার খবর হরেন্দ্রর মুখে আমরা শুনতে পাই— 'ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্মেই বোধ করি শুরু হল। বস্তি গুলোতে মরতে আরম্ভ করেছে। মথুরা-বৃন্দাবনের মতো শুরু হলে হয় পালাতে হবে, নয় মরতে হবে।'

'লালু' গল্পে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা পাই। গল্পের শুরুতে লেখক বলেছেন— 'আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে হতজ্ঞান হত। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে পাড়ায় মানুষ থাকত না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুষ্কর হতো।'[১১] এই চিত্রটাই সে সময়ের বাস্তব সমাজচিত্র ছিল। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল এ সমস্ত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও গোপাল খুড়ো, বৃন্দাবন কিংবা নীলাম্বরদের মতো মানুষ তখনো সমাজে ছিল যারা নিজেদের বিপদকে তোয়াক্কা না করে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না। সেদিন বিষ্টু পন্ডিতের গিন্নী কলেরায় মারা যাওয়ার পর গোপাল খুড়ো, লালুরাই সূচী-অসূচী ভেদকে সরিয়ে রেখে সংক্রমণের ভয়কে দূরে ঠেলে রেখে দুর্যোগ উপেক্ষা করে শীতের রাতে পন্ডিত গিন্নীর সৎকার করেছিল।

মানুষের জীবনই সাহিত্যের বিষয়, সমাজ সে জীবনকে ধারণ করে এই মর্মেই তার অবতারণা। আর উপন্যাস সমাজতত্ত্ব নয়, জীবনের শিল্পরূপ, তাই শরৎ চন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সমাজকে নিখুঁতভাবে এঁকে মানব জীবনের চিরন্তন মর্মগাথাকেই রসমূর্তি দান করেছেন। সমাজের অভিঘাতে সেই জীবনবীণায় বিচিত্র সুর তুলেছেন। শরৎ সাহিত্য পাঠে আজও আমরা সেই গ্রামীণ একান্নবর্তী জীবনের সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনের মর্মগাথাকে যেন ঘটে চলতে দেখি, ঘোষাল কিংবা তারিণী খুড়োদের যেন গ্রামের চন্ডীমণ্ডপে আজও সমাজের বিধান দিতে দেখি। যাদের বিধান না মেনে রমেশ কিংবা বৃন্দাবনেরা কুসংস্কারের ঘেরাটোপ

থেকে বের করে মুক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর জীবন গ্রাম জীবনে বয়ে আনার সংকল্প আরো দৃঢ় করবে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের সাহিত্য পর্যালোচনা করেও বলা যায়, এই অতিমারীর সংকটময় রূপটি শরৎ সাহিত্যে আমরা যেভাবে পাই; অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যে সেভাবে পাই না।

উৎস সংকেত

১. সুলভ শরৎ সমগ্র— আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ.২৬।
২. ঐ, পৃ. ১১৮
৩. ঐ, পৃ. ১১৯
৪. ঐ, পৃ. ১১৯
৫. ঐ, পৃ. ১২০
৬. ঐ, পৃ. ১২৯
৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়— ২৬ জুলাই ২০২০ (কবর খুঁড়ে ভাইরাস— পথিক গুহ)
৮. সুলভ শরৎ সমগ্র— আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ.৩৪০।
৯. ঐ, পৃ. ৯৭০
১০. ঐ, পৃ. ১১৫৯
১১. ঐ, পৃ. ১৭৭৫

সৈকত রক্ষিতের গল্প : নিম্নবর্গের অবস্থান

সান্ত্বনা দেওঘরিয়া

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এই চর্যাপদ থেকেই আমরা অন্ত্যজ শ্রেণির তথা নিম্নবর্গের মানুষদের কথা জানতে পারি। তাদের জীবন-জীবিকা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সুখ-দুঃখ আমরা সেই সময় থেকেই পাচ্ছি। সেখানে বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যে নিম্নবর্গের মানুষদের পাই তাদের আর্থিক মান ছিল অনুন্নত। সেখানে দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তারও পটভূমি প্রধানত নিম্নশ্রেণির জনগণ। ডোম, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষেরা যে সমাজের নগরের বাইরে বাস করত তার কথাও আমরা পাই 'চর্যাপদে'—

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।[১]

আমরা লক্ষ্য করছি, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা সবদিনেই অবহেলিত, বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার সুর বারবার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এরপর সাহিত্য যত এগিয়ে চলেছে, এই ব্রাত্য, অবহেলিত মানুষদের কথা ততই ফুটে উঠেছে।

বহু সাহিত্যিক কলম ধরেছেন এই নিম্নবর্গের মানুষদের কথাকে তুলে ধরার জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, বিভূতি প্রমুখের পাশাপাশি বহু লেখকের লেখায় আমরা এই মানুষদের অবস্থানের কথা জানতে পারি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সাহিত্যে দেখা যায় অনেক সাহিত্যিক নগর ছেড়ে গ্রামের দিকে তাকিয়েছেন। নলিনী বেরা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিকেরা কলম ধরলেন সমাজের এই নিম্নবর্গীয় মানুষের কথাকে তুলে ধরার জন্য। এরকমই এক মুহূর্তে আবির্ভূত হলেন সৈকত রক্ষিত।

সাম্প্রতিককালের একজন স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমী লেখক হলেন সৈকত রক্ষিত। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু প্রধানত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো রুখা-সুখা মাটির মানুষদের নিয়ে। সমাজে যারা অবহেলিত, যারা শোষিত, যারা বঞ্চিত তাদের কথাকেই লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসে যেমন সাঁওতাল, শবর, বাউরি, হাড়ি, ডোম, কুড়মি, মেথর

সম্প্রদায়ের মানুষদের অবস্থানের কথা ফুটে উঠেছে, তেমনি তা লক্ষ্য করা যায় তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যেও। তাঁর গল্পগুলি মূলত পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করেই। জীবন ইতিহাসের ভেতর দিয়ে তিনি সব দিক থেকে পুরুলিয়াকে ঐতিহাসিক করে তুলতে চান।

এই স্বতন্ত্র সাহিত্যিকের কাছে রচনা মানে কী শুধুই অনুষ্ঠান ? না তা নয়, তাঁর কাছে রচনা মানেই বাস্তবনিষ্ঠ জীবনকে ফুটিয়ে তোলা। তাঁর কাছে রচনা মানেই সাহিত্য প্রণয়নের মধ্য দিযে সুর-তাল-ছন্দের অনুরণন। আর এ কারণেই হয়তো তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাননি, চাননি বলাটা ঠিক হবে না— তিনি পড়তে পারেননি কারণ "তার কারণ আমি ওসব লেখাপড়া করে চাকরি করবো, এমন স্বপ্ন তো কখনো দেখিনি।"[২] তিনি পুরুলিয়ার পলিটেকনিক কলেজের সামনে ধানক্ষেতের পাশে বসে মানিক-বিভূতি পড়তেন। আর এখান থেকেই তাঁর রচনার মূল রসদ।

গল্প লেখার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। গল্প লেখার যে চিরাচরিত প্রথা— তা তিনি মানতে পারেননি। তার কারণ "মানুষের কর্মের বিচার করতে গেলে আগে জানা দরকার কর্মের পেছনের উদ্দেশ্যটি, জানা দরকার পরিবেশটির কথা, তাই 'গল্পে আখ্যান অংশের চেয়ে তার পরিবেশের গুরুত্ব আমার কাছে অনেকখানি।"[৩]

আর পরিবেশের কথা বললেই চলে আসে অঞ্চলের কথা, সমাজের কথা। পুরুলিয়ার রুখা-সুখা মাটিতে নিত্য অভাব-অনটন লেগেই আছে, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরা এখানে কতটা যে অসহায় তা তাঁর গল্পের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। তাঁর গল্পে যেভাবে নিম্নবর্গীয় মানুষদের অবস্থানের কথা ফুটে উঠেছে তা এককথায় অভিনব। তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের সম্প্রদায়ের জীবন্ত দলিল।

গল্পকার পেশাহীন ভ্রাম্যমাণ দিনযাপনের সূত্রে গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষগুলিকে তিনি কাছ থেকে জেনেছেন। নানা অজানা কথা আমরা জানতে পেরেছি তাঁর গল্পগুলির মধ্যে। তাদের সাথে মেলামেশা করতে করতে তিনি মানব প্রেমকেই স্থায়িত্ব দিয়েছেন— "আমাদের মত দেশের একজন দরিদ্র মানুষেই বোধহয় জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যকে অনেক বেশি উপলব্ধি করতে পারে। দারিদ্র্যই জীবনের সঙ্গে যোগ করে জীবনের বহুমাত্রিকতা। আমার লেখার এই বহুমাত্রিকতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই...জন্ম নেয় অহিংস মানবিকতা ও মানবপ্রেম।"[৪] আর এই মানবপ্রেমকেই তিনি জয়ী করেছেন।

তাঁর গল্পে তাই অনায়াসেই ফুটে ওঠে এই নিম্নবর্গের মানুষদের অবস্থানের কথা, আচার-সংস্কারের কথা, রীতি-প্রথা সমস্ত কিছুই। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। নলিনী বেরার কথাতে ফুটে উঠেছে সৈকত রক্ষিতের সেই বিশেষত্বের বিশেষ দিকটিও— "তথাকথিত

নাগরিক জনপ্রিয়তা ও চটুলতা তার সাহিত্যে নেই, তেমন দায়ও তার নেই। যা আছে তা একান্তভাবেই সৎ-আঞ্চলিকতা বটে। টাঢ়-টিকড় বাঈদ বহাল-কানালী বন পাহাড় অধ্যুষিত পুরুলিয়া তথা সাবেক মানভূমি জনপদ তার সাহিত্যের দেশ।"[৫] গল্পকার নিজেও বলেছেন— "সব মিলিয়ে, লেখা মানে আমার কাছে একটা জার্নি।"[৬] —আর এই উদ্দেশ্যেই এসেছে তাঁর গল্পগুলি। তাঁর প্রায় সব গল্পগুলির মধ্যেই এই নিম্নবর্গের মানুষদের অবস্থান আলোচিত হযেছে। এখানে কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল। সেগুলি হল যথাক্রমে 'মাই কল', 'লক্ষণ সহিস', 'পট', 'শবরচরিত', 'মুলুন', 'চুন'—এই গল্পগুলি।

দারিদ্র্যকে তিনি সামনে থেকে দেখেছেন, তিনি দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তাঁর লেখার মধ্যেও সেই ছবি ফুটে উঠবে এমনটাই স্বাভাবিক। তাঁর 'পট' গল্পটিতে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি গুহিরাম চিত্রকরকে আমরা দেখতে পাই, দেখতে পাই তার সামাজিক অবস্থানের দিকটিও। তার অবস্থানের কথা, তার জীবনের কথা যখন আমরা জানতে পারি তখন তা কেবল আমাদের ভাবিতই করে না, পাশাপাশি চোখের জলও গড়িয়ে যায়। গুহিরাম একজন নিতান্তই নিম্নবিত্ত নিম্নবর্গের প্রতিনিধি, যার কাঁধের উপর আছে পরিবারের বোঝা। তাই অত্যধিক গরম আর পিঠফাটা রোদে যখন পা ফেলা যায় না পিচের রাস্তায়, তখন গুহিরামকে মাইল মাইল পথ হাঁটতে হয়। না হাঁটতে পারলে নিজেকে অসহায় বোধ করে সে। নিজের জন্য একজোড়া হাওয়াই চপ্পলের ভাবনা তার মাথায় আসে না, শোভাও দেয়না। তাই মোটা নখ, ফাটা গোড়ালির জন্য তার চিন্তা নেই, যত চিন্তা তার পেটের, যত চিন্তা তার সংসারের মানুষগুলোর জন্য।

গুহিরাম একজন পাইটকার, সমাজে তার অবস্থান একজন পাইট হিসাবেই। গুহিরামের পদবি চিত্তকর, তারা ঘুরে ঘুরে একেকটি পরিবারের পট বানাত, ছবি আঁকত, সেটাই ছিল তাদের পরিচয় ও বৃত্তিও। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তারা সাধারণ মানুষদের কাছে 'পটকার', 'পাইটকার' হিসাবেই পরিচিত হয়ে আছে। তবে আজ তাদের দারিদ্র্য ও অভাব অনটন এতটাই বেড়ে গেছে যে প্রাচীন শৈল্পিক নৈপুণ্যও হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সুবোধ দেবসেনের বক্তব্যটি বেশ প্রাসঙ্গিক "আমাদের দেশে বর্ণ-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের চিত্রটিও স্পষ্ট হযে যায়। আবহমান কাল ধরে অনার্য-উপজাতি তথা আদিবাসী সমাজ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।"[৭] গুহিরামের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এখন গ্রামের অনেক পাইটকারেরই গুহিরামের মতো হতাশা জেগেছে। তার দারিদ্র্যের গল্প আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে।

তবে গুহিরাম দরিদ্র্য হলেও তার মধ্যে রয়েছে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ। অন্যান্য পাইটকারদের মতো সে নয়। অন্যরা রাত অব্দি মদ খেয়ে ঝগড়া করে সেটা তার কাছে অসহ্য। সমাজে এদের

অবস্থান অনেকটাই দূরে। উচ্চবর্ণের মানুষেরা এদেরকে হীনতার চোখেই দেখে, কেউ আবার এদের 'চোর' বলে, অন্যরকম একদৃষ্টিতে তাদের দেখা হয়। তবুও এই পাইটকারদের মধ্যে কিন্তু স্বজাতিপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হলেও গুহিরাম কিন্তু তার জাতিকে ছেড়ে যায় না। তারা একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কারণ— "কোনো পাইটকারের হয়তো বোন দেওয়া আছে অন্য এক গাঁয়ে, সেই গ্রাম থেকে সেই পাইটকার এসে লুয়াডিতে বাস করছে। খাঁদু পাইটকারই এসেছে পুরুলিয়ার বনবহাল থেকে। ভীষণভাবে তারা স্বজাতিসঙ্গ চায়।"[৮] আর এখানে এই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার নামেই তো জীবন। এখানেই পাইটকাররা সফল, সৈকত রক্ষিতও সফল।

সমাজের এই শ্রেণির প্রতিনিধিরা বরাবর বঞ্চিত, তারা ব্রাত্য, তা আমরা আদি যুগ থেকেই দেখতে পাই। গল্পকার তাদের সংগ্রামকে সামনে থেকে দেখেছেন, তাই এদের কথাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত মানবিকতার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় " 'পট' গল্পে গুহিরাম চিত্তকরদের মতো অনালোচিত-অপাংক্তেয় মানুষকে হৃদয়ে ধারণ করে পৌঁছে গেছেন খালি পায়ে...সহস্র খালি পায়ের কাছে। এই পীড়াদায়ক অনভিপ্রেত সমাজের বৈষম্য দূর করতে তাদের হয়ে সৈকতের পক্ষে সংগ্রাম করা সম্ভব না হলেও, লেখাকেই তিনি অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলে স্বীকার করেছেন।"[৯]

গ্রামের অনেকেই পাইটকারদের চোর বলে, শিক্ষিতরা ব্যঙ্গ করে, হাসাহাসি করে তবুও গুহিরামের মতো মানুষেরা চেষ্টা করে যায় পটের মধ্য দিয়ে মানুষদের বোঝাতে। সমগ্র গল্পটির মধ্যে এক পাইটকারের জীবনসংগ্রাম এর সন্ধান দিয়েছেন গল্পকার। তবে গল্পের শেষে গুহিরামের ট্র্যাজিক পরিণতি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। লৌতনডিতে এসে একটি বাউরি ঘরে প্রবেশ করে সে, সেখানে একটি বউ তাকে ভিখারি মনে করে। তার চিৎকার চেঁচামেচিতে সবাই এসে জড়ো হয়, তাকে চোর, মনে করে মারতে শুরু করে। সে বারবার কাকুতি মিনতি করলেও কেও তার কথা শোনে না, "কেউ তার টাঁকে সজোরে চাপড় মারে, আবার কেউ তার থালা আর চালের পোঁটলাটিকেও ছাড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু গুহিরাম সেগুলো জীবনের জীবন করে তলপেটে চেপে রাখে।"[১০] সামনে ভাসতে থাকে তার সন্তানদের ক্ষুধার্ত সেই মুখগুলি। ছুটে পালালেও সে পালিয়ে যেতে পারে না, পাথরে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে যায়। গাঁট-বাঁধা চাল, থালা, কাগজ সব পড়ে এলোমেলো হয়ে যায়, গুহিরাম পড়েই থাকে। সমগ্র গল্পটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে কীভাবে নিম্নবর্গের মানুষেরা জলের গভীরতায় ডুবে যায়।

'মাড়াইকল' গল্পটির মধ্যে আমরা পাই আখ মাড়াইয়ের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র। চেপুলাল বেশরা একজন নিম্নবর্গ সমাজের প্রতিনিধি। সে নিতান্তই একজন দরিদ্র

শ্রমিক, কুঞ্জ মোদকের মুনিষ। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তার মুখে লেগে থাকে হাসিটুকু। কুঞ্জ মোদক তার কথায় রেগে তাকে গালিগালাজ করলেও তার মুখের হাসিটুকু যায় না। কুঞ্জর কাজের প্রয়োজনে শুধু চেপুলালই নয় তার স্ত্রী ভাবণি ও ছেলে হীরালাল আসে তার সঙ্গে কাজ করতে। মাংসহীন শরীরে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যায় চেপুলাল। আখ পাকার পর তাকে তোলা থেকে শুরু করে গুড় তৈরি করা সমস্ত কাজ সে একাগ্রচিত্তে করে। গুড়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভরা শীতেও সে শালঘরেই থেকে যায়। সকালে কুঞ্জ শালে আসার অনেক আগেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে কাজে লেগে যায়। ভাবণি আর হীরালাল তখনো পর্যন্ত না এলেও সে একা একাই কাজ করতে থাকে।

ঠাণ্ডায় একটা কম্বল বা চট ছিঁড়াও তার কাছে নেই। চেপুলাল কুঞ্জ মোদকের কাছে শীতের সময় একটা কম্বল চেয়েও পায় না— "সকাতর গলায় বলে, 'একটা কম্বল-তম্বল যদি থাকে ত দাও না খুড়া। আর নাই যদি কম্বল, ত গটাকতক চট ছিঁড়াই আইনে দাও। রাতের জাড়টায় বোড়ো কাঁপায়। হিলহিলা করায়।"[১১] —যদিও চেপুলালের এই কথা কানে নেয় না কুঞ্জ। আখের দণ্ড ও চেপুলাল দুজনেই পিষ্ট ও শোষিত হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত চেপুলাল একরাতে নিঃশব্দে মারা যায়। আলুথালু হয়ে পড়ে থাকে তার ছেঁড়া লুঙ্গি, কুকুরে তার তলপা, পিঠ, ঘাড় চাটতে থাকে। এই যে নিম্নবর্গের মানুষদের ট্র্যাজিক পরিণতি, তারা এত অবহেলিত, যাদের জন্য তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম তাদের কাছে চেপুলালদের মতো মানুষদের মনে কোন দায়িত্ব নেই, মানবিকতা নেই। তাদের দুঃখ, কষ্ট, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ চিরকাল নিজের মুনাফা অর্জন করে। যেমনটা আমরা দেখতে পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের মধ্যেও। যেখানে একজন মধ্যবিত্ত মানুষ মৃত্যুঞ্জয় অনাহারীদের কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তাই তাদের দলেই সে মিশে যায়। লঙ্গরখানার খিচুড়ি যাদের জন্য তারা তা পায় না, কিছু সুবিধাবাদী মানুষেরা সেগুলো ভোগ করে। যেমন ভাবে সুবিধা ভোগ করতে চায় 'শিল্পী' গল্পের মিহিরবাবু বা ভুবনের মতো লোক। কুঞ্জ মোদক সেই শ্রেণিরই প্রতিনিধি। আর চেপুলালের মতো কত চেপুলাল আমাদের সমাজে তলিয়ে যাচ্ছে, যার খবর রেখেছেন মানিক, খবর রেখেছেন সৈকত, প্রমুখ লেখকেরা। সৈকত রক্ষিতই পুরুলিয়ার প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যার রচনার মধ্য দিয়ে অখণ্ড পুরুলিয়ার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। মূলত প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। 'মাড়াইকল' গল্পে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন দুলদুলি গ্রামের আখ চাষকে কেন্দ্র করে মহাজনদের কবলে পড়া চেপুলালের মতো দিনমজুরের জীবনসংকট দেখানো হয়েছে। সৈকতের কাছে এই মানুষগুলির মূল্য অনেক বেশি, যার জন্য— "যার কাছে লেখালেখি আত্মপ্রচার নয়, আত্মতুষ্টি নয়, আত্মঅহংকার বর্জিত 'সারস্বত সাধনা'। এই সাধনাতেই তাঁর সারাজীবন

উৎসর্গীকৃত। এই কাজের জন্য নিজের পারিবারিক জীবন বিসর্জন দিয়ে পুরুলিয়াতেই 'মহাসংসার' পেতেছেন।"[১২] অবহেলিত মানুষদের জন্য তিনি চিরকাল নিজেকে উজাড় করে চলেছেন।

ভেলাইডাঙ্গা গ্রামের পাঁচঘরে মোট দু-কুড়ি শবর জনজাতির মানুষের অবস্থানের কথা, তাদের জীবনসংগ্রামের কথা, তাদের বেঁচে থাকার লড়াই নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে 'শবরচরিত' গল্পটিতে। এই শবরদের জঙ্গলের গভীরে যেতে হয়, সেখানেই তাদের দিন কাটাতে হয় পেটের তাগিদে। তাদের ছেলেমেয়েরা অনেক বয়স পর্যন্ত উলঙ্গই ঘুরে বেড়ায়। আর পুরুষদের কোমরে থাকে ময়লায় জড়ানো একটা মোটা ও ঠেঁটি ধুতি, নারীরাও একটি শাড়িকেই অবলম্বন করে দিনযাপন করে।

দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই শবরদের জঙ্গলে বেরিয়ে যেতে হয় গাছের আব, জংলি মূল, পাতপালা এসব জোগাড়ের জন্য। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পবন ও তার স্ত্রী বাহামনি। তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে কিন্তু "পাঁচজনের এই পরিবার এমনই ভ্রাম্যমান যে, তারা যেন ভুলেই যায় তাদেরও একটি ঘর আছে।"[১৩] তবে এই শবরদের ঘর বলতে কাঁচা দেওয়াল, নিচু চালা যেখানে চালার মাথায় খড় পর্যন্ত নেই, জঙ্গলের ঝাঁটি, লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া। আর দরজা বলতে শুকনো তালপাতার আড়াল।

সকালে গাঁজলা ওঠা মাড়জল খেয়ে পবন বৈশাখের চড়চড়ে রোদে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসে গাছের আব, তবে কখনো কখনো তার ভুলও হয়। এই পবন কখনো চপ খায়নি, হাইড়্যা কিম্বা মহুল মদ আর মাড়ভাত ও আমানি খেয়েই তার দিনাতিপাত হয়। তবে এই শবরদের কোনো গন্তব্যস্থল নেই, কারণ "যতদিন এই জঙ্গল— এই ডকা, কুড়চি আদি গাছ রয়েছে, ততদিন পবন শবরও আছে। জংলি অসভ্য পবন শবর।"[১৪]

'বহুরূপী কারবারে' ব্যস্ত ভক্ত দাসের কাছে তারা জংলি গাছের ছাল, জংলি মূল, গ্যেঠালা, পাতপালা বিক্রি করে, বিনিময়ে তারা পয়সা নেয় না, তাদের চায় একমুঠো চাল। পবন শবরের মতো ধুধা শবর, দিগম শবরেরাও জঙ্গলে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় পেটের তাগিদে। ভক্তর খামারে কুলোভর্তি শস্য দেখার পর পবন বুকের কান্নাকে চেপে শুকনো চোখে কাতর কণ্ঠে বলে— "দকানি, হামকে দুসের চাল ধার দা-আ-ও-ন। হামার বউটা, ব্যাটাবিটিগুলা দুদিন ল্যা উপাস দিয়ে আছে। পেটে টুকু মাড়ও পড়ে নাই।"[১৫] পবনের মতো দরিদ্র্য ও অনাহার ক্লিষ্ট এই মানুষগুলোর কাছে দুটা টাকার থেকে দুটা টাকার চালের মূল্য অনেক বেশি।

মানুষের বাঁচার আর্তি খুঁজে পাই পবনের এই আবেদনের মধ্যে। পবন শবররা খাবার খায় বেঁচে থাকার জন্য, উপভোগ করার জন্য নয়। তাদের চাওয়া পাওয়াও খুবই সামান্য।

তারা অত্যন্ত সহজ, সরল। একমুঠো ভাতের জন্য তারা কতরকমের পরিশ্রম করে, যে পরিশ্রম আমরা দেখতে পাই মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পের উচ্ছব এর মধ্যে। ভাত খাবে এই আশায় "উচ্ছব কাঠ কাটা শেষ করে। আড়াই মণ কাঠ কাটলো সে ভাতের হুতাশে, নইলে দেহে ক্ষমতা ছিল না।"[১৬] একইরকম ভাবে দুটি চালের আশায় পবন শবর ও তার একনম্বর, দুনম্বর গ্যেঠালা, কুসুম বিচ, কন্দমূল, সংগ্রহ করে তাদের পুরো পরিবার।

এইভাবে সমগ্র গল্পটির মধ্যে শবরদের জীবন-জীবিকা, তাদের অভাবের কথা, কষ্টের কথাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার। তবে এই শবর পরিবারটিতে অভাব থাকলেও মান-অপমান বোধ, আত্মমর্যাদা আছে প্রবল। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ভক্ত দাস বাহামণির শরীরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। ভক্ত লুঙ্গি তুলে অশ্লীল ভঙ্গিতে বুকে হাওয়া নিতে থাকলে বাহামণি বলে ওঠে— "হামি আর নাই থাকব গো। কেমন কথা বলছিস তুই ? বিচগুলান চাড়ে চাড়ে ওজন করে লে ত ?"[১৭] ভক্ত এদিক ওদিক লক্ষ্য করে বাহামণির পিঠের উপর হাত রাখতেই অমনি বাহামণি তার চাপা আক্রোশে ফুঁসে উঠল। ওজনদাঁড়িটি মাথার কাছে তুলে সে আক্রমণের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, "কামাইনা, তুই কথায় হাত দিচ্ছিস ?"[১৮] তখন এই চরিত্রটি সত্যিই আমাদের কাছে চিরশ্রদ্ধার, চিরসম্মানীয় হয়ে ওঠে।

এরপর ওরা এক খেত থেকে আরেক খেতে চলে যায় শিকারের উদ্দেশ্যে। ইঁদুর, সাপ শিকারের কথাও আমরা পাই গল্পের মধ্যে। সাপ-ইঁদুর এইসব তাদের প্রধান খাদ্য। সমাজের একেবারে প্রান্তে থাকা এই নিম্নবর্গের মানুষেরা আমাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। তাদের জীবনসংগ্রামের যে ছবি আমরা পাচ্ছি তাতে করে গল্পকার ও গল্প দুটিই প্রশংসার যোগ্য।

নিম্নবর্গের তথা প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিনিধি 'লক্ষণ সহিস' গল্পের লক্ষণ সহিস চরিত্রটি। এই গল্পটিতে একসময়ের জীবিকা থেকে বিচ্যুত স্বতন্ত্র জীবিকায় স্থিত মানুষদের কাহিনি ফুটে উঠেছে। হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত সহিসদের বর্তমান জীবিকা হল মোষের শিং-এর চিরুণি বানানো। লক্ষণ সহিস এই শিং-এর কাজে এতটাই পারদর্শী যে তাতে করে তার শিল্পীমনের ছোঁয়া ফুটে উঠেছে গল্পের মধ্যে। জীবিকার বাজারে যখন মন্দা নেমে আসে তখন তারা কতটা অসহায় হয়ে পড়ে, তাদের সেই যন্ত্রণার, করুণ পরিণতির দিকটিও গল্পের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

গল্পের মধ্যে তাদের জীবিকার কথা প্রসঙ্গে গল্পকার জানিয়েছেন "সেই ঝুনো শিং করাত দিয়ে কেটে, বাঁশলা দিয়ে কুঁদে বহুত কিসিমের হাতিয়ারের কারিগরি প্রয়োগে তারা পায় একটা ঝকঝকে চিরুণি।"[১৯] এই চিরুণি বিক্রি করেই তাদের সংসার চলে। তবে অভাব-অনটন এদের নিত্য সঙ্গী হলেও এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এক নির্লোভী মনোভাব।

গ্রামের সবাই যখন লটারির ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত তখন লক্ষণ কিন্তু কোনোভাবেই লোভের বশবর্তী হয়ে তার পূর্বপুরুষদের জীবিকা ছেড়ে যায়নি। আবার গল্পের মধ্যে আমরা কাজের প্রতি লক্ষণের গভীর অধ্যবসায়ের ছবিটিও দেখতে পাই। দিন দিন চিরুণি শিল্প তিল তিল করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রসারে কীভাবে গ্রামীণ কুটিরশিল্প ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যার ফলে এই হতদরিদ্র্য মানুষগুলি কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে, তারই এক মর্মবিদারী গল্প 'লক্ষণ সহিস'।

এইভাবেই আমরা দেখবো তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই নিম্নবর্গের মানুষদের সামাজিক অবস্থান, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথা লেখক খুব নিখুঁতভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন 'চুন' গল্পে ছোট ব্যবসায়ী চুনের কারবারি টুনু বোসের জীবিকার রূপ ও সমস্যা ফুটে উঠেছে। এভাবে 'খাদান' গল্পে পাথর ভাঙার কাজে যুক্ত মানুষদের জীবন, জীবিকার কথা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কথাসাহিত্যিক সৈতক রক্ষিতের এই লেখাগুলি যখন আমরা পড়ি তখন আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি তার সামাজিক দায়িত্বের কথা। আর এই দায় পালন করেন তিনি লেখার মাধ্যমেই। কারণ তিনি মনে করেন— "ছাত্রাবস্থায় বাংলা গল্প-উপন্যাস যখন পড়তাম, তখন দেখতাম যে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে পুরুলিয়ার কোনো অবদান নেই। এই অঞ্চলের জনজীবন ও ভাষা নিয়ে এমন একটি উপন্যাসও নেই যা থেকে এই জেলার সমাজ-সংস্কৃতি তথা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত হতে পারে।"[২০] আর তাই তিনি এই জেলার জনজীবনকেই সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন, আর এক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি সফল।

তাঁর ছোটগল্পে এই নিম্নবর্গের মানুষদের কথা যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি এই ব্রাত্য, অবহেলিত মানুষদের ইতিহাস রচনা করেছেন, এখনও করে চলেছেন কারণ তাঁর উদ্দেশ্যই হল পুরুলিয়ার ডকুমেনটেশন তৈরি করা। সার্বিক আলোচনার শেষে একথা বলায় যায় যে তিনি এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সফল। পুরুলিয়ার অচর্চিত ইতিহাসকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, সেটা অন্য কারও লেখায় পাওয়া যাবে না। আর সৈকত রক্ষিত এখানেই সফল।

তথ্যসূত্র

১. দাশ, ড. নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৯৮
২. রক্ষিত, সৈকত : সাক্ষাৎকার : সৈকত রক্ষিত, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত : অরূপ পলমল সম্পাদিত, ডাভ পাবলিশিং, হাউস, কলকাতা বইমেলা-২০১৩, পৃ. ২৯৫
৩. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৭

৪. রক্ষিত, সৈকত, লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম : কেন লিখি ? : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৭৮
৫. বেরা, নলিনী, 'সৈকত রক্ষিত : হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা', দিল্লি এক্সপ্রেস, বাংলা নববর্ষ ১৪২৩, রমা মণ্ডল (সম্পা.), পৃ. ৪
৬. দাস, প্রতিমা, 'সৈকত রক্ষিতের গল্প আঁকশি : আপকি কাহানি তো মুঝে বিলকুল রুলা দিয়া, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত' অরূপ পলমল সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, পৃ. ১৭৩
৭. দেবসেন, সুবোধ, 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ২১
৮. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৯৪
৯. পলমল অরূপ, 'কথাকার সৈকত রক্ষিত, খালি পায়ে যাবো সহস্র খালি পায়ের কাছে', আমি অনন্যা, প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক দীপক কুমার সেন, পৃ. ২০
১০. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১০০
১১. তদেব, পৃ. ৪৯
১২. দাস, প্রতিমা, 'সৈকত রক্ষিতের গল্প আঁকশি : আপনি কাহানি তো মুঝে বিলকুল রুলা দিয়া, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত' অরূপ পলমল সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, পৃ. ১৬৯
১৩. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২১৩
১৪. তদেব, পৃ. ২১৫
১৫. তদেব, পৃ. ২১৬
১৬. সাহিত্যচর্চা (উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সংকলন), পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪, 'ভাত', পৃ. ২৫
১৭. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২২
১৮. তদেব, পৃ. ২২৩
১৯. তদেব, পৃ. ৫৩
২০. রক্ষিত, সৈকত, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত : অরূপ পলমল সম্পাদিত, ডাভ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা বইমেলা-২০১৩, পৃ. ২৭৯

বঙ্কিমের রোহিণী :
নবজাগরণের অনিবার্য সিন্‌থিসিস

ড. অমিত দে

সময়ের ধারায় জীবনের চলমানতায়, ব্যক্তিজীবনের উত্থান-পতনের নাটকীয়তায় এবং কাঙ্ক্ষিত জীবনের কর্মব্যস্ততায়, অনিবার্য পরিণতির স্বাভাবিকতায় একটি আপাত জটিল কিন্তু নির্মোহ ধোঁয়াশার মধ্য থেকে উঠে আসা একটি ব্যঞ্জনাময় চরিত্র রোহিণী। বঙ্কিমের আণুবিক্ষণিক রোহিণী কখনও আবছা কখনও জীবনের প্রতীক এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। নবজাগরণের অমোঘ মূর্তি বা মূর্ত থেকে বিমূর্ত এক প্রহেলিকার হাতছানি দিয়ে চিত্রিত হয়েছে একটি উত্তীয় চরিত্র যা তৎকালীন সামাজিক শ্লীলতা-অশ্লীলতার আপেক্ষিক গণ্ডী ছাড়িয়ে একবিংশ শতাব্দীর অনিবার্য একধরণের লিবারালিজমকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে যা শুধুমাত্র 'জেন্ডার ডিসক্রিমিনিশন'-এর জালে আবদ্ধ একটি সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নয়, একটি শতাব্দী থেকে আর একটি শতাব্দীর মানবিকতার জীবনচেতনার পাঁচালী মাত্র। জীবনযন্ত্রণায় ঋদ্ধ লেখক তথা চরিত্রের একটি পরাৎপরা আলেখ্য যা জীবনের স্বাধীনতার সংজ্ঞাকে এক বিস্তৃত ও ব্যাপকতায় ব্যাখ্যা করে জীবনচেতনাকে নতুনভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'জীবনবেদ' জীবনচেতনাকে ছুঁয়ে এক ধরনের কালোত্তীর্ণ এবং যুগোত্তীর্ণ সামগ্রিক স্বাধীনতার পূর্ণতাকে রূপায়িত করে। বঙ্কিমের রোহিণী এভাবেই বিদ্রোহী সত্ত্বা হয়ে নিরন্তর বিরহে লাঞ্ছিত হয়েও ভবিষ্যতের সিনথিসিসের দিকে সমগ্র মানবিক পাঠককে যেন ধাবিত করে। নতুন করে দাঁড় করায় এক জীবনসত্যের সামনে। এই অনিবার্যভাবী অথবা ভাবনাকে কিভাবে স্বীকার করি আমরা বর্তমানেরা ? অতীতের ওঠা মানবিক প্রশ্নটি এখনও বোধহয় সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রথানুগ হিন্দু সমাজের বিধবা নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া সমাজনীতির নির্মম নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জীবনপিয়াসী আধুনিকমনস্ক রোহিণী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তৎকালীন সমাজকে। সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করে রোহিণী নির্ভীকভাবে পা বাড়িয়েছে

গোবিন্দলালের দিকে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের লড়াই হয়েছে। বাহ্য-বাস্তবের ঢেউ অন্তর্বাস্তবে ঝড় তুলেছে এবং একটি নতুন সমীকরণের দিকে ধাবিত হবার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে—

> "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখীজনের একমাত্র সহায়া আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, তত বার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু ? রাখিব কি প্রভু ?—হে দেবতা—আমার প্রাণ স্থির কর— আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না"।

উপরিউক্ত বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে তার জীবনযন্ত্রণার মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক রূপটি চরমভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতির সিন্থিসিস-এর রূপকে অস্বীকার করা যায় না। সময়ের অমোঘ নিয়ম রোহিণীর জীবন-যন্ত্রণার চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাকে সামাজিক দ্বান্দ্বিক পরিণতির দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। এর অনিবার্য পরিণাম বারুণী পুষ্করিণীতে আত্মহত্যার চেষ্টা। যদিও সেটা সফল হয়নি গোবিন্দলালের চেষ্টায়।

রোহিণী আধুনিক জীবন তৃষ্ণায় বিশ্বাসী। সে স্বীকারে ও অস্বীকারে আধুনিকা হয়ে উঠেছে। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র যে রোহিণীকে নির্মাণ করেছিলেন তাতে ছিল না প্রেমনিষ্ঠা। রোহিণী মোটেই সতীসাধবী রমণী নয়। তবে আধুনিকতায় 'সতীসাধবী' টার্মটি আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এতে বাইরের আড়ম্বরতা যত বেশি, ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতা তার চাইতে বেশি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার ঢল যখন এদেশীয় বদ্ধসংস্কারগুলিকে ভাঙার চেষ্টা করছে তখনই আবিষ্কৃত হচ্ছে রোহিণীর মতো আপাত উপেক্ষিত মেয়েরা। সোজা কথায় রোহিণী প্রেমিকা নন, ব্যর্থ যৌবনের নায়িকা। রোহিণী বিধবা, তাই সে সামাজিক নিয়মে কারো ভার্যা হতে পারবে না যদিও তখন বিধবা বিবাহ আইন প্রচলিত হয়েছিল। তাই নারীটিকে একাদশী, অমাবস্যা ইত্যাদি ব্রত পালন করে থান শাড়ি পরে কাটাতে হবে। শরীর ও মনের দংশনে রোজ বিদ্ধ হতে হবে অথচ প্রকাশ করা চলবে না। এই আপাত ধারণাতে রোহিণীর জীবন ব্যর্থ। তবে এখান থেকেই রোহিণীর জীবনের উত্তরণপর্ব শুরু হয়েছে। আর্থ-সামাজিক তৎকালীন পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লেখকের মননের রেনেসাঁ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে এক নবজাগরিত সত্ত্বাকে নতুনভাবে উস্কে দিয়েছে নবকলেবরে দেউটির (প্রদীপ)

মতো। ফলত চরিত্রগুলিতে পড়েছে নতুন বোধের চেতনা।

উনিশ শতকের বিধবা এক নারী পরপুরুষ অথবা অবলম্বন সম্পর্কে ভাবছে— এটাই তো আধুনিক ? এটাই তো সাহসী সৃষ্টিশীলতা। রোহিণী এই ধাপটুকুকেও এগিয়ে গেছে। সে একটা পুরুষ নয়, অনেকগুলি পুরুষের প্রণয়িণী হতে চেয়েছে। কৃষ্ণকান্তের বড় ছেলে হরলাল রোহিণীকে বিয়ে করবার লোভ দেখিয়েছে। রোহিণী তাতে সম্মতি জানিয়েছে এবং এই আশ্বাসেই সে কৃষ্ণকান্তের ঘরে চুরি করতে ঢুকেছিল। বৈধব্যের যন্ত্রণামোচন করতে চেয়েছিল হরলালকে বিয়ে করে। কিন্তু সে আশা যখন ব্যর্থ হল তখন ভ্রমরের স্বামী গোবিন্দলালকে বিকল্প প্রণয় প্রস্তাব দিল। গোবিন্দলালের প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। হরলালের কাছে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হবার পর ভ্রমরের গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়াটা হয়তো প্রাসঙ্গিক ছিল। রোহিণীর আবেদনে তখনও দেহ-সৌরভ তেমন একটা বোঝা যায়নি। রেনেসাঁ পূর্ববর্তী অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের মতোই রোহিণী Commitment করেছে। নিজেকে অথবা তার মত অবলম্বনে থাকা নারীদের অবদমিত ইচ্ছা বা 'লিবিডোর' সার্থক নিম্নোক্ত Confession-এর মধ্য দিয়ে—

> "এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না— না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব।...কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দেবে ? আমি আবার আসিব।...আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না— কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ি যাব। আর কোথাও না।"[১]

কিন্তু রোহিণী শেষপর্যন্ত তার এই প্রতিশ্রুতি ধরে রাখতে পারেনি। আমরা দেখেছি, উপন্যাসের শেষের দিকে রোহিণী নিশাকরের ছদ্মবেশে রাসবিহারীর সঙ্গে গভীর রাতে নদীর ঘাটে দেখা করতে গেছে। এই দেখা করাটা একেবারেই নিছক ছিল না। নদীর ঘাটে পৌঁছানোর পর অপেক্ষমান রাসবিহারী কালবিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রোহিণীর জবাবে পাঠক স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। রোহিণী জানায়—

> "আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন ? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে ভুলিতে না পারিয়া এখানে আসিয়াছি।"[২]

বোঝা যাচ্ছে যে, রোহিণী শরীর সর্বস্ব এবং মনও শরীরমুখী। শেষপর্যন্ত রাতের অন্ধকারে গোবিন্দলালের হাতে পাকড়াও হল। রোহিণী নিজের জীবন ভিক্ষা করে

গোবিন্দলালকে বলেছে, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!"[৩]

রোহিণীর এই আর্তি অভিনব। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রদ তখনও অর্ধশতাব্দী পেরোয় নি। নারী কিছুদিন আগে পর্যন্তও স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে চেয়েছে। তার মধ্যেই এক নারী জীবনমুখী, শরীরীচেতনায় ঋদ্ধ। বাংলা কথাসাহিত্যে এই বোধ আগে প্রতিষ্ঠা হয়নি। 'বিষবৃক্ষ'তে বঙ্কিম কুন্দনন্দিনীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু এমন Boldness কোথায় ? ঠান্ডা মেজাজের কুন্দের মধ্যে এমন উষ্ণতা কী বাঙালি অনুভব করেছিল ?— করেনি। অবশ্য বাংলা কাব্যকথায় মাইকেল প্রায় ১৪-১৫ বছর আগেই বীরাঙ্গনাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যে রোহিণীই প্রথম Desperate মহিলা।

অনেকের মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায় যে রোহিণীর জন্য গোবিন্দলাল এতবড় জমিদারি ছেড়ে প্রাসাদপুরে এলেন তিনি কেন হঠাৎ করে রোহিণীকে গুলি করলেন ?— সহজ উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মানসিকতা বা সামাজিক বোধ। তিনি স্রষ্টা তাই সৃষ্টিকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন— এটা দ্বিচারিতারই নামান্তর। বিষয়ের গভীরে ঢুকলে অন্য বিষয় উঠে আসে। প্রণয়ে সন্দেহ ও ঈর্ষা ভীষণ স্পর্শকাতর বিষয়। গোবিন্দলাল সেকারণেই গুলি করেছিলেন রোহিণীকে। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে 'পাপীয়সী' বলেছেন। সমকালীন সমাজ-বাস্তবতায় হয়তো সঠিক ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রসঙ্গে রোহিণী যথেষ্ট স্মার্ট। রোহিণী বেশিরভাগটাই শরীর সর্বস্বতায় বিশ্বাসী। আপাতদৃষ্টিতে এটা পাপ মনে হলেও আধুনিক চেতনায় এটা ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, নারী স্বাধীনতা। আমরা ঘুরিয়ে বলতে পারি, তাকে 'পাপীয়সী' বলাটা আসলে রক্ষণশীল পুরুষসমাজেরই পরিচায়ক। রোহিণী গোবিন্দলালের পরিবারকে ধ্বংস করেছে এই দোষ একা রোহিণীর নয়, গোবিন্দলাল সমপরিমাণ দায়ী। গোবিন্দলাল তো স্বেচ্ছায় রোহিণীর পাণিগ্রহণ করেছিল। রোহিণীর 'পাপ' আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধুয়ে গেছে। তবে এই অর্থে সে নিঃসন্দেহে অসামাজিক যখন ভ্রমরের কাছে গিয়ে মিথ্যে করে গোবিন্দলালের সোনা দেবার কথা বলেছে। এই মিথ্যা ভ্রমরকে জ্বালিয়েছে। এতে ভ্রমরের সাংসারিক বন্ধন শিথিল হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে অপরাধের কিন্তু একইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে ভ্রমর তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন ঘটনাকে Justify না করেই বলছি যে চরিত্রটি বেশ Desperate। তা না হলে ভ্রমরের ঘরে ঢুকে ভ্রমরের সংসার ভেঙে যায় এই বলে— "আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজবাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে ততটা নহে।" এখন প্রশ্ন এটাই যে, উনিশ শতকের এক সাধারণ নারী এমন Desperacy পেল কোথা

থেকে ?— উত্তর একটাই মুক্তির তাড়না। প্রশ্ন হতে পারে কিসের মুক্তি ?— উত্তর হতে পারে ব্যর্থ জীবন-যন্ত্রণা হতে মুক্তি। চার্লস ডারউইনের মতে, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। গোবিন্দলালকে পেতে হলে ভ্রমরকে সরাতেই হবে। আর তার Desperacy-র মূলে সমাজ ও ভাগ্য কিছুটা দায়ী নয় কি ?— সমাজ রোহিণীকে দিয়েছে দু:খ, হরলাল দিয়েছে প্রবঞ্চনা আর বিধাতা দিয়েছে বৈধব্য। রোহিণী আত্মসংযম হারিয়েছে, হারানোটা স্বাভাবিক ছিল না কী ? বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'কৃষ্ণকান্তের পুত্র হরলাল বিধবা রোহিণীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে সরলা নারীর প্রতি যে অপমান ও অসম্মান করেছে, বিদ্রোহিণী রোহিণী কি কৃষ্ণকান্তের পুত্রাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে হরণ করে তারই যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে চেয়েছে সমাজের উচ্চকোটির মানুষগুলোরই মুখের উপরে ?'[৪] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজবিবর্তনের অনিবার্য ধারা যা একটা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আর একটা ব্যবস্থাকে আহ্বান জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে 'দুবাহু বাড়ায়ে।' কারণ আমরা তো সেই আপ্ত বাক্যটির সঙ্গে সমধিকভাবে পরিচিত— "বদলাবে একদিন বদলাবে, দ্বান্দ্বিকতার নিয়মেই বদলাবে। তবে অবশ্যই তা আমার আপনার কম্পিত বিভঙ্গে নয়"[৫] —এই সামাজিক বদলের পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক জীব হিসাবে রোহিণী চরিত্রতেও মুক্তির তাড়না এসেছে।

বারুণী পুষ্করিণী রোহিণীর জীবনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। বারুণী রোহিণীকে আশ্রয় দিয়েছে, তার গোপনকথাটির সাক্ষী থেকেছে। তাতেই রোহিণীর জন্মান্তর ঘটেছে। রোহিণী বারুণীর জলে নেমেছিল মৃত্যু বরণ করতে। গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করতে। এটা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। হরিদ্রাগ্রামে যে রোহিণী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল সে ছিল হরলাল প্রবঞ্চিতা, গোবিন্দলালের প্রেমিকা— তার মধ্যে ভয় ছিল, না পাওয়ার বেদনা ছিল, গুরুভার সইতে না পারার আত্মগ্লানি ছিল, পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু আত্মহত্যার বিফল চেষ্টার পরবর্তীতে রোহিণী পুনর্জন্ম লাভ করল এইভাবে—

> "মনকে চিনেছে রোহিণী আগেই। কিন্তু সমাজনৈতিক অনুশাসনকে শিরোধার্য করে সে লুকিয়ে রেখেছিল এই নগ্ন মন। ঐ সন্ধ্যায় বারুণী ধুইয়ে দিয়েছে 'হৈম প্রতিমা'র রঙ-মাটি। বারুণীর জলেই ধুয়ে গেছে সুস্থ সংযম আর সঙ্কোচ। সেই জলে খুইয়েছে সে সামাজিক শৃঙ্খলের বোধ। বারুণী থেকে তবে কি উঠে এল মূর্তিমতী বারুণী দেবী ? বারুণী গর্ভে এই জন্মান্তরিত রোহিণী-ই ভ্রমরকে গিল্টি করা গহনা আর ধার করা শাড়ি দেখিয়ে মিথ্যে বলতে পারে অনায়াসে। আর এই কামময়ী রোহিণী সর্বাবয়বে হয়ে ওঠে রাত্রিরূপিণী। সেই রাত্রি যার নিভৃত অবকাশ প্রশ্রয় দেয় ক্লিন্ন জীবনচর্যাকে। এরপর থেকে বারুণী তীরবর্তী

সূর্যপ্রয়াত কুসুমিত উদ্যানে কিম্বা প্রসাদপুরের কুঠিতে অথবা চিত্রা নদীর তীরে রোহিণী দৃশ্যমান। সূর্যরশ্মি নেই কোথাও।"[৬]

রোহিণীর বারুণী পুষ্করিণীতে অবগাহন করা ও আত্মহত্যার প্রবণতাকে আমরা নানাভাবে প্রতীকায়িত করতে পারি। সেগুলি হল :

১. বারুণী পুষ্করিণী যেন উনিশ শতকের নবজাগরণের কুণ্ড।

২. রোহিণীর আত্মহত্যা করতে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক অবগুণ্ঠনাবৃত নারীর পরাজয়কে ইঙ্গিত করেছে।

৩. রোহিণীর বেঁচে ওঠা আসলে আধুনিক চেতনায় উদ্ভাসিত নারীর প্রতিভূকেই তুলে ধরেছে।

'নারী আপন ভাগ্য গড়িবারে' পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঠে নামল। জয় করার মানসিকতা থেকেই একের পর এক জয় করতে লাগল। ছলা-কলা-বিলাসিনী-কুহকিনী যায় বলি না কেন রোহিণী প্রাণশক্তিতে ভরপুর, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। এরসঙ্গে পাঠক মনে রাখবেন সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের ধারায় সামন্ততন্ত্র এইসময়ে ক্ষয়িষ্ণু রূপ নিয়েছে। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই ব্যাপ্ত হচ্ছে বা আগ্রাসন করছে। নতুন ব্যবস্থা পুরানো ব্যবস্থাকে দুমড়ে মুচড়ে খোলনলচে পাল্টে দিচ্ছে। ছাপ পড়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে। ছায়া পড়েঠে ব্যক্তি জীবনেও। সেই ব্যক্তি জীবনের প্রতীকি চরিত্র রোহিণীও হয়ে উঠেছে পরিবর্তিত আধুনিক চেতনার রূপক চরিত্র।

রোহিণীর বৈপ্লবিক সত্তা রোহিণীকে অমর করেছে। অন্তরে ভয় ও দ্বিধা রেখে নয়, সৌন্দর্য ও কাম-বিলাসিতা দিয়ে পুরুষকে বশ করেছে। পুরুষতন্ত্র নারীর উপর থাবা বসিয়েছে চিরকাল। রোহিণী তাই প্রতিবাদিনী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পোস্টার নিয়ে মিছিলে নারীশক্তির জয়গান গায় নি রোহিণী, প্রচণ্ড প্রভাবশালী উদ্দাম পুরুষের ব্যভিচারীতার বিপক্ষে নিজেও ব্যভিচারিণী হয়েছে। 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর'—গোবিন্দলালের উদ্যত মারণাস্ত্রের সামনে মৃত্যুভীতা রমণী পুরুষ বিচারকের সওয়ালের জবাবে যে প্রত্যুত্তর দিয়েছে তা অনন্ত মনোযন্ত্রণায় ভরা। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলেছে 'তুমি আমার কে ?'—দীর্ঘ সহবাসের পর নায়কের এই আচমকা প্রশ্নের জবাবে রোহিণী বলেছে— 'কেহ নই, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। নইলে কেহ নই।' এই জবাবে নারীত্বের গর্ববোধ একেবারে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে।[৭] স্রষ্টা বঙ্কিম সমাজধর্মের দায়কে মেনে রোহিণীকে যাবতীয় গালমন্দ করলেন পুরুষশাসিত বিচারশালায়। রোহিণী অভিযুক্ত হল। বঙ্কিম নৈতিকতার খাতিরে শিল্পের গলা টিপে হত্যা করলেন। বোঝা যায় যে, এটা একপ্রকার জোর করেই বঙ্কিম করলেন।

পাঠকদের মনোযন্ত্রণা পেতে হল। আসলে 'প্রত্যাশা এমনই জিনিস, যা অনুকূল পরিবেশে সামনের দিকেই বাড়তে থাকে। শিল্প এ প্রত্যাশা জাগালে গুটিয়ে পুনরায় ঔচিত্যের কোটরে ঢোকা কি আর এমন মনোরম অভিজ্ঞতা! বরং এতে মনের প্রতিক্রিয়া হয় দারুণভাবে।'[৮]

বাংলার বুকে উনিশ শতক নবজাগরণের যুগ, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার যুগ। মধ্যযুগীয় সামাজিক অভিঘাতগুলি প্রবলভাবে রইল না। সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামো আর তেমনভাবে থাকল না। বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকল। নতুন যুগের সূচনা হল। রোহিণী সেই যুগের ধূমকেতু যাকে নৈতিকতার নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ডে বিচার করা উচিত নয়। বোধহয় সম্ভবও নয়। কারণ নৈতিকতার অর্থ অনেকক্ষেত্রেই স্ববিরোধী। রোহিণী যদি হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ঊনবিংশ শতকের জাগ্রত চেতনা তবে এটা বলতে বোধহয় শঙ্কা হবে না বঙ্কিমের ভাবনায় এই নারী চরিত্রটি অনেক বৈপ্লবিক অথবা সমসাময়িকতার থেকে দ্রুত ভাবা একটি দ্বান্দ্বিক চরিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর ভাবনার এই রেশ একবিংশ শতাব্দীর নারীর নারীবাদী সত্তার মধ্যে বোধহয় উঁকি মেরে চলেছে। তবে ঊনিশ শতকে যা ছিল সলজ্জ, অবগুণ্ঠ একবিংশ শতাব্দীতে তাই হয়ে উঠেছে উদ্দাম, বাঁধনছেঁড়া। এই বাঁধনছেঁড়ার জয়গান রোহিণীর মধ্যে ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। নারীর চিন্তা-চেতনার রেনেসাঁর ফুলকিটি কী নিপুণ দক্ষতায় সাজিয়ে রাখা হয়নি ?— পরিণতি ও পরিণামের কথা চিন্তা না করে এক নারী চরিত্র বাঙ্ময় হয়ে উঠছে, আধুনিক স্বাধীনতার ধ্বজা তুলেছে।

রোহিণীর আকর্ষণ ছিল গোবিন্দলালের কাছে দুর্নিবার। ঘরে স্ত্রী ভ্রমর থাকা সত্ত্বেও তারমধ্যে অপূর্ণতা ছিল। সেই অপূর্ণ পাত্র সে পূরণ করতে চায় তথাকথিত সামাজিক ও আইনগতভাবে অস্বীকৃত একজন নারীর মধ্য দিয়ে। এই পূর্ণতা সঠিক অর্থে পূর্ণ হওয়া কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে কিন্তু এই চরিত্র অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের লাগামধরা ঘোড়ার মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বোধহয় বুড়ো বেতো ঘোড়ার Allegorical Symbolism-এর দ্যোতনা বহন করছে। তৎকালীন সুশিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে তিনি সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের রূপরেখাটি হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এর অনিবার্য ভাঙন ও ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উত্থান হয়তো তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, এও বুঝেছিলেন 'বদলাবে একদিন বদলাবে তবে অবশ্যই তা সাধারণের পরিচিত বিভঙ্গে হবে না।' তাই তার জন্যই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রোহিণী চরিত্রের বৈপ্লবিক বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা পরবর্তীকালে ধনতন্ত্রের দর্শনে চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক জগতে দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনও বলা যেতে পারে। আধুনিককালের রোহিণীরা তাদের বাস্তব প্রকাশ বা সিন্থিসিসের অপ্রকাশিত চেতনা (দর্পণ)।

বঙ্কিম চিন্তাভাবনা ও দর্শনে মূলত: নৈতিকতায় বিশ্বাস করতেন। রোহিণী স্ববিরোধী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্য দিয়ে রেনেসাঁর হালকা প্রতিবিম্ব দর্শন করালেন। বঙ্কিমের উনিশ শতকের চেতনা 'অনৈতিক' রোহিণীকে শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখনিতে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে যন্ত্রণার প্রকাশ ও তৎকালীন সময়ে সামাজিক অবক্ষয়ের মূর্ত প্রতীক হিসাবে নিজের সৃষ্ট রোহিণীকে নৈতিকতার হননমেরুতে বধ করতে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও লেখনি বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়নি। তাহলে কী তৎকালীন সমাজের চিন্তনের মাপকাঠিতে তাঁর চরিত্রটি যুগোপযোগী নয় এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন ?— প্রশ্ন অনেক উত্তর বৌদ্ধিক পাঠকের মননশীলতায়। সামাজের নীতি, নিয়ম বা Convention অনুযায়ী রোহিণী 'পাপিষ্ঠা' হলেও রোহিণীর সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল 'সত্য, সুন্দর Art!'[৯] তাই আমার মনে হয়েছে সে যুগের নীতি-নিয়ম, পুরুষশাসিত সমাজ যদি হয় থিসিস আর নবজাগরণ যদি হয় অ্যান্টিথিসিস তাহলে তার অনিবার্য সিন্থিসিস হল রোহিণী।

তথ্যসূত্র

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), সম্পা. অসিতাভ দাশ, কলকাতা : বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ৫৪২

২. তদেব, পৃ. ৫৭৭

৩. তদেব, পৃ. ৫৭৮

৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা', উদ্দালক, সম্পা. সন্তোষকুমার মণ্ডল, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৩., কলকাতা : উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২০৩

৫. ড. অশোক মিত্র, 'প্রবন্ধ সংকলন : অকথা কুকথা'

৬. দেবলীনা মুখোপাধ্যায়, 'বারুণী', উদ্দালক, সম্পা. সন্তোষকুমার মণ্ডল, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৩., কলকাতা : উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২০৩

৭. ড. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থপতি, ১ম সং., কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫

৮. তদেব, পৃ. ৬৬

৯. প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, ৪র্থ সং, কলকাতা : বামা পুস্তকালয়, ২০০৬, পৃ. ১৯২

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস (নির্বাচিত) : নারী চরিত্রের আধুনিকতা

সন্দীপ গরাই

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রতিনিয়ত সৃষ্টিশীল। এই সৃজনশীলতার অভিব্যক্তিতে উনিশ শতক বাংলা সাহিত্যকে সর্বাধিক দান করেছে। মধ্যযুগীয় সংস্কারবদ্ধ মানুষ রেনেসাঁস ভাবনার আলোকে সার্বিক মুক্তিপিয়াসী চেতনায় আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছে। ভক্তিবাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদ হয়েছে বাঙালির মনন চর্চার অন্যতম মূল আশ্রয়। এক্ষেত্রে বাঙালির মনন জগতে নবচেতনা ও নবভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটনে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভূমিকা অপরিসীম। ফলে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় উনিশ শতকের কালজয়ী সাহিত্যিকেরা পাশ্চাত্য ভাবনা ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে অপূর্ব সাহিত্য নির্মাণে অগ্রসর হন। সেখানে যুক্তিবাদ, স্বদেশপ্রেম, বাস্তবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, বিজ্ঞানভাবনার মতো আধুনিক বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা, গদ্য ভাষায় সাহিত্যচর্চা, পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব, স্কুল-কলেজ নির্মাণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার আধুনিকতার পরিধিকে বিস্তৃত করেছিল। যার ফলে—"১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল"[১]

উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এই সময়েই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২, মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) মতো সমাজচিন্তক, যুক্তিনিষ্ঠ, ধর্মসংস্কারক ব্যক্তিরাই এগিয়ে এসেছিলেন যুগান্তর ঘটাতে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষে যখন অরাজকতার পরিস্থিতি, সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে জনগণকে

স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন তাঁরাই। এক নব উদ্দীপনায় প্রাচীন দেশজ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে এবং সামাজিক পালাবদলের লক্ষ্যে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। যুক্তিনির্ভর সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই সেই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে। সার্বিকভাবে উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশক থেকে সামাজিক পরিবর্তনের ছাপ প্রতিফলিত হতে থাকে। তবে উনিশ শতকে বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে বঙ্গনারীর হাত ধরেই। সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ সেই দিকটিকেই সুনিশ্চিত করে। দীর্ঘদিনের এই অচলায়তনিক প্রথাকে ভেঙে এগিয়ে চলার পেছনেও ছিল অনেক প্রতিকূলতা। তবু— "উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারীজাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় বেদনার্দ্র এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এ সময় বাংলার চিন্তানায়করা নারীকল্যাণেই যেন তাঁদের সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। যার প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ আইনে, কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে।"[২]

উনিশ শতকে অন্তঃপুর নারীর জীবনে আধুনিকতার আলোয় বন্ধন-মুক্তির মানসিকতা প্রবল হতে থাকে। পুরুষশাসিত অন্ধকারময় জগত থেকে স্বাধীনতার প্রত্যাশায় নারীরাও এগিয়ে আসে। আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার তাগিদে তাঁরা বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে বঙ্গনারীর জীবনে চরম পরিবর্তন দেখা দেয়। যারা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ও বঞ্চিত তাঁরাই সমাজের অগ্রগতিতে মুখ্য ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থা বঙ্গনারীর মূল্যবোধের পরিবর্তনে অন্যতম সহায়ক হয়েছিল। তবে এর বিরুদ্ধবাদীরাও বিভিন্ন অপপ্রচারে নেমে আসে—"যেসব কথা তুলে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ বাদীরা সরব হয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল মেয়েদের বুদ্ধি অল্প, শিক্ষা পেলে তাঁরা হয়ে উঠবেন উদ্ধত ও অহংকারী। তাছাড়া লেখাপড়া শেখার দরকার কি তাঁদের—ধর্ম সম্বন্ধে দু-চারটে উপদেশ দিলেই তো ব্যাপারটা মিটে যায়।"[৩] এহেন চিন্তাবাদীদের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকদের আবির্ভাব, যারা সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় সমাজের সর্বস্তরে নবচেতনার আলো সঞ্চার করেছিলেন। যার ফলে— "উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা অমূল্য সম্পদ এবং শিক্ষা ব্যতীত জীবন অর্থহীন। বস্তুত, এই মহিলারা কেবল যে শিক্ষার আবশ্যকতাই অনুভব করেন, তা-ই নয়, তাঁরা শিক্ষা সম্পর্কে নিজেদের একটা আদর্শও গড়ে তোলেন।"[৪] এভাবেই অন্তঃপুর নারীর জীবনে আধুনিকতার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বঙ্গনারীর মধ্যেও বৌদ্ধিক বিকাশের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং অন্তঃপুর নারীর জীবন ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যেও উঠে আসে একের পর এক জনপ্রিয় মহিলা সাহিত্যিক।

উনিশ শতকে নারীর আত্মশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনার পরিসরকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। সুতরাং যে নারী এতদিন ধরে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, নিপীড়িত, শোষিত ছিল সেই নারীই সমাজের মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠার ক্ষমতা প্রকাশ করতে থাকে। রামসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কৃষ্ণভাবিনী দাসী (১৮৬৪-১৯১৯), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), সরদাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫), কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫-১৯৪৮), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮), সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪), শান্তা দেবী (১৮৯৩-) প্রমুখ সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে অসীম, অনন্তের দিকে ধাবিত করেছে। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কাব্য, অনুবাদকমূলক রচনা, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, গান, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে উনিশ শতকে নারীর আপন সৃজনশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশ কাল সমাজের প্রতিচ্ছবি বাংলা কথাসাহিত্যে বিস্তারিত ভাবে উঠে আসে। কারণ, সাহিত্য সমাজ নিরপেক্ষ নয়, সমাজ সাপেক্ষ। কিন্তু উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী যেভাবে নারী জীবনে আধুনিকভাবে আলোক সঞ্চারিত করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা নবরূপে নারীচরিত্র নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাই— "ব্যক্তিগত জীবনে স্বর্ণকুমারীর সমাজমনস্কতার চিহ্ন আছে তাঁর 'সখিসমিতির' মতো প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনায়। ১৮৮৬ সালে এই সমিতি গড়েছিলেন স্বর্ণকুমারী, অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় আর নিরুপায় বিধবাদের স্বনির্ভর জীবন গড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে"[৫] এভাবেই তিনি সমকালীন পুরুষ তান্ত্রিকতার বলয় থেকে বঙ্গনারীর জীবনে আত্মনির্ভরশীলতার বাণী শুনিয়েছিলেন। সমাজে এই ক্রান্তিকারি পরিবর্তনের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো মহিলা সাহিত্যিকদের অবদান অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে নারী চরিত্র সৃজনে তাঁর প্রতিভা সর্বোত্তম।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণ বদলাতে থাকে। যুক্তিবাদী মনোভাব তাঁর জীবন ভাবনাকে মৌলিকতায় রূপান্তরিত করে। তবে সামাজিক প্রথা মেনে ১২ বছর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দাম্পত্য জীবনে তিনি নিরন্তর সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। অন্তঃপুর নারীর জীবন ভাবনার পালাবদলে স্বর্ণকুমারী দেবীর ভূমিকা অপরিসীম। সমাজে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি 'দীপ-নির্ব্বাণ' (১৮৭৬), 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'মিবাররাজ'

(১৮৮৭), 'হুগলীর ইমামবাড়ি' (১৮৮৮), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯০-১৮৯৩), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫), 'কাহাকে ?' (১৮৯৮), 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে জীবনবোধ, সমাজচেতনা, শিল্পনৈপুণ্য অসাধারণ। তাই— "মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম পথ-নির্দেশের কৃতিত্ব কাহার তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তবে রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।"[৬]

স্বর্ণকুমারী দেবী উনিশ শতকের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। তাঁর রচিত উপন্যাসে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের লক্ষণগুলি উঠে এসেছে। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানভাবনা, বাস্তবতা, স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, নারীবাদের মতো আধুনিক বিষয়গুলি তিনি তাঁর উপন্যাসের প্লট ও চরিত্র নির্মাণে তুলে ধরেছেন। তবে উপন্যাসের নারী চরিত্র নির্মাণে তিনি খুব সচেতন। তাঁর সৃষ্ট নায়িকারা সমাজ ও সমকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে এগিয়েছে। সেখানে নারী তাঁর আত্মজয় ঘোষণার মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। সামাজিক কুপ্রথা ও সংস্কার থেকে মুক্তির মাধ্যমেই নারীরা হয়ে উঠেছে সংগ্রামী, বিদ্রোহী, প্রতিবাদী। নারীর আত্মসচেতনতাই আত্মগৌরবের পথকে, আমূল পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। যা স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসে নারী চরিত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে নজরে আসে। উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্তঃপুরের জীবনচর্চার বিস্তারিত বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন। সেখানে অন্তঃপুর নারীর বহুরৈখিক জীবনভাবনার পরিচয় পাঠকের সঙ্গে ঘটে। সাংসারিক ও পারিবারিক কর্মে গৃহিণীর জয় নারীর অধিকারকেই সুনিশ্চিত করে। উপন্যাসে জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারের অবস্থাও সেইরূপ। গৃহিণীই তার সংসারের মূল নিয়ন্ত্রক। জগতবাবুর টগর ও চারু দুই সন্তান। গৃহিণীর সন্তান বাৎসল্য তাদের জীবনে প্রতিনিয়ত আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু স্নেহলতা সেই পরিবারে পালিতা রূপেই বড়ো হয়েছে। মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা-মমতার জগত থেকে সে বঞ্চিত, উপেক্ষিত। কিন্তু এই পরিসর থেকেই একজন অসহায় নারীর আত্মবিশ্বাসের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। যেখানে স্নেহলতা আধুনিক, যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবতায় বিশ্বাসী।

উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব উপন্যাসের স্নেহলতা চরিত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। উপন্যাসের সূচনা থেকে তার শিক্ষার প্রতি প্রবল মনোযোগ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে

পাঠকের। ছোটবেলা থেকেই সে শিক্ষার প্রতি খুব যত্নশীল। তাই সে বলেছে— "এ কি সত্যই আরব্য উপন্যাস, ঠিক করিয়া বল ?"[৭] আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। স্নেহলতার বইয়ের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা তাকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করেছে। এই শিক্ষাচর্চার ফলে তার মননে ও চেতনায় আত্মসমীক্ষার দিকগুলি প্রসারিত হতে থাকে। তাই চারু ও তার বিয়ের প্রসঙ্গে তার যুক্তি— "কেমন করিয়া চারু একথা মনে করে যে স্নেহ ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বকুনি খাওয়াইয়াছে! তাহা সে কি পারে! চারুকে সে এত ভালোবাসে, সে কি চারুর মন্দ ইচ্ছা করিতে পারে! চারু এ কথা কি করিয়া মনে করিল!"[৮] এই আত্মচিন্তাই স্নেহলতার জীবনে আত্মসংগ্রামী রূপে ধরা পড়েছে। জগতবাবুর অকৃত্রিম স্নেহের বন্ধন তার জীবনে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে। পরবর্তীকালে মোহনের সঙ্গে স্নেহের বিয়ে স্থির হয়। কিন্তু ভাগ্যের চরম পরিহাসে শ্বশুরবাড়িও তার সুখের হয়নি। নববধূ সম্পর্কে প্রবল বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ প্রকাশ করে তার শাশুড়ি। স্নেহকে শুনতে হয়েছে— "লক্ষ্মী ছাড়াই ত যত নষ্টের গোড়া, ঐ জঞ্জাল ঘরে এনেই ত ঘরে আগুন লাগলো!"[৯] এরপর উপন্যাসের প্রথম ভাগের সমাপ্তিতে মোহনের মৃত্যু সংবাদ স্নেহের জীবনে গভীর শোকের ছায়া নিয়ে আসে। ফলে স্নেহ পুনরায় জগৎ বাবুর বাড়ি ফিরে আসে। চারুর বিবাহকে কেন্দ্র করে টগর তার জন্য তার মা এক গভীর ষড়যন্ত্র করে। চারু ও স্নেহের প্রেমালাপ যাতে রাষ্ট্র না হয়, তার জন্য তারা স্নেহকে ছন্নছাড়া করতে উদ্যত হয়। এখানেও স্নেহলতা চরিত্রে বীরত্ব, পৌরুষত্ব প্রকাশিত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েও সে আত্মসংগ্রামী। ভারতীয় নারীর আদর্শকে সে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। প্রেমভাবনার চিরন্তন শাশ্বত রূপটিও ধরা পড়েছে তার সংলাপে। কিন্তু সময়ের উত্তাল স্রোতে সে তার জীবনকে ভাসিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের শেষে স্নেহলতা মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও প্রতিবাদের ভাষা সে হারায়নি— "মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, এ পত্র তারি লেখা, সে পাপিয়সী! সমস্ত তারি দোষ!"[১০] জগত ও নিজের জীবনকে ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে সে নীরব থাকেনি, সরব হয়েছে। চারুর মতো চরিত্রের জীবনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। স্নেহলতা দেখিয়ে দিয়েছে নারীর সমমর্যাদা ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব।

এই উপন্যাসের টগর, জগৎবাবুর স্ত্রী, জেঠাইমা চরিত্রগুলিও বাস্তবায়িত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ থেকেছে। যদিও তাদের সংলাপ, ভাবনায় আধুনিকতার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। টগর অনেকটা সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী। এছাড়াও উপন্যাসের কমলা চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিক সচেতন ভাবেই কলম ধরেছেন। তার পরোপকারিতা, আত্মচিন্তা, যুক্তিবাদী ভাবনা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। স্নেহলতা জগৎবাবুর বাড়ি যেতে চাওয়ায় কিশোরী মানা করে। এই প্রসঙ্গে কমলার প্রতিবাদ— "এতদিন যে দিদি তাদের ওখানে ছিল, সে অপমান তবে তোমাদের সয়েছিল কি ক'রে ?

তারা দিদির মা বাপ, তুমি চাও তাদের না দেখে এখানে কষ্টে দিদি মরবে!"[১১] কমলার এই ভাবনা তাকে আধুনিক করে তুলেছে। স্নেহলতার হয়ে তার এই লড়াই, সংগ্রামে সে কখনো হার মানেনি। এখানেই একজন নারী ঔপন্যাসিকের লেখনীতে নারী চরিত্রেরা আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

"ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্পীরা রঙ তুলি দিয়ে যে কাজ করেছেন বঙ্গীয় সেনেসাঁসের রূপকাররা তা করেছেন তাঁদের লেখনী দিয়ে।"[১২] উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নারী চরিত্র নির্মাণে রেনেসাঁস ভাবনার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর "কাহাকে ?" উপন্যাসের নারী চরিত্র নির্মাণে ও পরিকল্পনায় রেনেসাঁস ভাবনার প্রতিফলন চোখে পড়ার মতো। উপন্যাসের নায়িকা মণি বা মৃণালিনী চরিত্রে আধুনিকতার সার্বিক প্রকাশ দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক বলয় থেকে বেরিয়ে কীভাবে বঙ্গনারীরা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ঔপন্যাসিক। এই মৃণালিনী অন্দরমহলের জীবনভাবনার পরিবর্তন ঘটাতে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটিয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাচর্চার মেলবন্ধনে তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক নারী। তাই— "উনিশ শতকের নারীর লক্ষ্য ছিল বন্ধন মুক্তি। অন্তঃপুরের বাইরে ন্যূনতম অধিকার লাভের স্বপ্ন থেকেই বাংলায় নারীজাগরণের সূত্রপাত। এই নারীজাগরণের হাত ধরেই আসে নারী মুক্তি, এই মুক্তি এক প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীর মুক্তি। রক্ষণশীল গৃহস্থালির অবরোধ ভেঙে মেয়েরা তখন নিজেদের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করছেন পুরুষতান্ত্রিক কর্মভূমিতে।"[১৩] আসলে স্বর্ণকুমারী দেবী মনে করতেন আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। আত্মসচেতনতার মাধ্যমেই নারীর জয় সুনিশ্চিত হবে।

উপন্যাসের সূচনা থেকেই মৃণালিনী নিজের জীবনকে দেখেছে ভিন্ন চোখে— "আমার বয়স এখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবাহিতা। শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য হইতেছে ? কিন্তু আশ্চর্য হইবার ইহাতে কি আছে ? আজকাল ত এমন অনেকেই ইহার চেয়েও অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকেন, আমিও না হয় আছি।"[১৪] জীবন সম্পর্কে তার এরকম দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সে একজন স্বাধীন নারী। প্রসঙ্গক্রমে সে তার নানা বাবাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতিতে সে তার সহপাঠী ছোটুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। প্রেমকে বিকশিত করেছে ছোটুর রচিত একটি গান—

"হায়! মিলন হোলো!
যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো!
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেলা ব'সে আছি
কখন ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—"[১৫]

এরপর ধীরে ধীরে প্রেমের অসীম, অনন্ত জগতে নায়িকা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিচরণ করতে থাকে। এরপর অনেক বৎসর পেরিয়ে নায়িকা তার ব্যারিস্টার ভগিনীপতি ও দিদির গৃহে এসে নতুন করে প্রেমের অনুসন্ধান করেছে। নবীন ব্যারিস্টার রমানাথ ছোটুর রচিত গান গেয়ে তার প্রেমের পূর্বস্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে রমানাথের প্রতি তার কৌতূহল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যা নায়িকার জীবনে পালাবদল ঘটায়। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন জেগেছে রমানাথের প্রতি তার প্রেমের মনোভাব কিরকম ? এখানেই ফুটে ওঠে রেনেসাঁসের আলো। বিশেষ করে পুরুষ নির্বাচন করার স্বাধীনতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে অন্তঃপুর নারীর এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির জয়ঘোষণায় জীবন ভাবনার পরিবর্তনকেই সুনিশ্চিত করেছে। উপন্যাসের নায়িকা তার নীতি আদর্শের জগত থেকে সরে আসেনি। তাই সে রমানাথকে যুক্তি দিয়ে বিচার করেছে। এখানে মৃণালিনী যথার্থ ভাবেই বীরাঙ্গনা নারীর পরিচয় পাঠককে প্রদান করেছে। কারণ তিনি বুঝতে পারেন রমানাথ একজন বিদেশিনীর প্রতি প্রেমাসক্ত। তাই আশা ভঙ্গের পর তিনি রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এবং ভগিনীপতির বন্ধু এক ডাক্তারের আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়তায় সে মুগ্ধ হয়েছে। তাই অজান্তেই নায়িকার মন সেই ডাক্তারে প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। সেই সঙ্গে খেলাধূলা, ছবিআঁকা, শিক্ষাচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে উনিশ শতকে নারীর আত্মনির্ভরশীলতার দিকগুলিকেও ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। যা রেনেসাঁসের অন্যতম দিক। আবার— "নারীবাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। তার উদ্দেশ্য নারীকে সক্ষম করে তুলা ও সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পিতৃতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটানো।"[১৬] সুতরাং সামাজিক সাম্য ঘটানোও ছিল লেখিকার সমাজ সংস্কারের অন্যতম দিক।

উনিশ শতকে অন্তঃপুর নারীরাও পাশ্চাত্যের ঘরানা ও ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি যুক্তি-তর্ক ও সমালোচনার আসরেও নারীর ভূমিকা অপরিসীম। যা অন্তঃপুর নারীর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক হয়েছে। উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের সফলতা সর্বত্রই নজরে পড়ে। এক নতুন চেতনার মনোবৃত্তি বঙ্গীয় নারীর জীবনে আধুনিকতার ভীতকে মজবুত করে তুলেছে। তাই উপন্যাসের মধ্যে ডাক্তার বলেছে—"আমার ত মনে হয়, শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষ সকলেরি একবার অন্তত সে দেশে যাওয়া উচিত। সেখানকার সেই মুক্ত স্বাধীন বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করলেও আমাদের মতো নির্জীব জীবন নতুন জীবন পায়, তারও যেন জীর্ণ সংস্কার হয়।"[১৭] সামাজিক পালাবদলের এই প্রচেষ্টা উনিশ শতকের সমাজ ভাবনায় অভাবনীয় পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিল। সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকাকে কখনোই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অস্বীকার করতে পারে না। সমাজে নারী ও পুরুষের বৈষম্যের ভেদাভেদকে মুছে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সামাজিক প্রগতি সম্ভব। এছাড়াও পাশ্চাত্য মডেলকে স্বদেশে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে আত্মজিজ্ঞাসার

মাধ্যমে। ফলে উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী বলেছে— 'আমি কে ? আমি কি ?' উনিশ শতকে বঙ্গীয় নারীর এই উপলব্ধির জগতকে নতুনভাবে খোঁজার প্রচেষ্টা মৃণালিনীর মধ্যে পড়ে। ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র ব্যক্তিচেতনা নয়, সমষ্টি চেতনার ইঙ্গিত দিয়েছেন মৃণালিনীর মাধ্যমে।

উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনীর দিদিও পুরুষ সমাজকে Sacrifice করার কথা বলেছেন। আর মৃণালিনীর স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে ভেঙে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। এরপর মৃণালিনীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তার পিতাকে চিঠির মাধ্যমে জানান— "আমি খুব ভালো করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, বিবাহে আমার সুখ নাই। ইংলন্ডে ত এমন অনেকেই অবিবাহিতা থাকেন। থাকিয়া দেশের জন্য কাজ করেন, আমিও দেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাই।"১৮ এই যুগান্তকারী নারীভাবনা সার্বিক চেতনার পরিবর্তনকেই ইঙ্গিত করে। নারী খাঁচার পাখি হয়ে বন্দী থাকতে চায় না, মুক্তির মাধ্যমেই দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিয়ে আত্মগৌরবের কথা প্রচার করতে চায়। নারী স্বাধীনতার এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। নারীর পৌরুষদীপ্ত চরিত্রের প্রকাশের ফলে অন্দরমহলের নারী জীবনেও পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী ভাবনাতেও উনিশ শতকের নারীরা দীক্ষিত হয়েছে। লেখিকা সমষ্টি চেতনার মাধ্যমে এই দিকগুলিকে উপস্থাপন করেছেন। উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে নারীর এই স্বীকারোক্তিমূলক ভাবনা সমাজের সর্বস্তরেই ছড়িয়ে পড়েছিল। নবচেতনার জাদুস্পর্শে সমাজ ভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এরপর তার পিতা মৃণালিনীকে কলকাতায় নিয়ে যায় এবং তার বাল্য-সহচর ছোটুর সঙ্গে বিবাহ স্থির করেন। এরপর উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্বর্ণকুমারী দেবী এভাবে নারী চরিত্রের নির্মাণে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, বিজ্ঞানভাবনা, বাস্তবতার পাশাপাশি নারী স্বাধীনতার দিকগুলিকে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন। নারীর বীরত্ব, পৌরুষত্ব, মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলিকে তিনি উপন্যাসের প্লট নির্মাণে প্রয়োগ করেছেন। সেখানে নারী তার নীতি-আদর্শের জগৎ থেকে সরে আসেনি। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রেরা কেউ আত্মপরিচয়ের তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন হয়নি। সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তারা জয়ী হয়েছে। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি নবমূল্যবোধ তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়েছে। সামাজিক ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে উপন্যাসের নায়িকারা এগিয়ে চলেছে সামাজিক জড়তাকে দূর করতে করতে। উনিশ শতকেই সামাজিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে নারী জীবনে সৃষ্টি সুখের উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে রক্ষণশীল সমাজকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে মৃণালিনীর মতো নায়িকারা।

তথ্যসূত্র

১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯০৪, পৃ. ৬৩

২. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৯৯

৩. বসু, স্বপন, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ- ৮ শ্রাবণ ১৫১২, পৃ. ২৫

৪. মুরশিদ, গোলাম, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪৮

৫. ঘোষ, সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৮, মাঘ ১৪১৪, পৃ. ৬৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৫

৭. সংকলন, সম্পা. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, মুখোপাধ্যায় সুধাংশুশেখর, স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৯ বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ৫৭২

৮. তদেব, পৃ. ৫৭১

৯. তদেব, পৃ. ৬১০

১০. তদেব, পৃ. ৭৩৩

১১. তদেব, পৃ. ৭০৩

১২. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, রেনেসাঁসের আলোয় বঙ্গ দর্শন, পুনশ্চ, প্রথম পুনশ্চ প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২৮৭

১৩. দাস, জয়িতা, অন্তঃপুরের স্বর আত্মকথনের স্ত্রী-পর্ব, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০৪, পৃ. ৮১৬

১৪. সংকলন, সম্পা. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, মুখোপাধ্যায় সুধাংশুশেখর, স্বর্ণ কুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ৮১৬

১৫. তদেব, পৃ. ৮১৯

১৬. মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম নিউ এজ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৬৯

১৭. সংকলন, সম্পা. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, মুখোপাধ্যায় সুধাংশুশেখর, স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ.৮৫০

১৮. তদেব, পৃ. ৮৬২

সহায়ক আকর গ্রন্থ

১. সংকলন, সম্পা. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, মুখোপাধ্যায় সুধাংশুশেখর, স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. দে, নাড়ুগোপাল, উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী ২০১০

২. ঘোষ, কাননবিহারী, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন মহিলা রচিত বাংলা কথাসাহিত্য : আশালতা সিংহ, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৬

৩. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০২

৪. ভট্টাচার্য, সুতপা, মেয়েদের স্মৃতিকথা আত্মঅন্বেষণ ও আত্মদর্শনের নানা পর্যায়, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৭

৫. রায়, কবিশেখর কালিদাস, আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য, বুকস ওয়ে, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৫

৬. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, সে যুগে মায়েরা বড়ো, অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৬৩

ভাগাভাগি : প্রসঙ্গ দাঙ্গা ও দেশভাগ

সৌমেন মুখোপাধ্যায়

দাঙ্গা ও দেশভাগের পটভূমিকায় লেখা এক মর্মন্তুদ পরিণতির করুণ কাহিনি প্রফুল্ল রায়ের 'ভাগাভাগি' উপন্যাসটি। জাতীয় জীবনের চরম বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা পাই এই উপন্যাসে। দেশভাগের পূর্ববর্তী কিছু ঘটনাসমূহ যা আমাদের দেশভাগকে নিশ্চিত ও তরান্বিত করেছিল সেই সব ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনা আমরা এখানে পেয়ে যাই। দেশভাগ এবং তার ফলে যে সামূহিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল পাঞ্জাব এবং বাংলার মানুষের জীবনে তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। তারপর ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট যেন সেই সলতেতে অগ্নি সংযোগ করা হল। মহম্মদ আলি জিন্নার নির্দেশে মুসলিম লিগ ওই দিন থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস শুরু করেছিল পাকিস্তান নামে একটা নতুন দেশ পাবার জন্য। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'কে কেন্দ্র করে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। অবশেষে এল সেই অন্ধকার দিন। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬। একদল ধর্মপ্রাণ, আবেগসর্বস্ব মানুষকে ধর্মের নামে উসকে দিলে যা হয় তাই দেখল সেদিনের কলকাতা সহ নোয়াখালি, পাটনা, বোম্বে প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানের মানুষ। প্রফুল্ল রায় তাঁর বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে। থেমে ছিল না অন্য পক্ষও। আঘাতের পালটা প্রত্যাঘাতে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা 'Great Calcutta Killing' নামে পরিচিত। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন জীবনের চিত্রকে সামনে রেখে প্রফুল্ল রায়ের 'ভাগাভাগি' উপন্যাসটি রচিত।

উপন্যাসের প্রেক্ষাপট কলকাতা। বলা ভালো দক্ষিণ কলকাতার গ্রিন ভিউ রোড, লেক মার্কেট সংলগ্ন এলাকা। সময়কাল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাসের শেষ। সমস্ত ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যময় বসবাস এখানে। বলা যেতে পারে বৃহত্তর ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ এই অঞ্চলটি। দুটি পরিবারের জীবনচিত্রকে এখানে মূলত

উপস্থাপিত করা হয়েছে। মৃগাঙ্কশেখর দত্ত চৌধুরী ও তার ক্লাসের সহপাঠী সিরাজ অর্থাৎ সিরাজুল রহমান— এই দুই পরিবারের জীবনচিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবিটিও প্রফুল্ল রায় সুচারুভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সারা ভারতের মত এই অঞ্চলটিতেও উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষত ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মৃগাঙ্কশেখর এবং সিরাজ দুজনেই আধুনিকমনস্ক, উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন ধর্মের মানুষ হলেও তাদের আচার-আচরণ, যাতায়াত, আত্মীয় কুটুম্বিতা ইত্যাদি দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয় এই অঞ্চলের নানা ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতেন। এক ধর্মের অনুষ্ঠানে অন্য ধর্মের মানুষের উজ্জ্বল আনন্দময় উপস্থিতিও লক্ষ করা যেত। একের অনুষ্ঠানে অন্যের ঘরে মিষ্টি অথবা কেক পাঠানো হত। এক স্বর্গীয় মনোরম শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দিন কেটে যাচ্ছিল বেশ।

সমাজে উপর উপর এই আপাতত শান্তিকল্যাণ বজায় থাকলেও ভিতরে ভিতরে কোথাও যেন একটা ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছিল সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতার এই বাতাবরণ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা রকমের বিদ্রোহ, ব্রিটিশ সরকারের নিত্য নতুন প্রস্তাব, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, সংবিধান কমিটি গঠন ইত্যাদি নিয়ে সারা ভারত যখন উত্তাল তখনই মহঃ আলি জিন্নার নেতৃত্বে দ্বিজাতি তত্ত্বকে সামনে রেখে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা দেশের দাবি তুলল মুসলিম লিগ। এরই চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসাবে মহম্মদ আলি জিন্না উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের ষোলই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। উত্তেজনা বাড়তে থাকল। কিন্তু সিরাজ ও মৃগাঙ্কশেখরের বন্ধুত্বে কোন বাঁক দেখা গেল না। অবশেষে এল সেই অভিশপ্ত দিন। উনিশশো ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট মুসলিম লিগের নেতারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে শুরু করে দিল লুটপাট, দাঙ্গা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ। যেহেতু এই অঞ্চলটিতে সর্ব ধর্মের বসবাস এবং মুসলমানের আধিক্য ছিল তাই হিন্দুরা আক্রান্ত হল। মৃগাঙ্কশেখরের বাড়ি ঘর ভেঙে জ্বালিয়ে লুটপাট করা হল। কোন রকমে সিরাজ তাদের উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল। মৃগাঙ্কশেখরের ছোটবোন পঙ্গু মনীষা আগুনে পুড়ে যায়। সিরাজদের বাড়িতে দুষ্কৃতিরা বার বার আসে মৃগাঙ্কদের খোঁজে। হত্যার হুমকি দিয়ে যায় তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে আসাদ (সিরাজের মেয়ে রুকুর প্রেমিক) মৃগাঙ্কদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয় নিজেদের জীবনের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। যদিও শেষ রক্ষা আর হল না। ফেরার পথে তাকে খুন হতে হয় হিন্দুদের হাতে। অন্যদিকে অসহায় এক মুসলমান বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হতে হয় মৃগাঙ্কশেখরকে। চারিদিকে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বহু মানুষের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দাঙ্গার ভয়াবহতা কমে

যায়। পরিবেশ আস্তে আস্তে শান্ত হতে থাকে। কিন্তু তার মধ্যেই অসংখ্য মানুষের প্রাণ যায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই মারা পড়ে। মূলত নিরীহ সাধারণ মানুষেরাই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হল।

দাঙ্গা হয়ত থেমে গেল, পোড়া বাড়িতে হয়ত নতুন করে রঙের পোঁচ পড়ল— কিন্তু যে বিশ্বাসটা ভেঙে গেল উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে তা আর জোড়া লাগল না। তাই মৃগাঙ্কশেখররা দাঙ্গা মিটে যাওয়ার পর পুরানো বাড়িতে ফিরে এলেও পুরানো বন্ধুত্বের মধ্যে সেই আগের সমপ্রাণতা আর রইল না। একদিন যারা ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু, দাঙ্গা সেই বন্ধুত্বের সংজ্ঞাটাই যেন পালটে দিয়েছে। যে সিরাজ পাকিস্তান শব্দটাকে কল্পলোকের গল্পকথা বলে মনে করত, দাঙ্গা ও দেশভাগের পর সেই পাকিস্তানেই চলে যেতে চেয়েছে সে। একটা দাঙ্গা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্পষ্ট অদৃশ্য এক ভেদরেখা যেন টেনে দিয়েছে— যার একদিকে ভারত, অন্যদিকে পাকিস্তান। উপন্যাসের শেষে তাই দেখি বিষাদ-করুণ নয়নে সিরাজ ও তার পরিবার চলে যাচ্ছে ঢাকায়, আর অশ্রুসিক্ত বেদনামথিত হৃদয়ে ক্রন্দনরত মৃগাঙ্কশেখরের পরিবার সেই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিচ্ছেদ তো শুধুমাত্র মৃগাঙ্ক ও সিরাজের বিচ্ছেদ নয়, এই বিচ্ছেদ হাজার হাজার মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা আর মানবিকতার বিচ্ছেদ। জাতির জীবনে এ এক বেদনাবহ ইতিহাস। ভাগাভাগির এই রক্তাক্ত, বেদনাদীর্ণ ইতিহাসকেই প্রফুল্ল রায় তাঁর 'ভাগাভাগি' উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন।

প্রফুল্ল রায় এই উপন্যাসে নিরাসক্ত, নির্মোহ এবং পক্ষপাতহীন ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে ভারতের একটা ইতিহাস যেন রচনা করতে চেয়েছেন। সেই ইতিহাস একই সঙ্গে বেদনার ইতিহাস, কলঙ্কিত ইতিহাস এবং দ্বিখণ্ডিত ভারতের যন্ত্রণাজর্জর মানুষের ইতিহাস। সেই সঙ্গে দেশ-কাল-সময়ের অভিঘাতে কিভাবে মানব চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তার কথাও লেখক এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দাঙ্গার মত ভয়াবহ এবং বিষাক্ত জিনিস যে আর নেই একথা যেমন লেখক বললেন তেমনি এই দাঙ্গা যারা লাগায় তাদের কথা অর্থাৎ দাঙ্গার প্রকৃত কারণ পাঠকের সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে আমরা এই উপন্যাস থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কলকাতার সমাজ জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেয়ে যাই। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি কলকাতার বিভিন্ন স্থানে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীদের। যুদ্ধের প্রয়োজনে কেউ আমেরিকা কেউ ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের সেই দাপাদাপি আর নেই। তবে সেই অস্থিরতার স্মৃতি চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গেছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। লেখক তাঁর বর্ণনায় বলেছেন—

> "যুদ্ধের টাটকা স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে ম্যানসনগুলোর সামনে জাপানি বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য এখনও উঁচু উঁচু ব্যাফলন ওয়াল আর বালির বস্তার স্তূপ। ব্ল্যাক আউটের সময় কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তার আলোগুলোর গায়ে কালো ঠুলি পরিয়ে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে জাপানের বোমারু বিমানগুলো হানা দেবার সময় যেন বুঝতে না পারে এখানে একটা বিশাল শহর আছে; আছে সেনাদের ব্যারাক। বোমা ফেলে যাতে তাদের ধ্বংস করে না ফেলতে পারে, রাস্তার আলোগুলো তাই ওভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ঠুলিগুলো এখনও সরানো হয় নি। গোটা পার্ক জুড়ে অগুনতি ট্রেঞ্চ।"[১]

যুদ্ধ থেমে গেলেও তার বীভৎসতার নিদর্শন তখনো বয়ে চলেছে কলকাতা মহানগরী। স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেও একেবারে সব কিছু ঠিকঠাক তখনো হয়নি। বিশেষ করে মহিলারা সন্ধ্যার পর নিরাপদ বোধ করতেন না। যুদ্ধ শেষ হলে পর যদিও তাদের ঘোরাঘুরির সীমানা বেড়েছিল তবুও সন্ধ্যা নামার আগেই মহিলারা পারতপক্ষে বাড়ি ফিরে আসতেন। কারণ হিসাবে লেখক জানিয়েছেন—

> "...তবে আমেরিকান টমিদের এখনও দেশে ফেরা হয়নি। মদে চুর চুর হয়ে তারা পারে না এমন অপকর্ম নেই। তার উপর মিত্র শক্তির জয় হয়েছে। যতদিন যুদ্ধ চলছিল তবু টমিদের কড়া নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হত। এখন তারা একেবারে লাগাম-ছাড়া। ...তাই মেয়েরা এখনও রাস্তায় নিরাপদ নয়।"[২]

তবে এতকিছুর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় ছিল তখনকার বাংলায়। এলাকার প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষ নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতেন—

> "বড়দিন, ঈদ, দুর্গাপুজো ইত্যাদি নানা উৎসবে আর পরবে এক ধর্মের মানুষ আরেক ধর্মের মানুষকে শুভেচ্ছা জানায়, সম্প্রীতির স্মারক হিসেবে বাক্সভর্তি মিষ্টি পাঠিয়ে দেয়"[৩]

গ্রিন ভিউ রোডের দুর্গাপূজার যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে পার্সি, হিন্দু, মুসলমান সব শ্রেণির মানুষকেই রাখা হয়েছে। তাদের সহৃদয় উপস্থিতি পূজার দিনগুলিকে উৎসবমুখর করে তুলত। যুদ্ধের কালো দিনগুলিকে সরিয়ে জীবন যেন নতুন করে সেজে উঠেছে। জাপানি বোমার ভয়ে যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারাও একে একে ফিরে আসতে শুরু করেছিল।

আপাত শান্ত এই পরিবেশের অন্তরালে কোথায় যেন একটা ভাঙনের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন ইতিহাসের পাতায় যদি আমরা চোখ রাখি তাহলে দেখব ভারতের

রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে যেন একাধিক টুকরো টুকরো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছিল। একদিকে গান্ধীজী, জহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবর্গের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যদিকে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ নিজেদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে চলেছে। ব্রিটিশ সরকার বিশেষ করে কনজারভেটিব পার্টির প্রধান চার্চিলের সাম্রাজ্যলোলুপ ঔপনিবেশিক নীতি, ভারতের জনমানসে গান্ধীজীর প্রভাব, এবং আরো কিছু পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, ইংল্যান্ডের নির্বাচনে লেবার পার্টির জয় সব মিলিয়ে ভারতের জনমানসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিমরা নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে থাকে জিন্নার নেতৃত্বে। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশে মসুলিম লিগ ছোট ছোট সভা করে এবং বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করে, অর্ধ-সত্য, অর্ধ-মিথ্যা ভাষণ দিয়ে, পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়ে শিক্ষিত তরুণ মুসলমানদের মুসলিম লিগে যুক্ত হবার আহ্বান জানাতে থাকে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় আই .এন .এ. সেনাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন। পুলিশের গুলিতে ছাত্র মৃত্যুতে উত্তাল হয় ভারত। এরপর ক্যাবিনেট মিশন থেকে জহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস বেরিয়ে এলে চূড়ান্ত সংকট তৈরি হয়। এরপর জিন্না ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন পাকিস্তানের দাবিতে। শুরু হয়ে যায় প্রাণঘাতী, ভাতৃঘাতী দাঙ্গা। ভারতের ইতিহাসে যা কলকাতার দাঙ্গা নামে পরিচিত। এরপর সারা ভারতেই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। নোয়াখালি, বরিশাল, কুমিল্লা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ— প্রায় সর্বত্রই দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা।

ইতিহাসের এই বাস্তব সত্যকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন প্রফুল্ল রায় তাঁর উপন্যাসে। 'ভাগাভাগি' উপন্যাসে তিনি দেখালেন মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের মতানৈক্যের ফলে যে উদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার হাত ধরেই জন্ম নেয় আলি হোসেন বা সুরেশ্বরের মত মানুষেরা। এরা ধর্মের নামে মানুষকে উস্কানি দিতে থাকে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষয়টিকে প্রকট করে তুলতে চায়। এই উপন্যাসে দেখি আলি হোসেন বারবার সিরাজের বাড়িতে এসেছে। সিরাজরা তাকে পছন্দ না করলেও, তার কথাকে মান্যতা না দিলেও সে মাঝে মধ্যেই সিরাজদের বাড়িতে এসেছে এবং একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে বলেছে যে ইংরেজদের বর্তমানে যে দুরবস্থা চলছে তাতে করে তারা আর বেশিদিন ভারতে থাকবে না। ভারত স্বাধীন হবেই। আর এজন্যই সে সিরাজকে বলেছে—

> "...এই সুযোগে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র চাই— তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি দেশ। আর সেই দেশটা হবে টু নেশন থিওরি অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে।"[৪]

হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্য যে ভ্রান্ত একটা শব্দ একথাও আলি হোসেন বারবার বলেছে।

হিন্দুদের বিষয়ে সে এতটাই বিদ্বেষ পোষণ করে যে সে সিরাজকে তার মেয়ের ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে বলেছে তাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি না করে আলিগড়ে ভর্তি করতে। কারণ আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আর শান্তিনিকেতনে হিন্দুদের গন্ধ আছে। শুধু তাই নয় সিরাজকে সে হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে মৃগাঙ্কশেখর অর্থাৎ হিন্দুদের সাথে বেশি মেলামেশা করাটা তার পছন্দ নয়। সিরাজকে সে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম লিগে আনতে চেয়েছে—

> "আপনার মত এডুকেশনিস্টদের লিডাররা খুব বেশি করে চাইছেন। ইনটেলেকচুয়ালরা, এডুকেটেড লোকেরা লিগে জয়েন না করলে পার্টি চালাবে কারা ? শুধু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষ দিয়ে রাজনৈতিক দল চালানো যায় না।"[৫]

এখানে আমরা মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। মহম্মদ আলি জিন্না অর্ধশিক্ষিত, ধর্মান্ধ মুসলমানদের নিয়ে রাজনীতির পক্ষপাতি ছিলেন না।[৬] আলি হোসেনের প্রচারের ফলে অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলিমও যে লিগে যোগদান করেছিল তা আমরা এই উপন্যাসে দেখেছি।

আলি হোসেনের মত লোকেরা যেমন মুসলিম স্বার্থ এবং পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করে চলেছে, অন্যদিকে ঠিক এর বিপরীতধর্মী আচরণ দেখি সুরেশ্বরদের মত মানুষের আচরণে এবং বক্তব্যে। মৃগাঙ্কশেখর ও শোভনাদের বাড়িতে তার প্রায়ই আসা যাওয়া। কপালে লাল টপ্পা পরে সে হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে তাদের কাছে। শোভনরা যে প্রায়ই সিরাজদের বাড়িতে যায় এবং ওদেরও যে শোভনদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত আছে এই বিষয়ে সুরেশ্বর তাদের সতর্ক করে দেয়। আগমার্কা হিন্দুদের ধ্বজাধারী এই লোকটি যখন দেখে মুসলমান পন্ডিত উর্দু গজল শেখাতে আসে মৃগাঙ্কর বোন মণীষাকে তখন সে বলে ওঠে—

> "এসব ঠিক হচ্ছে না। বাঙালি হিন্দুর মেয়ে গজল টজল বাদ দিয়ে কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ভজন এসব শিখুক।"[৭]

আলি হোসেন যেমন মৃগাঙ্কদের সঙ্গে সিরাজদের মেলামেশার বিপক্ষে, সুরেশ্বরও ঠিক সেই রকম। তিনিও সিরাজদের সঙ্গে মৃগাঙ্কদের ওঠা বসা একদম পছন্দ করেন না। আসলে ধর্ম যতই আলাদা হোক না কেন মৌলবাদের রূপটা একই রকম। দুটোই ভয়ঙ্কর। মুসলমানরা যেমন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কেন্দ্র করে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষয় ছড়িয়ে দিচ্ছে, সুরেশ্বরও তেমনি মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাবকে হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সুরেশ্বর মৃগাঙ্ককে বলেছে—

> "ওরা ওরাই, ওদের সঙ্গে আমাদের কোন ভাবেই মিলতে পারে না। না রিলিজিয়নে, না কালচারে, না সোশাল প্যাটার্নে। পাশাপাশি থাকলে ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু রিলেশন থাকা দরকার স্রেফ সেটুকুই রাখবে। তার বেশি একটুও নয়। এত মেশামেশি বন্ধ কর।"[৮]

বাংলায় তখন আলি হোসেন বা সুরেশ্বরদের মত অনেক মানুষই এই ভাবে বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছিল হিতাহিতের কথা বা পরিণামের কথা না ভেবেই। ফলে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হতে থাকে। মনের মধ্যে বৈরিতার জন্ম হতে থাকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। এই সুযোগে তারা ধর্মের নামে মগজধোলাই করতে থাকে সাধারণ মানুষকে। তাই সুরেশ্বরকে বলতে শুনি—

> "বেশি লিবারেল হয়ে হয়ে হিন্দুদের যে কী সর্বনাশটা হচ্ছে, সেটা কখনও ভেবে দেখেছ! নিজেদের হাজার হাজার বছরের ধর্ম আর সোসাইটিকে বাঁচিয়ে রাখাটা প্রতিটি হিন্দুর প্রাইমারি ডিউটি।"[৯]

এই ধরনের প্রচার পালটা প্রচারে সাধারণ দরিদ্র হিন্দু বা মুসলমান মানুষের মনে বিভ্রান্তি জন্মাতে থাকে। তার উপর উচ্চস্তরের কংগ্রেস এবং লিগের নেতাদের কার্যকলাপে তারা স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকেই যারা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তারা খুবই ধন্দে পড়ে যায়। যেমন সিরাজ। সে জাতীয়তাবাদী মুসলিম। সে ভাবতে থাকে এই পরিস্থিতিতে কি করা প্রয়োজন। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে সে তার বন্ধু মৃগাঙ্ককে বলেছে—

> "সত্যিই যদি পাকিস্তান নামে আলাদা একটা দেশ শেষ পর্যন্ত হয়ই, ন্যাশানালিস্ট মুসলিমদের অবস্থা কী হবে?"[১০]

চারিদিকে একটা সন্দেহজনক পরিস্থিতি, তার উপর ভারতীয় রাজনীতিতে উথাল পাতাল চলছে তখন। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখতে পাব আই.এন.এ.-এর বন্দী মুক্তি আন্দোলনে সারা দেশের সঙ্গে কলকাতাও তখন উত্তাল। বন্দী মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনে পুলিশের লাঠি চালানোর ফলে ছাত্র মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতি তখন অগ্নিগর্ভ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চিহ্ন' (১৯৪৭) উপন্যাসে ছাত্র আন্দোলনের এই দিকটি দেখিয়েছেন। প্রফুল্ল রায়ও তাঁর 'ভাগাভাগি' উপন্যাসে এই চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আসাদের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনের ছবি দেখি যেখানে পুলিশের গুলিতে আসাদ আহত হয়েছে। গোটা কলকাতায় ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ নির্মম ভাবে অত্যাচার করেছে। এর পাশাপাশি নৌবিদ্রোহ এবং ইংল্যান্ডে

কনজারভেটিব সরকারের পতন ও লেবার পার্টির উত্থানের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক। তিনি বলেছেন লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ভারতের সংবিধান রচনার বিষয়ে হাউস অফ কমনস্-এ ঘোষণা করলেন—

> "ভারত তার পছন্দ মতো সংবিধান রচনা করে নিক। তবে তাতে ভারতীয় জনসমাজের গরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।"[১১]

এই ঘোষণায় কংগ্রেস উৎফুল্ল হলেও লিগ মেনে নিল না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিকে হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান হিসাবে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে দিল। এতে মুসলিম লিগ রাজি হল। কংগ্রেসও সহমত হল। স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস প্রথমে বুঝতে না পারলেও মুসলিম লিগ ব্যাপারটিকে পাকিস্তান তৈরির প্রথম ধাপ বলে মনে করতে থাকে। একথা ঐতিহাসিক সত্য। আলোচ্য উপন্যাসেও দেখি আলি হোসেনের মত লোকেরা এই খবরে উৎফুল্ল হয়ে পড়ে। তারা প্রচার করতে থাকে মুসলিম লিগ ইংরেজ সরকারকে পাকিস্তানের দাবী মানাতে সক্ষম হয়েছে। আলি হোসেন সিরাজকে বলেছে যে দুনিয়ায় আর কোন শক্তিই নেই যা পাকিস্তান গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনকি সিরাজের মত শিক্ষিত অধ্যাপক, জাতীয়তাবাদী মানুষও যেন মনে মনে বিশ্বাস করতে থাকে হয়তো পাকিস্তান নামে আলাদা একটা দেশ তৈরি হয়েই যাবে। আলি হোসেনের মত লোকেরা এটা প্রচার করতে থাকে যে কংগ্রেস আসলে হিন্দুদের দল। তারা মুসলিম কমিউনিটির স্বার্থের কথা ভাবে না। তাই পাকিস্তান গঠন করাই তাদের এক মাত্র উপায়। সে সিরাজকে বলেছে—

> "কংগ্রেস সম্পর্কে আমরা মুসলিমরা টোটালি ডিসইল্যুশনড। জিন্নার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে; হিন্দুত্ববাদ থেকে কংগ্রেসের বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। উই কান্ট সাবমিট, সাবমার্জ অর সারেন্ডার টু দি ডিকটেটস অফ দ্যা হাইকম্যান্ড অফ দ্য কংগ্রেস। আমাদের কমিউনিটির স্বার্থ, আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদেরই দেখতে হবে, হিন্দু কংগ্রেস মুসলিমদের জন্য কিছুই করবে না।"[১২]

এদিকে দলে দলে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা লিগে যোগদান করতে থাকল। মুসলিম লিগের মিছিলে কলকাতার যে সমস্ত অঞ্চলে হাতে গোনা লোক হত সেখানে মিছিলের বহর বৃদ্ধি পেতে থাকল। অবশ্য সুরেশ্বরের মত লোকেরাও চুপ করে বসে ছিল না। তারাও নিজেদের মত করে যুক্তি খাড়া করতে তাকে। এর মধ্যেই আবার জাতীয় রাজনীতিতে ঘটে যায় এক সমাপতন। কংগ্রেস প্রথমে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিলেও পরে আবার অমান্য করার কথা ঘোষণা করে। এই ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে তীব্র চাঞ্চল্য

সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা এবং হিন্দুরাও এতে ভয় পেয়ে যায়। আলোচ্য উপন্যাসেও দেখি মৃগাঙ্কশেখর, আসাদের মত মুক্তমনা মানুষেরাও মনে করেন কংগ্রেসের এই ঘোষণার ফল হবে মারাত্মক। আর ঘটেও যায় তাই—

> "আসাদ সেদিন যা বলে গিয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে যায়। ক্রুদ্ধ জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নাকচ করে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। আর আবেদন নিবেদন বা আলোচনার টেবিলে বসা নয়, সারা ভারত জুড়ে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়ে সবলে মুসলমানদের স্বপ্নরাজ্য 'পাকিস্তান' ছিনিয়ে নিতে হবে।"[১৩]

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়ার পর দেশ জুড়ে বিশেষত কলকাতায় একটা অস্বস্তিকর দম বন্ধ করা অনিশ্চয়তা আর চাপা ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মারাত্মক কিছু যে একটা ঘটতে চলছে— এই আশঙ্কায় অনেকেই ভুগছিলেন। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে 'কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ' বা 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল মুসলিম লিগের মিছিল। তারপর হঠাৎ করে তারা মারমুখি হয়ে উঠল—

> "হঠাৎ পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নানা দিক থেকে অন্ধকারে বহু লোক উন্মাদের মত চিৎকার করতে করতে গ্রিন ভিউ রোডে ঢুকে পড়ে। তাদের কারো কারো হাতে মশাল, লাঠি, বর্শা এবং নানা ধরনের আদিম অস্ত্র। মশালের আলোয় লোকগুলোকে বীভৎস এবং হিংস্র দেখাচ্ছে।"[১৪]

উত্তেজিত জনতা পেট্রোল ঢেলে মৃগাঙ্কদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাশবিক ক্রোধে তারা যেন জন্তু হয়ে গেছে। সিরাজরা কোন রকমে তাদের উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। এরকম অনেক মুসলমানই হিন্দুদের ত্রাতা হয়ে ওঠে। অবশ্য হিন্দু প্রধান এলাকায় ঠিক এর উল্টো ছবিও প্রত্যক্ষ করি। হিন্দুরাও থেমে থাকল না। তারাও পাল্টা মার দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে ওঠে। যেন শয়তানের রাজত্ব কায়েম হয়েছে মহানগরীর বুকে। 'আল্লাহু আকবর' আর 'কালী মাঈকি জয়' ধ্বনিতে লুণ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতা। জীবন বিপন্ন করে এই ভয়ানক পরিস্থিতির মাঝেও দুষ্কৃতিদের রাত ঘুমের সুযোগে আসাদ মৃগাঙ্কদের দিতে গেল দিদির বাড়িতে। মহাশ্মশানের স্তব্ধতা ভেদ করে ছুটে চলেছে তাদের ঘোড়ার গাড়ি। যেন কোন অচেনা মৃত্যু উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলেছে তারা। রাত্রির শেষে হালকা আলোর আভায় গাড়ির ভিতর থেকে মৃগাঙ্করা যা দেখতে পায় তাতে মনে হয় মানুষ যেন প্রস্তর যুগে পৌঁছে গেছে। গাড়ির দরজার ঢিলে পাল্লা যখনই খুলে যাচ্ছে তখনই তাদের চোখে পড়ছে—

"কোথাও দু একটা কোথাও অগুনতি মৃতদেহ, কোথাও ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ির ধ্বংস্তূপ, কোথাও আধপোড়া ভাঙা আসবাব, হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন, ছেঁড়া তোষক, বালিশ ইত্যাদি।"[১৫]

ভোরের ঠিক মুখে তারা পৌঁছে গেল লেক মার্কেটের কাছে তাদের গন্তব্যস্থলে। তাদের নামিয়ে দিয়ে আসাদরা যখন ফিরে আসতে লাগল তখন সকাল হয়ে আসছে। কিন্তু যে সকাল নেমে এল তাদের জীবনে তা রাতের চেয়েও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। জীবনকে বাজি রেখে আসাদ যে হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়েছিল সেই হিন্দুদের হাতেই তাকে খুন হতে হল। এই মৃত্যু আসলে মানবতার মৃত্যু। এই মৃত্যু আমাদের শুভ বুদ্ধির মৃত্যু, বিশ্বাস আর আস্থাবোধের মৃত্যু— যা আমাদের চেতনাকে সমূলে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

কলকাতার সর্বত্রই এই মানবতার অপমৃত্যু ঘটেছিল তখন। সামান্য নিরীহ মুসলিম একটি চাষিকে তাড়া করে পিটিয়ে মেরে উন্মত্ত ঘাতকেরা যে কি অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করে তা আমরা জানি না, বা নিরীহ সাধারণ একজন হিন্দুকে পুড়িয়ে মেরে দুষ্কৃতিরা কোন পাশবিক আনন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করে সেটাও আমাদের জানা নেই। তবে সেই সময়ের কলকাতা যে নরকের পঙ্ককুণ্ড হয়ে উঠেছিল, রক্ত নদীর ধারা হয়ে উঠেছিল তা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি। প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটির কতকগুলি পংক্তি আমাদের খুব মনে পড়ে—

"মানুষ মেরেছি আমি— তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি— তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
তবুও কোথাও কোন আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।"[১৬]

দাঙ্গার ক্ষেত্রে পুলিশ বা মিলিটারির ভূমিকা থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গার ক'দিন পুলিশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তাদের অত নিষ্ক্রিয়তার জন্য এই দাঙ্গার ঘটনা অনেকখানি ভয়াবহ আকার নেয়। মুসলিম লিগ যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল তখন বাংলা এবং সিন্ধুপ্রদেশ মাত্র এই দুটি জায়গায় লিগ চালিত সরকার

ছিল। বাংলায় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব সুরাবর্দী খান। তাই তাঁর ছিল অগ্নিপরীক্ষা। কারণ ওই দিন যে শান্তি বিঘ্নিত হবে এটা ছিল বাস্তব সত্য। তাই পুলিশ প্রশাসন বা সামরিক বাহিনীকে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য তৈরি রাখা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর আশু কর্তব্য। কিন্তু পুলিশ বা সামরিক বাহিনী যে সেদিন নিষ্ক্রিয় ছিল এবং কোথাও কোথাও দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে দাঙ্গাবাজদের সুবিধা হয়েছিল— এই ধরনের অভিযোগ আমরা শুনতে পাই। বিশেষত কলকাতা দাঙ্গার (১৬-১৮ আগস্ট, ১৯৪৬) অব্যবহিত পরে সেই সময়ের অবিভক্ত বাংলাদেশের বিধানসভায় সুরাবর্দী সরকারের বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল, সেই অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুলিশের ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। সুরাবর্দীর পুলিশের উপর যে সেদিন অনেকেই আস্থা রাখতে পারেননি একথাও আমরা তার বক্তব্য থেকে জানতে পারি।[১৭] একই বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা যেন পেয়ে যাই আলোচ্য উপন্যাসে— যেখানে দেখি পুলিশের উপর ভরসা না রেখে হিন্দুরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে চাইছে। কথা প্রসঙ্গে সুরেশ্বর আনন্দশঙ্করকে (মৃগাঙ্কের ভগ্নিপতি) বলেছে—

> "অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সুরাবর্দির পুলিশের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যের আশা নেই। নিজেদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। আনন্দশঙ্কর, সস্তায় একটা পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র সাতশ টাকা। সঙ্গে পঁচিশটা তাজা বুলেটও পাবে। এটা তুমি নিয়ে নাও।"[১৮]

কলকাতার রাস্তায় অবৈধ অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে তা জনগণের হাতেও চলে যাচ্ছে— এমনি অবস্থা গোটা কলকাতা জুড়ে চলছে। এই অবস্থায় প্রশাসন যে ব্যর্থ ছিল সেকথা বলাই চলে। উপন্যাসে মৃগাঙ্গশেখরের বাবা অধ্যাপক সুধাংশুশেখর বাবুকে আনন্দশঙ্কর হতাশা ও আক্ষেপের সুরে বলেছেন—

> "রাস্তায় পুলিশ নেই, মিলিটারি নেই। 'রুল অফ ল' বলে একটা কথা শুনতাম। সে সব বোধ হয় এদেশের জন্য নয়। এই খুনোখুনি কতদিন চলবে কে জানে।"[১৯]

কলকাতার এই দাঙ্গা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে সাধারণ মানুষ অনেক দিন নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিল। পুলিশ তাৎক্ষণিক যথাযথ ব্যবস্থা যে নেয়নি সেকথা বললে অন্যায় হয় না। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে নোয়াখালি, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বে, পাঞ্জাব— সর্বত্রই উত্তাল হয়ে ওঠে। নির্বিচারে হত্যার নেশা তখন যেন চেপে বসেছিল মানুষের মাথায়। ধীরে ধীরে এই দাঙ্গার প্রকোপ কমতে থাকলেও চোরাগোপ্তা খুনখারাপি লেগেই ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ঠিকঠাক হল ঠিকই, কিন্তু যে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ল তার ফলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সেই

সম্পর্কটা আর আগের মত রইল না। দাঙ্গার বীভৎস অভিজ্ঞতা মানুষকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া মানবিকতার ছবিই লেখক তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখি মৃগাঙ্কশেখর সিরাজের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বলেছে—

> ''সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার সিরাজরা আর আফজল সাহেবরা আমার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বললেন না; কেমন যেন বদলে গেছেন।''

কত সুন্দর সম্পর্কগুলো এক লহমায় কেমন করে যেন বদলে গেল। দাঙ্গা নামে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য যেন তাদের মাঝখানে এক সমুদ্র ব্যবধান তৈরি করে দিয়ে গেছে। এই ব্যবধান আর জোড়া লাগার নয়, বরং এ শুধু বেড়েই চলে।

এত কিছুর মূল্যে এল দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। ভারতের হৃদয় ভেঙে তৈরি হল আরেকটা দেশ—'পাকিস্তান'। মুসলমানদের কল্পনার সেই স্বর্গরাজ্য। শুরু হল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর গণ-প্রব্রজন। এই উপন্যাসেও দেখি সিরাজরা কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যাচ্ছে। মৃগাঙ্ক তাকে আটকাবার চেষ্টা করলে সে বলেছে–

> ''এই একটা বছর যা ঘটে গেল তাতে এখানে আর থাকতে সাহস হচ্ছে না। সব সময় অবিশ্বাস আর সংশয়ে ভুগছি।''

মহাশ্মশানের স্তব্ধতার মধ্যে,বিশ্বাস আর মানবিকতার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তারা অনুভব করল তাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর শেষ কোথায় তা তাদের জানা নেই। এক অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ বেদনায় অশ্রুসিক্ত নয়নে, ভগ্ন হৃদয়ে মৃগাঙ্করা উদ্ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে রইল শিয়ালদা স্টেশনে। আর সিরাজের পরিবারকে নিয়ে ট্রেন এগিয়ে চলল পূর্ব-পাকিস্তানের দিকে। কলকাতার দাঙ্গা সিরাজ আর মৃগাঙ্কদের বিশ্বাসে যে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল দেশভাগ সেই চিড়কে প্রশস্ত ফাটলে পরিণত করেছে। দাঙ্গা ও দেশভাগ— এই ভাগাভাগির মধ্যে কত মানুষের কত স্বপ্নের সমাধি ঘটে গেল, কত সম্পর্কের অপমৃত্যু ঘটে গেল— তার কোন হিসাব নেই। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে এভাবেই দেশ-কাল-মানুষ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একটা দেশের, একটা সময়কালের আবর্তে মানব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ছবি জীবন্ত করে তুলেছেন প্রফুল্ল রায় 'ভাগাভাগি' উপন্যাসে। ঐতিহাসিক তথ্য এবং কল্পনার ভাবসত্য উপন্যাসটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ঐতিহাসিক ঘটনা কিভাবে মানব চরিত্রের মধ্যেকার সম্পর্কের বৃত্তগুলো ভেঙে দেয় তার সার্থক রূপায়ণ দেখিয়েছেন প্রফুল্ল রায় তাঁর উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র

১. প্রফুল্ল রায়, ভাগাভাগি, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১১।
২. তদেব, পৃ. ৭৪।
৩. তদেব, পৃ. ১০১
৪. তদেব, পৃ.৩১
৫. তদেব, পৃ.২৯
৬. অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদনা), কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা, ২০১৬, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ.১৩৫
৭. প্রফুল্ল রায়, ভাগাভাগি, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫০।
৮. তদেব, পৃ.৪৮
৯. তদেব, পৃ.৪৮
১০. তদেব, পৃ.১২৪
১১. তদেব, পৃ.১২০
১২. তদেব, পৃ.১২২
১৩. তদেব, পৃ.১২৮
১৪. তদেব, পৃ.১৩০
১৫. তদেব, পৃ.১৪০
১৬. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৮৮, ভারবি, কলকাতা, পৃ.১৩৭
১৭. অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদনা), কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা, ২০১৬, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ. ৪৯
১৮. প্রফুল্ল রায়, ভাগাভাগি, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৪৪
১৯. তদেব, পৃ.১৪৩
২০. তদেব, পৃ.১৫০
২১. তদেব, পৃ.১৫২

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. প্রফুল্ল রায়, কেয়াপাতার নৌকো, ২০১৬, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
২. প্রফুল্ল রায়, দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর, ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৩. প্রফুল্ল রায়, বিন্দুমাত্র, ১৯৯৯, দে'জ পাললিশিং, কলকাতা
৪. প্রফুল্ল রায়, ভাগাভাগি, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা; বাংলা উপন্যাসের ৭৫ বছর (১৯২৩-৯৭), ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২. অর্পিতা বসু (সম্পাদনা), উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বসতি : সমসাময়িক পত্র পত্রিকায়, ২০১৭, গাঙচিল, কলকাতা।
৩. অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদনা), কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা, ২০১৬, গাঙচিল, কলকাতা।
৪. অশ্রুকুমার শিকদার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, ২০১৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৫. আশিস হীরা, উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে, ২০১৯, গাঙচিল, কলকাতা।
৬. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৮৮, ভারবি, কলকাতা।
৭. প্রসূন বর্মন (সম্পাদনা), দেশভাগ দেশত্যাগ : প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত, ২০১৭, গাঙচিল, কলকাতা।
৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৯. সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদনা), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, ২০১১, গাঙচিল, কলকাতা।
১০. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ২০০৯-২০১০, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা।
১১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস (অনুবাদ : কৃষ্ণেন্দু রায়), ২০১০, অরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

পত্র পত্রিকা

১. অমর দে (সম্পাদনা), গল্পসরণি, প্রফুল্ল রায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৭, কলকাতা।
২. গৌরীশংকর সরকার (সম্পাদনা), ঐক্য, প্রফুল্ল রায় সম্মাননা সংখ্যা, ২০১৮, পশ্চিম মেদিনীপুর।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ বিচিত্র ভূমিকায় নারী

শুভম চ্যাটার্জী

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নামক শাখাটির সার্থক সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুমুখী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রটি আজ সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই সুদীর্ঘপথে আলো জ্বেলেছেন অনেক প্রতিভাবান শিল্পী; তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত একালের বিস্ময়কর প্রতিভাধর সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬ খ্রি.)। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবর্তন। মহাশ্বেতার দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যযাত্রার মধ্যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ভিড় করে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটগুলির মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয়— তাঁর গল্পে বিচিত্র ভূমিকায় নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর গল্পের পরিসর বৃহৎ, তাই এই প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ছোটগল্প নির্বাচন করেছি। গল্পগুলি যথাক্রমে— 'বাঁয়েন' (১৯৭৫ খ্রি.), 'স্তনদায়িনী' (১৯৭৭ খ্রি.) এবং 'দৌপদী' (১৯৭৭ খ্রি.)।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারী বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে তারা একটা দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হেঁটেছে। সেখানে দেখেছি অত্যাচার সহ বঞ্চিত ('শাস্তি') নারীদের অসীম সাহসী ('নষ্টনীড়') হয়ে ওঠার গল্প এবং সেখান থেকে নারী চরিত্রে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত ('স্ত্রীর পত্র') হয়েছে। অপরদিকে শরৎচন্দ্রের গল্পে নারী আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তাদের রচনা করেছেন। সেখানে নারীরা বেশিরভাগই প্রেমিকা ('বিলাসী'); আপন মনের মাধুরী, আবেগ মিশিয়ে তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আবার বেশ কিছু গল্পে নারীরা সমাজে অবহেলিত-নিপীড়িত ('অভাগীর স্বর্গ')। বাংলা ছোটগল্পে এরপরই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অব্যবহিত পরবর্তীকালে। দুই বিশ্বযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে নারী তার নিজের ভাগ্য ও অধিকার রক্ষায় সচেতন হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে নারী অবরোধবাসিনী হয়ে থাকতে চায়নি। তারা পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংসারের বাইরে জীবিকায় নেমেছিল ('অবতরণিকা', 'অভিনেত্রী')। বাংলা সাহিত্যে ষাটের দশক পেরিয়ে সত্তরের দশকে উন্মোচিত হয় নারীকেন্দ্রিক আলোচনার একটি নতুন দিগন্ত। নারীকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের

আকাঙ্ক্ষা গল্পকারদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এরফলে নারীর আদর্শ-জীবন-পরিবেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গল্পে স্থান পায়। মধ্যবিত্ত নারীর পাশাপাশি প্রাধান্য পেল জনজাতি-আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া সমাজের নারীরা। শুধু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই গল্প আটকে রইল না, নারীদের বিচিত্রভাবে দেখার প্রয়াস শুরু হল।

মহাশ্বেতার ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন-সংকট বেশি নেই; রয়েছে আদিবাসী মানুষের কথা, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি আর সেই সঙ্গে নতুন মাত্রা দান করেছে গল্পে নারীর ভূমিকাটি। এখানেই গল্পকার হিসেবে তিনি অনন্য। তিনি উপলব্ধি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠী সংঘর্ষ, হিংসা, কালোবাজারি। কিন্তু এসব থেকে মহাশ্বেতা সরে এসে নিম্নবিত্ত জনজীবন নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন, আর সেই সূত্র ধরেই উঠে এল ভিন্ন ভূমিকায় নারী চরিত্রগুলি। তিনি প্রচলিত ধারায় সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যেতে চাননি। গল্পের গঠনকৌশল নিয়ে কোনদিন ভাবেননি, শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনা বয়ন করে গেছেন আশ্চর্য প্রতিভা শক্তির মাধ্যমে। তাঁর কলমের আঁচড়ে উঠে এসেছে নারীর ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভাবনা, ভিন্ন পরিস্থিতির কথা। এর কারণ, তিনি ছিলেন সময় ও সমাজ সচেতন শিল্পী।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে নারী চরিত্রগুলি একেবারে কাছের থেকে দেখা, যেন রক্ত-মাংসের সজীবতা দিয়ে ঘেরা। আসলে তাঁর গল্পে ভারতবর্ষের নারীর ভিন্ন স্বরূপটি নানা রূপে ব্যক্ত হয়েছে পাঠকের সম্মুখে। আর তারা নিজ স্বাতন্ত্র্যে সকলেই সমুজ্জ্বল। সেখানে যেমন রয়েছে নারীর উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ, তেমনি অপরদিকে রয়েছে তাদের আনন্দ-দুঃখ-বেদনা-অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন। রোমান্টিকতা, প্রেম-ভালোবাসা, সংসার জীবনের বাইরে নারী জীবন কেমন— তাই বেশি করে মহাশ্বেতার গল্পে দেখানো হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নারীকে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, সেই বিষয়কেই তিনি যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেখানে গল্পকারকে আশ্রয় নিতে হয়েছে কোথাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার, আবার কোথাও মিথ বা পুরাণের। তাই গল্পে নারী চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে সক্রিয়, সচেতন। একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে তারা স্থির থাকেনি। কোথাও বা নারী সংস্কারের বলি ('বাঁয়েন'), কোথাও নারী হয়েছে 'প্রফেশ্যনাল মাদার' ('স্তনদায়িনী'), আবার কোথাও বা প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত ('দ্রৌপদী') হয়েছে।

বাঁয়েন : একটি নারীর অস্তিত্ব রক্ষার গল্প 'বাঁয়েন' (১৯৭৫ খ্রি.)। ডোম সমাজকে কেন্দ্র করে এই গল্পটি লেখা হয়েছে। গল্পে তিনটি মূল চরিত্র— মলিন্দর, তার পুত্র ভগীরথ এবং পত্নী চণ্ডীদাসী। চণ্ডী গঙ্গোদাসী কীভাবে চণ্ডী বাঁয়েনে পরিণত হয়েছে, তাই এই গল্পের মূল কাহিনি। গল্পটি শুরু হয়েছে 'বাঁয়েন' ও 'ডাইনি' সম্পর্কে চিরপ্রচলিত প্রথা ও রীতি

নিয়ে "বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন মরলে গাঁয়ের ছেলেপিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বাঁয়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।"[১] চণ্ডীর বাঁয়েন হওয়ার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ কাহিনি।

মলিন্দর একসময় শ্মশানে ডোমের কাজ করত। কিন্তু সে সামান্য শিক্ষিত হওয়ার পরে মহকুমার লাশ ঘরে কাজ পায়। সমাজে স্থান পেলেও মলিন্দরের মন ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন। অন্যদিকে ছোট শিশুর (পাঁচ বছর বয়সের কম) মৃত্যু হলে তাকে মাটিতে পোঁতার কাজ করত চণ্ডীর পিতা। পিতার মৃত্যু হলে চণ্ডী সে কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মলিন্দরের সঙ্গে বিবাহের পর চণ্ডী এ কাজ ছাড়তে চাইলেও সমাজের চাপে ছাড়তে পারেনি। কাজ ছাড়তে চাইলে চণ্ডীর বিরুদ্ধে শুরু হয় গভীর ষড়যন্ত্র। একদিন সমাজের কয়েকজন চণ্ডীকে ঢেলা মারে। চন্ডী মলিন্দরকে কেঁদে বলেছে, "মোকে ওরা ঢেলা মেরে দিল গঙ্গাপুত্ত। বলল আমার নজর মন্দ।"[২] শুরু হয় চণ্ডীকে বাঁয়েন বানানোর কৌশল। সমাজের সুবিধাবাদী-ক্ষমতালোভী মানুষের সংকীর্ণতা এখানে স্পষ্ট। একটা নারীর অস্তিত্বের লড়াই এখান থেকেই শুরু হয়েছে।

চণ্ডীর ননদের মেয়ের মৃত্যুর পর চন্ডীকেই সবাই দায়ী করে প্রমাণ দিয়েছে "টুকনিকে মাটি দিবার কালে তোমার বুক হতে দুধ মাটিতে পড়ল কেন ?"[৩] মলিন্দরও নিজের স্ত্রী চন্ডীদাসীকে বাঁয়েন সন্দেহে সংসার থেকে বের করে দেয়। সমাজের কঠিন নিয়ম— শাসন ও শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবদ্ধ করে চন্ডীকে সমাজের এককোণে ফেলে দেওয়া হয়। একজন সাধারণ, সরল ডোম কুলবধূকে চক্রান্ত করে অন্ধকার জীবনের পথে একলা ছেড়ে দিয়েছে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা সমাজ। নারীর মর্যাদা সে পায়নি সমাজ-সংসার থেকে। স্বামী-সন্তানের ভালোবাসা থেকে আজীবন দূরে থেকেছে চন্ডী। মাতৃস্নেহের জন্য ভগীরথের মন ছটফট করলেও মায়ের ভালোবাসা সে পায়নি। অন্ধবিশ্বাসী সমাজ একজন নারীকে সমাজ, তার সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে প্রতিশোধের আশায়।

গল্পের শেষে দেখা যায় ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষদের বাঁচাতে বিবেকের তাগিদে চণ্ডী নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করেছে সে বাঁয়েন নয়, সেও রক্ত-মাংসে গড়া সজীব নারী। তারও মন-হৃদয় আছে। চন্ডী বাঁয়েনের জীবন বিসর্জন পুনরায় তাকে তার পূর্ব পরিচয় ফিরিয়ে দিয়েছে। রেল কোম্পানি মেডেল দিয়ে চণ্ডীকে সম্মান জানিয়েছে। তখন তার সমাজের লোকেরা বলেছে, 'আজ্ঞা আমাদেরি জ্ঞাতি'। এখানে গল্পটির চরমতম পর্যায় এবং নারী হিসেবে চন্ডীর জীবন সার্থক। যে সমাজ চক্রান্ত করে তাঁকে বাঁয়েনে পরিণত করেছে, সেই সমাজই একদিন তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সম্মানের সঙ্গে। গল্পটি যেমন সার্থক, তেমনি অপরদিকে ভিন্ন ভূমিকায় নারীর একটি দিক এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্তনদায়িনী : মহাশ্বেতা দেবী নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতাকে সর্বদা গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী তাঁর কাছে শুধু নারীই নয়, সে পরিপূর্ণ-সম্পূর্ণ একজন মানুষ। বিভিন্ন গল্পে মহাশ্বেতা ভিন্ন মূর্তিতে নারীর জীবনেতিহাস, জীবনযন্ত্রণা প্রতিবাদের কাহিনি তুলে ধরেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান তিনি চিত্রিত করেছেন। পুরুষ নিজের প্রয়োজনে আজীবন নারীকে ব্যবহার করেছে এবং প্রয়োজন ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। 'স্তনদায়িনী' (১৯৭৭ খ্রি.) গল্পে যশোদা নামের সহজ-সরল রমণীকে এমনিভাবে সমাজ, তার স্বামী ব্যবহার করে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এতে যশোদার কোন দোষ নেই, গল্পকার বলেছেন "মাতৃত্ব সে সইতে পারে, কি পারে না, সে হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখতে সময় পায়নি যশোদা। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশ্যনাল মাদার।"[৪]

'স্তনদায়িনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদাকে আমরা গল্পে পেয়েছি 'প্রফেশ্যনাল মাদার' বা 'দুধ মা' হিসেবে। যশোদার প্রধান দায়িত্ব ছিল হালদার বাড়ির নবজাতকদের নিজের দুধ দিয়ে মানুষ করা। একজায়গায় হালদার গিন্নি বলেছেন, "মা আমার ভগবান হইয়া আইছ! এরে দুধ দাও মা, পা ধরি।"[৫] যশোদা শরীরের অমৃত দিয়ে নিজের কুড়িজন এবং হালদারবাড়ির তিরিশজনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এ কাজের জন্য সমাজ তাকে 'কামধেনু', 'দেবী' বলে সম্মানও দিয়েছে। একজন নারী স্বামীর পঙ্গুত্ব থেকে সংসারকে বাঁচাতে নিজের জীবনকে ক্রমশ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সেই সময় স্বামী কাঙালিচরণও খুশিমনে মেনে নিয়েছে স্থির সিদ্ধান্ত "তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, ও জেনেই মা তোকে ধাইবেশে দেখা দিয়েছিল।"[৬] হালদার গিন্নি মারা যাওয়ার পরেই সমাজ-সংসারের আসল রূপ যশোদা বুঝতে পারে। হালদার বাড়ির বউমারা যশোদাকে অস্বীকার করে দুধ মা থেকে ঝিয়ের কাজে নিযুক্ত করেছে। তার নিজের সন্তানেরা যাদের সে জন্ম দিয়েছে তারাও মা'কে অগ্রাহ্য করেছে। অবশেষে দেখা গেছে সমাজের জন্য, সংসারের জন্য যশোদা নিজের সর্বস্ব খুইয়ে 'লাস্ট স্টেজ ব্রেস্ট ক্যান্সারে' আক্রান্ত হয়েছে।

আসল কথা, যশোদাকে সবাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। যখন রোগ ধরা পড়েছে তখন যশোদা মৃত্যুর মুখোমুখি। কিন্তু শেষে কাঙালি যশোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেছে 'সতীলক্ষ্মী বউ'। এখানেই যশোদার জয়। নীরবে-দুঃখে সব কিছু সারাজীবন সহ্য করেছে যশোদা। তাই শেষলগ্নে আত্মোপলব্ধি "যশোদার মনে হল সে তো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা একা মরতে পারে ? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে

সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধ-ছেলে।"[৭] শেষে দেখা যায়, এতগুলি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর পর এক বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে তাকে দাহ করা হয়। এই গল্পে শোষণের রূপ, স্বার্থপর-সুবিধাবাদী সমাজের নগ্ন রূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি নারীর মহিমা ও যন্ত্রণার কথাও উদ্ভাসিত হয়েছে। একজন নারী সর্বস্ব দিয়েও সমাজ-সংসার থেকে বিনিময়ে পেয়েছে শুধু অবমাননা। নারীর অবমাননার রূপটি যেমন এখানে স্পষ্ট, তেমনি যশোদার 'দুধ মা' হিসেবে সম্মানও প্রাপ্য। সে নিজের জীবন দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছে শুধু সংসার চালানোর স্বার্থে, কিন্তু সুবিধাবাদী সমাজ বিনিময়ে তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী সত্যিই এই গল্পে নারীকে বিচিত্ররূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্রৌপদী : মহাশ্বেতা দেবী চলমান শতাব্দীর একজন অগ্নিকন্যা। আর তাঁর 'দ্রৌপদী' (১৯৭৭ খ্রি.) গল্পে সেই ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। এখানে এক সাধারণ আদিবাসী রমণীর অসীম সাহসিকতার, শক্তির কথা বলা হয়েছে। গল্পের মূল কেন্দ্রিয় চরিত্র নারী, নাম-দ্রৌপদী মেঝেন। পুলিশের চোখে দ্রৌপদী 'মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে' এবং তাকে ধরতে পারলে পুরস্কার— দুশো টাকা। সে এবং তার স্বামী দুলন মাঝি "সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এঁরা মেইন।"[৮] আর এই সমস্ত কারণেই পুলিশের ভয়ে দ্রৌপদী স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসম এক সংগ্রামে লিপ্ত দ্রৌপদী। তার স্বামী দুলনকে গুলি করে হত্যা করেছে শাসকদল। আবার 'যুদ্ধের ফসল', 'জারজ' সোমাই ও বুধাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে দ্রৌপদী। ধরা পড়ার পরেই অসহায় মেয়েটির সঙ্গে শুরু হয় অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। কারণ, সেনানায়কের কঠোর নির্দেশ 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীড ফুল।' এ ধরণের অত্যাচারের পরে শুরু হয় আরও ভয়ানক— পাশবিক অত্যাচার "ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমতো বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন ? চার-পাঁচ-ছয়-সাত তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।"[৯]

মহাভারতে পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করেছিল দুঃশাসন, ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায়। আর এই গল্পে ধর্ষিত হয়েছে আদিবাসী রমণী দ্রৌপদী মেঝেন। শাসকদলের প্রতিনিধি কর্তৃক নির্মমভাবে ধর্ষিত হওয়ার পরেও আপন দৃঢ়তায় অটল থেকেছে সে। কত বিচিত্র ও সহ্যশীল এই রমণী! উলঙ্গ, ধর্ষিত দ্রৌপদী এরপরেও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেনানায়কের কাছে। এই অবস্থায় সেনানায়ক দ্রৌপদীকে নগ্ন দেখে ভয় পায়, "দ্রৌপদী দুই

মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১০] দ্রৌপদী তার উন্মুক্ত শরীরে আহ্বান জানিয়েছে শাসক দলকে। নারীর উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী স্বর দিয়েই গল্পের পরিসমাপ্তি। প্রতিবাদেই নির্মূল হয় শোষণ-অত্যাচার, আর দ্রৌপদী তা করে দেখিয়েছে। শাসকদলের সিংহাসন টলে গিয়েছে। নারীর নগ্নতাই হয়ে ওঠে প্রতিবাদ— প্রতিশোধের ভাষা। অর্থাৎ এই গল্পে মহাশ্বেতা দেবী দ্রৌপদীর মাধ্যমেই প্রতিশোধ চেয়েছেন। তাই প্রথম থেকে বিচিত্রভাবে এঁকেছেন চরিত্রটিকে। নারী শক্তি মহান, আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দ্রৌপদীর মাধ্যমে।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে প্রবন্ধটির দিকে আরেকবার ফিরে তাকানো যেতে পারে। আলোচ্য তিনটি গল্পে ('বাঁয়েন', 'স্তনদায়িনী', 'দ্রৌপদী') নারীই কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী চরিত্রগুলিকে দেখানোর প্রয়াস রয়েছে। নারীর প্রতি অবিচার সামাজিক ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। আমরা দেখেছি 'বাঁয়েন' গল্পের চন্ডী গঙ্গোদাসী সমাজের ষড়যন্ত্রে কুসংস্কারের কবলে পড়েছে। তারপরই গভীর চক্রান্ত করে তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। অবশেষে নিজের জীবন দিয়ে চন্ডী প্রমাণ করেছে সে বাঁয়েন নয়, সেও রক্ত-মাংসে গড়া মানবী। এখানে নারীর মহিমা আলাদা মাত্রা লাভ করেছে। 'স্তনদায়িনী' গল্পে যশোদা 'প্রফেশ্যনাল মাদার' থেকে কীভাবে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে তারই করুণ কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চাশটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে কেউ তাকে সাহায্য করতে আসেনি। সুবিধাবাদী সমাজের সংকীর্ণতা এই গল্পে স্পষ্ট। অন্যদিকে যশোদা সত্যিই বিচিত্র নারী। নিজের জীবনরস ক্ষয় করে পঞ্চাশজন সন্তানের মুখে অমৃত তুলে দিয়ে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে। মহাশ্বেতার এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। 'দ্রৌপদী' গল্পের মধ্যে নারীর বঞ্চনা-লাঞ্ছনার পরিচয় পেয়েছি। সমাজ নিশ্চুপ থাকলেও পৈশাচিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে ধর্ষিতা নারী নিজেই। প্রকাশ্যে ধর্ষিতা হওয়ার পরেও শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দ্রৌপদী মেঝেন। এখানে নারী প্রতিবাদী। অর্থাৎ তিনটি গল্পে মহাশ্বেতা দেবী নারীকে বিচিত্রভাবে অঙ্কন করেছেন। কোথাও প্রফেশ্যনাল মাদার, কোথাও বা কুসংস্কারের বলি, আবার কোথাও বা নারী প্রতিবাদী।

মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি সত্যিই অনবদ্য। গল্পমধ্যে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা না পেলেও নিজ ঔজ্জ্বল্যে প্রত্যেকেই ভাস্বর। 'বাঁয়েন', 'স্তনদায়িনী' এবং 'দ্রৌপদী' গল্পের নারীরা আদর্শে আত্মজিজ্ঞাসায়, সংগ্রামে-মাতৃত্বে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। দ্রৌপদী ছাড়া প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে তারা সামিল না হলেও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সকলেই সংগ্রামী নারী। ফেলে আসা ইতিহাসে তারা অপাঙক্তেয় থাকলেও সাহিত্যের পাতায় তারা চির অম্লান। গল্পগুলির সার্বিক বিচারে বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবী গল্পগুলিতে নারীকে ভিন্ন ভূমিকায়, বিচিত্র

মূর্তিতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পই হয়ে উঠেছে নারী জাতির ঐতিহাসিক দলিল। সাহিত্যচর্চায় অন্ত্যজ শ্রেণি বেশি করে স্থান পেলেও বিচিত্র চরিত্রের নারী সমান্তরালভাবে জায়গা করে নিয়েছে মহাশ্বেতার গল্পে। এখানেই তাঁর আসল কৃতিত্ব।

আকর গ্রন্থ

১. মহাশ্বেতা দেবী : শ্রেষ্ঠ গল্প, গ্রন্থনা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০

তথ্যসূত্র

১. মহাশ্বেতা দেবী : শ্রেষ্ঠ গল্প, গ্রন্থনা- অজয় গুপ্ত, 'বাঁয়েন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৩৩
২. তদেব, পৃ. ৩৮
৩. তদেব, পৃ. ৪০
৪. মহাশ্বেতা দেবী : শ্রেষ্ঠ গল্প, গ্রন্থনা- অজয় গুপ্ত, 'স্তনদায়িনী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৮১
৫. তদেব, পৃ. ৮৬
৬. তদেব, পৃ. ৮৭
৭. তদেব, পৃ. ১০০
৮. মহাশ্বেতা দেবী : শ্রেষ্ঠ গল্প, গ্রন্থনা- অজয় গুপ্ত, 'দ্রৌপদী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৬১
৯. তদেব, পৃ. ৭০
১০. তদেব, পৃ. ৭১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নির্মল ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ১৯৯৮
২. অমর দে (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, গল্পসরণি, ২০১১-২০১২
৩. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, সমকালের জিয়ন কাঠি, জানুয়ারি-জুন : ২০১৫
৪. দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, তবু একলব্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

বনফুলের ছোটগল্প : ভাষাচিন্তা ও ভাষা পরিচয়

ড . স্বরূপ দে

বিশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার হলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯ খ্রি.)। বনফুল তাঁর ছদ্মনাম। এই নামেই তিনি পাঠক সমাজে পরিচিত। বাংলা সাহিত্য যখন চিরযৌবনরত, বিখ্যাত খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা যখন পরিপুষ্টতা দিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনকে, বিভিন্ন চিন্তাভাবনার সরসতা ও বৈচিত্র্য যখন আকৃষ্ট করছে পাঠক-হৃদয়কে, ঠিক সেই সময় নবাগত শিল্পী হিসেবে বনফুলের আবির্ভাব। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ খ্রি.-১৯৪১ খ্রি.) যখন বাংলা সাহিত্যের মধ্য-গগনে অবস্থান করে, ছোটগল্পের পরিচর্যা ও বিকাশ করছেন, সেই সময় এক ব্যতিক্রমী স্রষ্টা হিসেবে আটপৌরে মানবজীবন সাধনাকে সাহিত্যে তথা ছোটগল্পে হাজির করলেন বনফুল। জীবন সাধনাকে জীবন সত্যে পরিণত করলেন তিনি। জীবনের সামগ্রিকতা নয়, খণ্ড জীবনের চিত্রকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন ছোটগল্পে। এ যেন ব্যক্তির গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য পেরিয়ে আসা কয়েকটি প্ল্যাটফর্মের চিত্র। কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র জীবন সেখানে রয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্যাস রসকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে ঠাঁই দিয়েছেন। ক্ষুধাতুর মানুষের কান্না ও হাহাকার, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম, সাধারণ ঘরের দাম্পত্য জীবনের চিত্র সবই যেন ছবির মতো উঠে এসেছে। ক্ষেত্র গুপ্ত বলছেন:

> "বিহারীবাসী দেহাতি জীবনের বহু বিচিত্র রূপ, অজস্র চরিত্র, সামাজিক পরিস্থিতি, ঘটনার চমৎকারিত্ব ধরে রেখেছেন। সর্বদাই নতুন থেকে নতুন প্রসঙ্গে তাঁর কৌতূহলী মনের পরিক্রমা, জীবনের এক একটি পাতা উল্টে চলেছেন।"[১]

বনফুল জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, জীবনের তরঙ্গলীলাকে অনুভব করেছেন হৃদয়-জিজ্ঞাসা দিয়ে। তাই জীবনের সুন্দর ও অসুন্দর, জীবনের সত্য ও মিথ্যা, জীবনের

স্বপ্ন আর বাস্তবকে গভীর অন্বেষণে ব্যক্ত করেছেন তিনি। তিনি নিজেই বলেছেন, "এই সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমুদ্র মন্থনে মানুষের জীবনে সুধা আর বিষ দুই-ই ওঠে। জীবনদ্রষ্টা কবি এই সুধা আর বিষ নিয়েই কাব্যের নৈবেদ্য রচনা করেন।"[২] আসলে বনফুল ছিলেন মানুষের কবি, মানুষের কাছের লোক। তিনি ছিলেন সত্য-শিব-সুন্দরের সাধক। যে সাধনায় সংযম ছিল অটুট। কোথাও ভাবাবেগ কিংবা কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা আক্রান্ত নয়। উচ্ছ্বাসবাহুল্যে কখনই খেই হারিয়ে যায়নি মানুষের জীবন ও জীবন দ্বৈরথ। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :"আবেগবিহ্বলতা কোথাও নেই, ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসবাহুল্য অত্যন্ত সংযমিত। অথচ লেখকের অন্তর-সঞ্চারী মানবিকতা সর্বদা সজাগ।"[৩]

বনফুল মূলত চারটি শাখায় নিজেকে মেলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যে। যথা— ১) কবিতা, ২) নাটক, ৩) উপন্যাস, ৪) ছোটোগল্প। তবে কথাসাহিত্য, বিশেষ করে ছোটগল্প রচনাতেই তাঁর সম্যক খ্যাতি। সমালোচক বলেন : "নাটক-কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু উপন্যাস ও গল্প লেখায়ই তাঁর সম্যক-প্রতিষ্ঠা।"[৪] এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য : "কবিতা, নাটক, ছোটগল্প সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তিনি অবলীলাক্রমে বিহার করেছেন।"[৫]

বনফুল ছোটগল্পে রাজাধিরাজ। তিনি ছিলেন পাঠকচিত্ত চমৎকারী লোককান্ত শিল্পী। বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘ ষাট্ বছর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বিচরণ করেছেন। সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনকে। রচনা করেছেন একাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্প। 'তৃণখণ্ড' (১৯৩৫ খ্রি.), 'দ্বৈরথ' (১৯৩৭ খ্রি.), 'জঙ্গম' (১৯৪৩ খ্রি.-১৯৪৫ খ্রি.), 'ডানা' (১৯৪৮ খ্রি.-১৯৫৫ খ্রি.), 'স্থাবর' (১৯৫১ খ্রি.) এর মতো উপন্যাস যেমন তিনি রচনা করেছেন, তেমনি ছোটগল্পের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। পাঁচ'শ-র অধিক ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি ব্যাপৃত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। সমালোচক বলেন, "ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বনফুলের এই আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে সার্থক ও সহজ হয়ে উঠেছে। এখানেই তাঁর জীবনদর্শন সম্যক স্ফূর্তি পেয়েছে।"[৬] জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা অবলীলাক্রমে উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। অল্পকথায় জীবনের চরম সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন সাহিত্যের এই শাখায়। অপরিসীম প্রাণশক্তি ও চরম সংযম ছোটগল্পগুলির প্রাণ। তাই সমালোচকের কথায়, বাংলা সাহিত্যে বনফুলকে 'বড়ো' করেছে তাঁর এই ছোটগল্প।বহু বিচিত্র রঙে ও বর্ণে বনফুল সাজিয়ে তুলেছেন ছোটগল্পের ভাষা ও শৈলীকে। তাই এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

> "সৃষ্টি প্রেরণা ও সৃষ্টিধর্ম যেখানে অপৃথগযত্নসম্ভূত সেখানেই বাণী প্রকাশ চরমোৎকর্ষ লাভ করে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টাও সেখানে স্বয়ংপ্রকাশ। ছোটগল্পের

ক্ষেত্রেই বনফুলের এই আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে সার্থক ও সহজ হয়ে উঠেছে।"[৭]

'পাখি' গল্প দিয়ে বনফুলের ছোটগল্পের সূচনা। গল্পটি প্রকাশ পায় ১৯২২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, 'প্রবাসী' পত্রিকায়। এরপর একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প সৃষ্টি করেন বনফুল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১) অজান্তে, ২) মানুষের মন,
৩) বুধনী, ৪) সমাধান,
৫) ক্যানভাসার, ৬) তিলোত্তমা,
৭) তাজমহল, ৮) বিদ্যাসাগর।

এছাড়াও 'অদ্বিতীয়া', 'ঐরাবত', 'দুধের দাম', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'ছাত্র', 'নিমগাছ', 'নদী', 'দূর্বা', 'যুগান্তর', 'পরিবর্তন', 'অধরা', 'একফোঁটা', 'দর্জি', 'নাম', 'নাথুনির মা' ইত্যাদি বনফুলের ছোটোগল্পের গুরুত্বপূর্ণ সম্ভার।

এইসব ছোটগল্পগুলি বিভিন্ন গল্প সংকলনগ্রন্থে আবদ্ধ তথা সংযুক্ত করেছেন বনফুল। ড. সরোজ মোহন মিত্র তাঁর 'বনফুল : সাহিত্য ও জীবন' গ্রন্থে, ছোটগল্প সংকলনগ্রন্থের সারণী তুলে ধরেছেন। নিম্নে বনফুলের উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন গ্রন্থগুলির নাম তুলে ধরা হল :

১) ঊর্মিমালা (১৯৫৬ খ্রি.), ২) অনুগামিনী (১৯৫৮ খ্রি.),
৩) সপ্তমী (১৯৬০ খ্রি.), ৪) দূরবীন (১৯৬১ খ্রি.),
৫) মণিহারী (১৯৬৩ খ্রি.), ৬) এক ঝাঁক খঞ্জন (১৯৬৭ খ্রি.),
৭) বনফুলের নতুন গল্প (১৯৭৬ খ্রি.), ৮) বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৭৮ খ্রি.)

এছাড়াও 'করবী' (১৯৫৮ খ্রি.), 'ছিটমহল' (১৯৬৫ খ্রি.), 'মায়াকানন', 'রাজা' (১৯৭৪ খ্রি.), 'বহুবর্ণ' (১৯৭৬ খ্রি.), 'বনফুলের হাসির লেখা' (১৯৭৮ খ্রি.), 'বনফুলের শেষ লেখা' (১৯৭৯ খ্রি.), 'বনফুলের কিশোর সমগ্র' (১৯৮৩ খ্রি.) ইত্যাদি বনফুলের গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ।[৮] এইসব ছোটগল্পগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পায়। যথা, 'মালঞ্চ', 'পরিচারিকা', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'বিজলী', 'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার' ইত্যাদি।

বনফুল তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে অনন্যসাধারণ ভাষা সৃষ্টি ও প্রয়োগ করেছেন। যা তাঁর সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতার সারৎসারকে বহন করে। সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে তিনি ছোটগল্পের গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাব ও গভীরতাকে ব্যক্ত করেছেন যা নিটোল

সমৃদ্ধিতে ভরপুর। আসলে মনের চিন্তনশীল ভাব-ভাবনা সাহিত্যের মাধ্যমে বাণীরূপ লাভ করে। তবে মনের অভ্যন্তরের অন্তর্নির্যাস,সাহিত্যে প্রকাশের মাধ্যম হয় ভাষা। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমেই লেখক অন্তর্নিহিত মনন, চিন্তন, অনুভূতিকে বাইরে প্রকাশ করেন। তাই হুমবোল্টের ভাষায়, ''Thre Sprache its ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache.''[৯] অর্থাৎ মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা, আর তার আত্মাই হল তার ভাষা। আবার সাহিত্য সমাজের সঙ্গে, পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ভাষাকেও হতে হয় জীবন সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে W. H. Hudson-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ''A great book grows directly out of life; in reading it, we are brought into large, close and fresh relation with life; and in that fact lies the final explanation of its power. Literature is a vital record of what man have seen in life. It is thus fundamentally an expression of life through the mudium of language.''[১০]

রবীন্দ্রনাথ ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন, ''সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।''[১১] অর্থাৎ সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক শিল্প। গল্পকার বনফুলও সাহিত্যকে তুলে ধরেছেন এক আর্ট বা শিল্পকলা হিসেবে, যার প্রকাশমাধ্যম হিসেবে সহজ সরল প্রাণবন্ত ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। তাই এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ''Literature is an art form, like painting, sculpture, music, drama, and the dance. Literature is distinguished from art forms by the media in which it works : Language.''[১২]

বনফুলের ছোটগল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যের এক অদ্ভুত সমন্বয়। যেখানে একদিকে রূপকথার আবহ রয়েছে। অপরদিকে রয়েছে ছোট ছোট জীবনে গভীরতম চিত্রকল্প। কখনো প্রেম, কখনো রোমান্টিকতা আবার কখনো বা পরিহাস,ট্র্যাজেডি, নিষ্ঠুরতা, সংগ্রাম, সংকট প্রভৃতি উঠে এসেছে ছোটগল্পের আঙ্গিকে। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা, পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা, বিষয় অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগও হয়েছে যথাযথ ও সার্থক। তাই মোহিতলাল মজুমদার ২৫ নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে এক চিঠিতে বনফুলকে লিখেছিলেন :

> ''একটি নতুন form আপনি আয়ত্ব করিয়াছেন— রীতিমত গল্প নয়, নক্সা snap-shot ও নয়— এ একরকম অতি ছোটগল্প। এবং এই সংগ্রহের অধিকাংশই এক সুসম্পূর্ণ রস— কলেবর পাইয়াছে যে আমার মনে হয় ইহা আপনার একটি খুব নূতন কীর্তি বলিয়াই ঘোষিত হইবে।''[১৩]

অতি অল্পকথায় বৃহৎ বিষয়ের বর্ণনা বনফুলের ছোটগল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অনেকে একে অনুগল্পও বলে থাকেন। এই বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষা বৈচিত্র্যই বনফুলকে বাংলা ছোটগল্পে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এনে দিয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বনফুল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প রচনা করেছেন। প্রত্যেকটিই ভিন্ন বৈচিত্র্যযুক্ত। এর মধ্য থেকেই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প বেছে নিয়ে তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছি। বনফুলের যে ছোটগল্পগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলি হল—

১) বুধনী, ২) ক্যানভাসার,

৩) নাথুনির মা, ৪) নিমগাছ,

৫) তাজমহল, ৬) ছাত্র

উপরিউক্ত ছোটগল্পগুলির বিষয়বৈচিত্র্য একটি অপরটির থেকে আলাদা। প্রত্যকটি গল্পেই নিজ নিজ ভাষাবৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তা রয়েছে। 'বুধনী' গল্পটি শুরু হয়েছে হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশে। দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সু-সম্পন্ন হয়েছে গল্পটি। একদিকে প্রেমিক বিল্টু, অপরদিকে তাঁর স্ত্রী বুধনী। ছটি পরিচ্ছেদে সমন্বয়িত হয়েছে গল্পটি। গল্পে পাই বিল্টু, অসীম সাহসিকতায় নিকষ, কৃষ্ণাঙ্গী বুধনীকে জয় করেছিল। অনেক ভালোবাসতো সে বুধনীকে। কিন্তু যখন বুধনীর কোল আলো করে এক সন্তান জন্ম নিলো, তখন মাতৃত্ব মোহে, আবেগে বুধনীর বিল্টুর প্রতি ভালোবাসা অনেকটাই কমে গেলো। তখন সেটা সহ্য করতে পারলো না বিল্টু। হত্যা করলো নিজ সন্তানকে। ফাঁসির আদেশ হল বিল্টুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ফাঁসীর সময়ও সে সন্তানের জন্য একটুও অনুতপ্ত না হয়ে বুধনী, বুধনী বলে চিৎকার করলো। এখানে বনফুল বিল্টু নামক চরিত্রের মাধ্যমে প্রেম, ভালোবাসার চিত্রকে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। স্ত্রী বুধনীর প্রতি বিল্টুর প্রেম স্ব-মহিমায় চিত্রিত।

অন্যদিকে 'ক্যানভাসার' গল্পে ভৈরব ও কাত্যায়নীর মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। তারই সঙ্গে ক্যানভাসার হিসেবে হীরালালের প্রবেশ ঘটেছে গল্পে। যে হীরালাল মাজন বিক্রি করতে এসেছে গ্রামে। বুড়ো বয়সে তাঁর ছেলেটি মারা যাওয়ায় তাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ক্যানভাসারের কাজটি করতে হচ্ছে। গল্প মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রকট হয়েছে। শেষে হীরালালের সঙ্গে ভৈরব চরিত্রের হৃদয়ের মিলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন বনফুল। গল্পটিতে মধ্যবিত্ত জীবন সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। 'নাথুনির মা' গল্পে উঠে এসেছে হাস্যরসিকতা, প্রহসনধর্মীতা। গল্পটি চারটি চরিত্রের সমন্বয়ে রচিত। নাথুনি, নাথুনির মা, নাথুনির স্ত্রী ও ডাক্তারবাবু চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলেছে। সাধারণ সংসারে

শাশুড়ি ও বউ-এর জীবনচিত্র গল্পমধ্যে উল্লিখিত। শাশুড়ির বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে বউকে গালমন্দ করতে ছাড়ে না। এমনকি ডাক্তারের চিকিৎসা পাওয়ার পরেই আবার বউকে 'পোড়ার-মুখী' বলে সম্বোধন করেছে। এই গল্পে বনফুল সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

'তাজমহল' বনফুলের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। এই গল্পে তিনটি চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। যথাক্রমে, ফকির শাজাহান, তাঁর বেগম ও ডাক্তারবাবু। ফকির শাজাহান তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তাঁর স্ত্রীর 'ক্যাংক্রাম অরিস' রোগ হয়েছে। তার মুখের আধখানা অংশ পচে গেছে। আসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে তার সেবা যত্ন করে চলেছে। এই গল্পে একজন স্বামী, তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার খেলাঘর নির্মাণ করেছেন। সম্রাট শাজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজের জন্য তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন, আর গল্পমধ্যে ফকির শাজাহান তাঁর স্ত্রীর জন্য নিজেই ইঁট, কাদা দিয়ে কবর নির্মাণ করেছেন। অপরদিকে 'ছাত্র' গল্পে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। যেখানে ছাত্র, শিক্ষকের ভয়ে জোড়সোড়। গল্পমধ্যে স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে। যেখানে শিক্ষক ক্লান্ত হয়ে ছাত্রের কাছে পিপাসা নিবারণ করেছে। গল্পশেষে স্বপ্নভঙ্গে বাস্তবতা এসেছে। ছাত্রটি বিশ বছর আগে মারা যাওয়া সেই মাস্টারমশাইয়ের তর্পণের জন্য গঙ্গা অভিমুখে চলেছে।

বনফুলের ছোটগল্পের সারণীতে 'নিমগাছ' অন্যতম। গল্পে নিমগাছের বিভিন্ন উপকারিতার কথা ব্যক্ত করেছেন গল্পকার। শেষে সংসারের করুণ, অসহায় গৃহবধূর সঙ্গে নিমগাছকে মিলিয়ে দিয়েছেন। যা সত্যই চমকপ্রদ। বনফুলের উপরিউক্ত প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই ভিন্নতা তথা ভিন্ন স্বাদ রয়েছে।

বনফুল উপরিউক্ত ছোটগল্পগুলিতে যেমন রসের আস্বাদন ঘটিয়েছেন, তেমনি ভাষা বৈচিত্র্যকেও নতুনত্ব দিয়েছেন। কোথাও সমাসবদ্ধ, সন্ধিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার আবার কোথাও বা আলংকারিক শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে অভিনবত্ব ঘটিয়েছেন। একদিকে সাধুভাষা, অপরদিকে চলতি প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করে বাংলা ছোটগল্পের নতুন দিশা নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পে রয়েছে। বনফুলের ছোটগল্পে ভাষার যেসব দিকের পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপে ব্যক্ত করা হল :

১. সাধুভাষার ব্যবহার,
২. সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহার,
৩. হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ,
৪. বিরাম চিহ্নের ব্যবহার (কমা, সেমিকোলন, ছেদ, হাইফেন, ড্যাশ ইত্যাদি),

৫. উদ্ধৃতি চিহ্ন ও ডটের প্রয়োগ,

৬. Parenthesis-এর ব্যবহার,

৭. প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক বাক্যের প্রয়োগ,

৮. সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোজন,

৯. ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দের ব্যবহার,

১০. ইংরেজি ও দেশি শব্দের প্রয়োগ,

১১. সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য,

১২. প্রবাদ বাক্য ও আলংকারিক শব্দের রূপবৈচিত্র্য,

১৩. রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োগ (প্রত্যয়, বিভক্তি)।

বনফুল তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধু গদ্যভাষা। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র-এর উত্তরসূরী হিসেবে ছোটগল্পে তিনি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। সাধু গদ্যভাষার প্রয়োগে বনফুল অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আটপৌরে, সহজ সরল সাধু গদ্যে অনবদ্যভাবে ব্যক্ত করেছেন ছোটগল্পগুলি। নিম্নে বিভিন্ন গল্পে তার নিদর্শন তুলে ধরা হল।—

ক) "আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে।" (দ্র. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : বুধনী, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা. ৩৭)

খ) "কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।" (দ্র. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : ক্যানভাসার, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা. ৫৩)

গ) "সকালে চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতে ছিল না।" (দ্র. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : নাথুনির মা, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা. ১২৪)

ঘ) "কাটফাটা রোদ, চতুর্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে।" (দ্র. মুখোপাধ্যায় বলাইচাঁদ : ছাত্র, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা. ১৫৯)

বনফুল তাঁর ছোটগল্পে যে শুধু সাধু গদ্যই ব্যবহার করেছেন তাই নয়, চলিত গদ্যেরও ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন গল্পে। এদিক থেকে তিনি প্যারীচাঁর মিত্র, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী। গল্পে চলিত গদ্যের নিদর্শন তুলে ধরা হল—

ক) "একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল" (দ্র. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : তাজমহল, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা. ১৫৮)

খ) "নিমগাছটার ইচ্ছে করলো লোকটার সঙ্গে চলে যায়।" (দ্র. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ:নিমগাছ, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

বনফুল সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন— হল > হইলে, চলবে > চলিবে, বেড়াতে > বেড়াইতে, করেছিল > করিয়াছিল, হত > হইত, যাচ্ছে > যাইতেছে, পড়ে > পড়িয়া, বলে > বলিয়া ইত্যাদি। আবার চলিত গদ্যের ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপও লক্ষ্য করা যায়। যথা—

ক) লাগাইবে > লাগবে (দ্র. নিমগাছ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

খ) ভাঙিলে > ভাঙলে (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

গ) দাঁড়াইয়া > দাঁড়িয়ে (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

ঘ) বাড়াইলাম > বাড়ালাম (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭)

ঙ) দেখিতে > দেখতে (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭)

সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বনফুলের ছোটোগল্পে। যা ভাষাকে দৃঢ়, মসৃণ ও চমকপ্রদ করে তুলেছে। ছোটোগল্পের প্রয়োজন অনুসারে তিনি এইসব ধরণের বাক্য প্রয়োগ করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বাক্যের নিদর্শন তুলে ধরা হল:

ক) "বিল্টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম।" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৯)

খ) "সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই।" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪)

গ) "যদিও সে গ্রামের মালিক নহে, কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে।" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪)

ঘ) "জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন প্রদীপের তৈল নিঃশ্বেস হইয়াছে।" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭)

ঙ) "বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে।" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩)

উপরিউক্ত নিদর্শনে 'ক' ও 'খ' সরল বাক্যের উদাহরণ। 'গ' ও 'ঘ' জটিল বাক্যের উদাহরণ, কেননা 'গ' নিদর্শনে 'যদি' ও 'কিন্তু' শব্দের ব্যবহার আছে, আর 'ঘ' নিদর্শনে 'যদি' ও 'তাহা' শব্দের মাধ্যমে বাক্য দীর্ঘায়িত হয়েছে। 'ঙ' নিদর্শনটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ। এতে 'এবং' শব্দের মাধ্যমে দুটি বাক্যকে যুক্ত করা হয়েছে।

সরল, জটিল, যৌগিক বাক্যের মতো হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহারও বনফুলের ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য বাক্য বৈশিষ্ট্য। হ্রস্ব বাক্যের নিদর্শন :

ক) "কাল তাহার ফাঁসি।" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭)

খ) "ভালো কলপও আমি রাখি।" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৬)

গ) "তাহার শহরে যাইবার কথা।" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৬)

দীর্ঘ বাক্যের নিদর্শন :

ক) "বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একটি আধ-ঘোমটা-দেওয়া কম বয়সী মেয়ে একটি বুড়িকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।" (দ্র. নাথুনির মা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৪)

খ) "বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি।" (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৮)

বিরাম চিহ্নের প্রচুর ব্যবহার বনফুলের ছোটগল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিরাম চিহ্ন হিসেবে তিনি কমা, সেমিকোলন, ছেদ, ছোট হাইফেন, ড্যাশ ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। যেগুলি বাক্য তথা ভাষার সৌন্দর্যকে রক্ষা করেছে। তারই সঙ্গে বাক্যের মধ্যে শব্দ পরম্পরার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেছে। যার মাধ্যমে উপবাক্যের সংযোগ ঘটবে ছোটোগল্পে পাওয়া বিভিন্ন বিরাম চিহ্নের নিদর্শন তুলে ধরা হল :

ক) "ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম ঝুড়ির ভেতরে, মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি।" (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭)

খ) "কাঠফাদা রোদ, চতুর্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে।" (দ্র. ছাত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯)

গ) "একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বাঃ—" (দ্র. নিমগাছ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

ঘ) "ওসব মাজন-ফাজন বুজরুকি এখানে চলিবে না—" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪)

ঙ) "কারণ বিল্টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পুরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে।" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭)

উপরিউক্ত প্রথম উদাহরণটিতে কমা (,) ব্যবহার রয়েছে, দ্বিতীয় উদাহরণটিতে কমা (,) ও হাইফেন (-) এর ব্যবহার, তৃতীয় উদাহরণটিতে ড্যাশ (–) চিহ্নের ব্যবহার, চতুর্থ

উদাহরণটিতে হাইফেন (-) ও ড্যাশ (—) চিহ্নের ব্যবহার ও পঞ্চম উদাহরণটিতে হাইফেন (-), কমা (,) এর ব্যবহার রয়েছে। এই সকল বিরাম চিহ্ন যেমন বাক্যের উপবাক্য সংযোগে[১৪] সাহায্য করেছে, তেমনি বাক্যকে সুন্দর, চাকচিক্যময় করে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর প্রতি উদাহরণেই ছেদ (।) এর ব্যবহার দেখা যায়। এটিও একটি বিরাম চিহ্ন। যা গদ্য সাহিত্যের একটি মূল বিরামচিহ্ন।

কমা, হাইফেন, ড্যাশ, ছেদ-এর পাশাপাশি উদ্ধৃতি চিহ্ন ও ডট (...) এর ব্যবহারও বনফুলের ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়। এই দুটিও একপ্রকার বিরাম চিহ্ন। 'বুধনী' গল্পে বিল্টু যখন আবেগে মিনতিভরা কণ্ঠে বুধনীকে ডাকে :

"বুধনী— বুধনী— বুধনী— বুধনী— বুধনী!" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭)

এখানে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার 'ক্যানভাসার' গল্পে যখন হীরালাল ভৈরবকে মাজন কেনার কথা বলে তখন ভৈরব বলে, "কচু", (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা.৫৪)। এখানে বনফুল ভৈরবের কথায় উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার ঘটিয়েছেন। এছাড়াও 'ডট' (...) চিহ্নের ব্যবহারও বনফুলের ছোটগল্পে লক্ষণীয় :

ক) "বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলি...কি রূপ!" (দ্র. নিমগাছ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

খ) "এমনি কাঁচাই..." (দ্র. নিমগাছ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

গ) "...আলমগীর নির্মম ছিলেন না।" (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)

উপরিউক্ত ডট (...) চিহ্নের প্রয়োগ একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ভাষার দিকও বলা চলে। বনফুল ছোটগল্পে এই ডটের প্রয়োগ করে বক্তব্যকে আরো মর্মস্পর্শী ও প্রাণবন্ত করেছেন।

Parenthesis বা প্রথম বন্ধনীর ব্যবহার বনফুলের ছোটগল্পে আখছার লক্ষ্য করা যায়। বক্তব্যকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য বনফুল-এর ব্যবহার করেছেন। যেমন 'নাথুনির মা' গল্পে এর নিদর্শন পাই :

ক) "লক্ জ (Lock Jaw) তাহাকে বলে যাহা হইলে ব্যায়ত আনন আর বন্ধ হয় না।"

খ) "ইহার ঠিক ডাক্তারি নাম ডিসলোকেশন অব্ ম্যাণ্ডিবল্ (Dislocation of Mandible)"

এছাড়া নাথুনির স্ত্রী যখন শাশুড়ির এমনটা কীভাবে হল ডাক্তারের কাছে বলে, তখন সে জানায়, "(বুড়ির পক্ষে কথা বলা অসম্ভব)— না হাই তুলতে নয়।" এখানেই Paren-

thesis-এর ব্যবহার ঘটিয়েছেন লেখক বনফুল। এর ফলে বক্তব্য হয়েছে আরো পরিস্ফুট, স্বচ্ছ। যা ছোটগল্পকে গতি দিয়েছে।

বিভিন্ন ধরণের বাক্য বনফুল তার ছোটগল্পে প্রয়োগ করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক বাক্যের ব্যবহার। যা গল্পের ভাব ও আবেগকে অতিমাত্রায় পাঠক হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছে। যেমন 'তাজমহল' গল্পে শাজাহান, যখন ডাক্তারকে তার নিজের পরিচয় দিতে থাকে, তখন ডাক্তার প্রশ্নসূচক বাক্যে বলে, "দেখিনি তো কখনো তোমাকে। কি নাম তোমার ?" (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৮)। এছাড়াও শাজাহান যখন ডাক্তারকে বলে, "এর বাঁচবার কি কোন আশা আছে হুজুর ?" (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৮) তখনও প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার ঘটেছে।

বিস্ময়বোধক বাক্যেরও ব্যবহার ঘটেছে বনফুলের ছোটগল্পে। যেমন—

ক) "বিল্টু দেখিল— এ কি! বুধনীকে দখল করিয়া বসিয়া আছে একটি শিশু!" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৮)

খ) "আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন!" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৫)

গল্পমধ্যে এই সকল বিস্ময়সূচক বাক্যের ব্যবহার গল্পের আবেগকে পাঠক হৃদয়ে সমাহিত করেছে। এটিও বনফুলের ছোটগল্পের একটি ভাষাগত প্রয়োগের লক্ষণ।

একাধিক সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় বনফুলের ছোটগল্পে। এইসব সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দ কখনই গল্পগুলিকে আড়ষ্ট করে তুলেনি, বরং গল্পের মান বৃদ্ধি করেছে। 'বুধনী', 'ক্যানভাসার', 'তাজমহল', 'ছাত্র' প্রভৃতি সূত্রে একাধিক সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দ পাওয়া যায়। সন্ধিবদ্ধ শব্দ যেমন— 'সূর্যাস্ত', 'অন্তর্বিপ্লব', 'বন্দুক', 'চতুর্দিক', 'কোত্থেকে', 'নয়নাভিরাম', 'আশ্চর্য' ইত্যাদি। সমাসবদ্ধ শব্দ যেমন— 'ক্যানভাসার', 'অপছন্দ', 'পাড়াগাঁয়ে', 'পাণিপ্রার্থী', 'অর্ধনগ্ন', 'মানবশিশু' ইত্যাদি।

ভাষার একটি ব্যাকরণগত দিক হল ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকার শব্দ। বনফুলের ছোটগল্পে এই ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দের প্রয়োগ খুব লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দগুলি গল্পে শাব্দিক সুসংঙ্গতি ঘটাতে সহায়তা করেছে। সর্বোপরি বাক্যের ধ্বনিঝংকার গড়ে ওঠেছে ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাধ্যমে। 'বুধনী', 'ক্যানভাসার', 'তাজমহল', 'নিথুনির মা' প্রভৃতি গল্পে এই সকল শব্দের ব্যবহার করেছেন লেখক। নিম্নে বিভিন্ন গল্পে প্রাপ্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিদর্শন তুলে ধরা হল :

ক) টকটকে (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৮)

খ) হনহন, মাজন-ফাজন, কুচকুচে (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩-৫৫)

গ) গড়গড়া, ঝাঁ-ঝাঁ (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭-১৫৮)

ঘ) ঢকঢক (দ্র. ছাত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯)

ঙ) কড়কড় (দ্র. নিমগাছ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৪)

বনফুল তাঁর গল্পে একাধিক ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন— 'কনট্রাকটর', 'হোটেলওলা', 'পাইপ', 'সিগারেট', 'আউটডোর', 'ক্যাংক্রাম অরিস', 'ইনডোর', 'কল' (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭-১৫৮), 'হোম-টাস্ক', 'থার্ড মাস্টার', 'স্কুল' (দ্র. ছাত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯), 'ক্যানভাসার', 'ওভারক্যারেড', 'বিজনেস', 'ট্রেন' (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪) ইত্যাদি। বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বনফুলের গল্পে। 'Fixity of purpose', 'Distocation of Mandible', 'নাইট ডিউটি'র মতো শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে ছোটগল্পে। এছাড়াও দেশি শব্দকেও গুরুত্ব দিয়েছেন বনফুল। যেমন গল্পে পাই— 'পোড়ারমুখী', 'ঝুড়ি', 'কচু', 'টোঙা' ইত্যাদি।

বিভিন্ন অব্যয়পদের ব্যবহার বনফুলের ছোটগল্পে পাওয়া যায়। যেমন— 'এবং', 'কিন্তু', 'সুতরাং', 'অতএব', 'আর' ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলি বাক্যের সংযোজক হিসেবে কাজ করে। শুধু তাই নয় বাক্যগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে নিদর্শন তুলে ধরা হল :

১. "আর একটা কবরও ছিল...হয়তো এখনও আছে।" (দ্র. তাজমহল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭)

২. "সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছে।" (দ্র. ছাত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯)

৩. "সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত।" (দ্র. বুধনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৮)

৪. "কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কান্ড ঘটিল।" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৫)

উপরিউক্ত উদাহরণে (১) আর, (২) সুতরাং, (৩) এবং, (৪) কিন্তু ইত্যাদি অব্যয় বাক্যগনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাক্যের বৈচিত্র্যসাধনও ঘটেছে এর মাধ্যমে।

চলিত প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগও ছোটগল্প ঘটিয়েছেন বনফুল। তবে তা নিতান্তই কম। এই সমস্ত প্রবাদ বাক্য গল্পের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তুকে আরো বৈচিত্র্যময় করেছে। 'ক্যানভাসার' গল্পে পাই—

১. "যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে, তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন।" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩)

২. "এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার ?" (দ্র. ক্যানভাসার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩)

আলংকারিক শব্দের প্রয়োগও ঘটিয়েছেন খুব সুচারুভাবে। যেমন 'ক্যানভাসার' গল্পে পাই— "তা তো আছে কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে।" কিংবা "আপনার দাঁতগুলি তো খাসা।" এখানে 'তো' শব্দ আলংকারিক শব্দ। যা ভাষার সুসংঙ্গতি ঘটাতে সাহায্য করেছে।

বনফুল ভাষার বিভিন্ন দিককে খুব সংযতভাবে ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। যেখানে সাধারণ কিছু বিষয়কে যেমন কমা, ছেদ, সেমিকোলন, উদ্ধৃতি, ড্যাশ, হাইফেন প্রভৃতিকে অনন্যসাধারণ করে তুলে ধরার পাশাপাশি, অব্যয়ের প্রয়োগ করে, অলংকারের প্রয়োগ করে, বিভিন্ন ধরণের বাক্য প্রয়োগ করে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে, Parenthesis-এর ব্যবহার করে ভাষাকে করে তুলেছেন প্রাণবন্ত, মর্মস্পর্শী। এছাড়াও তিনি ভাষার মধ্যে রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণকে সংযুক্ত করেছেন। প্রত্যয় ও বিভক্তি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যেমন 'ক্যানভাসার' গল্পে গুলি, গুলার বিভিন্ন নিদর্শন পাই। যথা— 'দাঁতগুলি', 'জুয়াচোর গুলা' ইত্যাদি। প্রত্যয়ের নিদর্শনও পাই 'ক্যানভাসার' গল্পে। যেমন— 'বাবুয়ানি' (বাবু + আনি), বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়। এই বিভক্তি ও প্রত্যয় ভাষার ব্যাকরণগত দিককে প্রস্ফূটিত ও বৈচিত্র্যসাধন করেছে। সবমিলিয়ে বনফুল বাংলা ছোটগল্পে ভাষার যে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, জুন ২০১০, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৪৩৪

২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা, মনন, ১৯৬২

৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৩৪

৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৩৩

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা, লি., পুনর্মুদ্রণ ২০১০-২০১১, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৪৯৫

৬. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৭

৭. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ : বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, তদেব, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৭

৮. মাইতি, সুজয় : বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, শিক্ষণ, ২০১৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ১৭০
৯. Humboldt, Wilhelm Von : Uber die verschienheit desmens children sprachbaues, Darmstadt 1949, P. 41
১০. Hudson, W. H. : An Introduction of the Study of Literature, Chapter-I, Gorge G. Harrap and Company, 2nd Edition 1913, London, P. 11
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের সামগ্রী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় বর্ষ, পৃষ্ঠা. ৩২২
১২. Hockett, Charles. F : A course of Modern Linguistics, New York, P. 55
১৩. মাইতি, সুজয় : বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, শিক্ষণ, তদেব, পৃষ্ঠা. ১৮৪
১৪. দে, নাড়ুগোপাল : কপালকুণ্ডলা : গদ্যশৈলীর বহুমাত্রিক পরিচয়, SKBU Journal, of L.L.S.S., Vol-I, Issue-I, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

বিষয় বৈচিত্র্যে সমকালীন ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্রতা

গাফফার আনসারী

'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "বাংলাদেশের আরো অনেকের মতই আমিও প্রথম কলম ধরেছিলাম ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বোমা বিস্ফোরণ। পড়েছি রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, নজরুলের কবিতা, বাজেয়াপ্ত 'দেশের ডাক' 'ফাঁসির সত্যেন'...সেদিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়েছিল যদি কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয়, তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য।"—জানি না দেশ কালকে তিনি কতটা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন তবে একথা সত্যি যে তাঁর রচনায় সমসাময়িক অগ্নি যন্ত্রণার ছাপ গল্পের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে। দেশের ও দশের স্বার্থে তাঁর কালি কলম ও মন সদা জাগ্রত ছিল। মূলত তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে কালচেতনা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর যেকোনো একটি গল্প পাঠের টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে পাঠক তাকে অনায়াসে চিনে নিতে পারবেন। বিষয় ভাবনার প্রেক্ষিতে গল্পের প্রেক্ষাপট, রোমহর্ষক বর্ণনা এবং তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা গভীর বাস্তবতা তাঁর প্রতিটি গল্পের প্রাণ। গল্পে প্রকাশিত দেশকালের যন্ত্রণা, সাধারণ মানুষের অবস্থান, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের শেষ লেলিহান শিখাটুকু পাঠককে শিহরিত করে। নারায়ণের স্বতন্ত্রতা সেখানেই। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও মনন, সর্বোপরি গল্পের বাচনভঙ্গি সমকালে দাঁড়িয়ে যে কারোরই পক্ষে ছিল ঈর্ষার, ছিল বিস্ময়ের।

ছাত্রজীবন থেকেই সাম্যবাদী চেতনা ও মার্কসবাদী মতাদর্শের কারণে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা গুলো চোখ এড়ায়নি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তারই অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমাজের নিষ্ঠুর সত্যটিকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। এক শ্রেণির মানুষের কাছে

কিভাবে সাধারণ মানুষ টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তার চূড়ান্তরূপ দেখেছেন তিনি, তারই ইতিহাস তাঁর একাধিক গল্পের মূল প্লট। তাছাড়াও চল্লিশের উত্তাল পরিবেশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি, কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মন্বন্তর, একটু অন্নের জন্য ক্ষুধিত মানুষ আর কুকুরের একজোট হওয়ার বীভৎস দৃশ্য অথবা কাউকে অনাহারে উদ্বন্ধনে মারা যেতে হয়, কাউকে বস্ত্রাভাবে নিরাবরণ দেহে দৈনন্দিন জীবনযাপন করতে হয়— সেসব দৃশ্যই চোখে পড়ে তাঁর গল্পে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর যেসব গল্পগুলোর জন্য চূড়ান্ত খ্যাতি পেয়েছেন সেগুলোর বেশিরভাগ চল্লিশের উত্তাল সময়ে রচিত। একচল্লিশে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ও জাপানি আক্রমণ, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা এবং সাতচল্লিশের স্বাধীনতা তথা দেশভাগ তথা উদ্বাস্তু সমস্যার এক বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে নারায়ণের গল্প রচনায় আবির্ভাব। বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষ বিপর্যস্ত তখন। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার অবক্ষয়, কল্লোলীয় বোহেমিয় যুগের অবসান ঘটল কিংবা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের প্রেম ও মুগ্ধতার অবসান ঘটে গেছে তখনই গল্পের ধারায় তরুণতম গল্প লেখকদের আবির্ভাব ঘটল। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভয়ঙ্কর বাস্তবতার সাক্ষী থাকায় এই তরুণ লেখকদের মধ্যে বিন্দুমাত্র রোমান্টিকতা ছিল না, বরং মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয় স্পষ্টরূপে ধরা দিল তাদের লেখায়। জগত ও জীবনকে, ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করল তারা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তরুণ লেখকদের সাদাচোখে উঠে এল সমকালীন বাস্তবতা। বলা যেতে পারে স্বাধীনতার পূর্বকালের বাংলা ছোটগল্পের জন্মান্তর ঘটেছে তাদের হাত ধরে। গল্পের বিষয় ভাবনায় এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এসময়ই।

ত্রিশের দশকের গল্প লেখকদের মধ্যে আত্মিক সংকট প্রকট নয় বরং ব্যক্তিগত চিন্তা চেতনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জায়গা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাই ছিল তাদের মূল অবলম্বন। তা-ই সাহিত্যকে পুষ্টিদান করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু চল্লিশের দশকের যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দেশভাগের কারণে লেখকদের বোধ মতাদর্শগত দিক থেকে ধাক্কা খেল। ফলতঃ আধুনিক কবিতার মতো আধুনিক গল্প ব্যক্তিমূলক হয়ে উঠল। সমকালের উপর ভর করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জগত ও জীবনকে নানা মাত্রায় তুলে ধরেছেন তাঁর একশ বাইশটি ছোটগল্পে। একান্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, 'ছোটগল্প লিখে অনেক তৃপ্তি পাই'। এ তাঁর নিজস্ব আন্তরিক মন্তব্য, এ তাঁর নিজের মুখোমুখি হওয়া। নারায়ণ তাঁর রচনায়

একটিবারের জন্যেও সমকালকে ভুলে থাকেননি। মানুষের জন্য মানুষের বাঁচার এক মহৎ বিশ্বাস আগাগোড়ায় ছিল তাঁর গল্পে। লালগোলা ব্লক সাঁওতাল পরগনা থেকে একেবারে মফস্বল শহর তার গল্পের বিষয়। জমিয়ে গল্প বলার এক অভিনব কৌশল ছিল নারায়ণের। যে কারণে সেভাবেই পাঠকের চোখে— এল. আর. চৌধুরী (টোপ), এইচ. এল. চ্যাটার্জী (হাড়), সুন্দরলাল (বীতংস), নিশিকান্ত কর্মকার (নক্রচরিত), ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স দেবীদাস (দুঃশাসন) প্রভৃতি চরিত্র ঘোরের মতো লেগে থাকে। পাঠক কিছুতেই ভুলতে পারে না তাদেরকে। দোষে-গুণে ভরপুর এই চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে নারায়ণের কলমের ছোঁয়ায়।

ছোটগল্প সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান হল 'সাহিত্যে ছোটগল্প'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে 'রূপতত্ত্ব' অংশে ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখক নারায়ণ নিজেই জানিয়েছেন, "আধুনিক ছোট গল্প হল যন্ত্রণার ফসল।" যে সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি লেখালেখি শুরু করলেন তা যে যন্ত্রণার সেকথা পূর্বে উল্লেখিত। আসলে তিরিশের দশকের শেষভাগে যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁর গল্পে স্বপ্ন আর বাস্তবতা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। আজন্ম লালিত তাঁর এই ভাবনা জীবনের শেষপর্বে এসে লেখা 'লক্ষ্মীর পা' গল্পটিতেও অন্যথা হয়নি। নিজের আদর্শ থেকে তিনি বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। গল্পটিতে একদিকে কোলিয়ারি তথা কালো মাটির দেশ অন্যদিকে সবুজ ধানের দেশ। পেটের দায়ে বলাই তার সবুজের দেশ ছেড়ে কোলিয়ারির কাজ নেয়। বহুদিন ধরে সেখানে থেকে ওই অঞ্চলের মেয়েকেই বিয়ে করে নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে যখন বলাই বাড়ি ফিরে আসছে তখন তার বউয়ের চোখে মুখে সবুজের সমারোহ পাঠককে এক অন্য অনুভূতি দান করে। বলাইও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যায়। গল্পটি যেন যন্ত্রণাময় জীবনের থেকে উত্তরণের ও বাঁচার স্বপ্নসন্ধানের আধার হয়ে উঠেছে অনায়াসে।

জীবনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলায় যে স্বাভাবিক জটিলতা ও রহস্যময়তা তা অনুসন্ধান করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রের প্রতি নিরাসক্ত ও নিরুদ্বেগ ভাবনাসঞ্জাত মানিকের শিল্প জিজ্ঞাসায় তাই উঠে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। মানুষের গহীন তলদেশে ডুব দিয়ে তিনি মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র আবেগতাড়িত মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি মমত্ববোধ থেকে সরে আসেননি। তাই নানান বৃত্তির মানুষ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অন্তর্ঘাত তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রেম ও প্রয়োজনের সংঘাতে অবশেষে প্রয়োজন অত্যন্তরকমভাবে স্বাভাবিক হয়ে ওঠার অস্বাভাবিক ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর 'রস' গল্পে। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে অনেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরী বলে মনে করেন। মানুষের

অন্ধকার জীবন, মানুষের আদিমতা সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর 'গিরগিটি' গল্পটিতে মানব মনের অন্তর্লোক উন্মোচিত হয়েছে সহজেই। অন্যদিকে সন্তোষকুমার ঘোষ কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মম হৃদয় বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। আত্মজৈবনিক দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত কিছু পরখ করে দেখেছেন তিনি। সমকালীন অনেকের লেখার মধ্যেই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে অবক্ষয়ের শিল্পরূপ লাভ করেছিল। অন্যদিকে নারায়ণ মূলত চল্লিশের দশকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। যে চল্লিশে যুদ্ধ, দাঙ্গা, অমানবিকতা, সুবিধাবাদীদের কালোবাজারির রমরমা সেই মন্বন্তরের দিনগুলোতেই নারায়ণের গল্পের বেড়ে ওঠা ও পরিণত হওয়া।

যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের ফলে অন্নাভাব কতটা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করেছিল তার চরমতম প্রমাণ হল 'হাড়' গল্পটি। সারা বাংলাদেশের অগণিত অভুক্ত মানুষ সেদিন একটু খাবারের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতাটি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষদের তৈরি করা এই দুর্ভিক্ষে একদিকে বিলাসী জীবন-যাপন অন্যদিকে মাংস নয়, এক টুকরো হাড়ের জন্য ডাস্টবিনে মানুষে-কুকুরে কামড়াকামড়ি। রায়বাহাদুর এইচ.এল. চ্যাটার্জির হাড় সংগ্রহের বিলাসিতা এবং বন্ধু পুত্রটিকে চাকরির পরিবর্তে 'অ্যাক্টিভ সার্ভিসে' যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেন অভাবী জীবনে বিদ্রুপের মতো শোনায়, যেন ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়া। 'বি এ ইয়াং ম্যান ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে—' এই উপদেশ বেকার জীবনে কত বড় উপহাস তা গল্পকথকের চাপা ক্ষোভে ব্যঞ্জনা পেয়েছে এভাবে, 'ওই আকাশের রং আগুনের মত লাল হয়ে উঠবে কবে', অথবা 'হাড় ওরা পেয়েছে কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।'

এই মন্বন্তর ছিল স্বার্থসর্বস্ব, ছিল অমানবিক। মুনাফার লোভে তারা কালোবাজারি করতেও পিছপা হয়নি। 'দুঃশাসন' গল্পটি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্ত্রব্যবসায়ী দেবীদাস ও তার ভাইপো গৌরদাস অভাবের বাজারে কাপড় মজুত থাকা সত্ত্বেও 'ভগবানের মার' বলে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কাপড় বিক্রি আটকে দেয়। তাদের এই পৈশাচিক লোভের কারণেই 'সারা পৃথিবী জুড়েই যে দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে।' এক ফালি কাপড়ের অভাবে সম্পূর্ণনগ্ন এক ষোড়শীকে ঘাট থেকে জল আনতে দেখি গল্পে। গল্পকারের বর্ণনায় তাই উঠে এসেছে এক অমোঘ সত্য, "যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"

সমকালীন বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থার বীভৎস রূপ ফুটে উঠেছে নারায়ণের একাধিক গল্পে। যেমন— বীতংস, নক্রচরিত, পুষ্করা, টোপ প্রভৃতি গল্পের চিরকালীন আবেদন

কোনো পাঠক বা সমালোচকই উপেক্ষা করতে পারবে না। প্রথম গল্পটিতে আড়কাঠি সুন্দরলালের চালাকিতে শাল-মহুয়ার দেশের নিরীহ সাঁওতালদেরকে আসামের চা-বাগানের শ্রমিকে পরিণত হতে হয়েছে। আবার 'নক্রচরিত'-এর নিশিকান্ত কর্মকার সুন্দরলালের থেকে কোন অংশে কম নয়, তার মুখে সর্বদায় ধর্ম কথা থাকলেও সে আসলে নক্র অর্থাৎ কুমির। ভেকধারী পরম বৈষ্ণব। যে কোনো মুহূর্তেই পাল্টে যেতে পারে সে। সুবিধাবাদী নিশিকান্ত ইব্রাহিম দারোগাকে ঘুষ দিয়ে (বলা ভাল উপঢৌকন) বেআইনি চাল মজুত করে। এদিকে সাধারণ মানুষ না খেয়ে আত্মহত্যা করছে অথচ সেজন্য তার অনুশোচনা নেই বিন্দুমাত্র। আবার পুষ্করা গল্পে দীর্ঘদিনের বুভুক্ষু ডোমপাড়ার পাগলী শ্মশানকালী রূপে শিবাভোগ খায় দুহাতে আঁজলা করে। আর যে গল্পটির জন্য নারায়ণের সর্বকালীন খ্যাতি তাঁর সেই 'টোপ' গল্পে রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন .আর চৌধুরীর এক অমানবিক শিকার কাহিনি পাঠকের মেরুদন্ডে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেয়। রাজাবাহাদুরের বাঘ শিকারের ব্যক্তিগত বিলাসের প্রয়োজনে হিন্দুস্থানী কিপারের বেওয়ারিশ সন্তান এক অবোধ মানব শিশু আসলে বুর্জোয়াদের টোপে পরিণত হয়েছে। মানুষের টোপে পরিণত হওয়ার এক নিদারুণ সত্যের উন্মোচন নারায়ণের স্বতন্ত্রতাকে প্রতিপন্ন করে। গল্পটির বর্ণনায় টানটান উত্তেজনায় পাঠককে এক সম্ভাব্য পরিণতির ভাবনায় আচ্ছন্ন রাখেন গল্পকার নারায়ণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে কোন গল্পের বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে—সৈনিক,ভাঙা চশমা, বনতুলসী, বনজ্যোৎস্না ও একটি শত্রুর কাহিনী প্রভৃতি গল্পগুলি। এবং অবশ্যই মনে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের গল্প 'রেকর্ড'। গল্পটিতে যে রেকর্ডের গানের ভাষার উল্লেখ আছে তা কোনও এক দেশের বিপ্লবের ভাষা যা আন্তর্জাতিক ব্যাপকতায় পৌঁছে গেছে। গল্পকার বললেন, 'দেশে দেশে কালে কালে এ সুর এক।' সত্যিই তো এই রেকর্ডকে কেউ কোনোদিন নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে না। আবার ভালোবাসা ও দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে লেখা তাঁর 'কান্ডারী' গল্পটিও উল্লেখের দাবি রাখে। আসলে বাংলা ছোট গল্প যাদের হাত ধরে আধুনিকতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রমুখী হয়ে উঠেছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। যে কারণে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন, "জীবনের ক্ষতি ও ক্ষতই শেষ কথা নয়, জীবনকে ভালোবাসায় একমাত্র সত্যি।" সত্যিই তিনি জীবনকে ভালোবেসেছিলেন। নতুন আঙ্গিকে জীবনকে দেখার দৃষ্টি ছিল বলেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যে কোনও পাঠকের রসনায় নতুনত্বের স্বাদ এনে দিতে পারে। সত্যি তিনি জীবনবাদী ছিলেন বলেই নানারৈখিক জীবন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। সমাজকে নির্মোহ নিরাসক্তভাবে দেখতেন বলেই বৈষম্যমূলক সমাজের মুখোশ খুলে দিতে পেরেছিলেন তিনি। একজন গল্পকারের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব সেখানেই।

সহায়ক

১. সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৫
২. কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৮০৯১-২০০০
৩. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৪
৪. বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক, সম্পাদনা শ্রাবণী পাল, পুস্তক বিপণি, ২০০৮
৫. আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট, সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২০০৪
৬. ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২০০৪
৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়— ফিরে দেখা, সম্পাদনা- সুকুমার মিত্র ও ঠাকুরদাস মাহাতো, বাংলা বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী কলেজ, লালপুর, ২০১৯

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা নাটক

কৈলাশপতি সাহা

যে কোনো আলোকসামান্য ব্যক্তি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেন— এ কথা ইতিহাস স্বীকৃত। ষোড়শ শতকের সামাজিক পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্য যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কয়েক শতাব্দী ধরে তার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বাঙালির জীবনযাত্রায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাবও স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত হয়েছে বাঙালির ধ্যানধারণায়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা যখন তার আগ্রাসী রূপ নিয়ে সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করতে উদ্যত তখন তাকে রোধ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শ এক মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বাঙালির জীবনে যুগান্তকারী ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে তিনি চিরপুরাতন, সহজ সরল, আড়ম্বরহীন জীবনে অভ্যস্ত এক পুরোহিত। কিন্তু তাঁর আচরণ ও জীবনচর্যার মধ্যে যে ভক্তিভাব ফুটে উঠেছিল তা সংশয় জর্জরিত মানুষকে দেখিয়েছিল বিশ্বাসের পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারে আবদ্ধ মানুষকে অবজ্ঞা করেননি। ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তির মধ্যে যে মুক্তি আছে, সেবার আদর্শ কঠোর তপস্যার চেয়ে কোনো অংশে যে কম নয়, সেই বার্তাই তিনি পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের দ্বিধাদীর্ণ অন্তরাত্মার কাছে। তাঁর অমৃত সমান উপদেশ, অনুকরণীয় জীবনচর্যা মিশে গেছে বাঙালির সাধনা, বাংলা ভাষা ও বাংলা নাটকে।

বাংলা নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণকে মানবের চিন্তামণি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী করুণার আশ্চর্য পরিচয় পেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনে। তামসিক জীবনের দুর্বহ গ্লানি নিয়ে তিনি এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছিল গিরিশের জীবন। শুধু তিনি নন মঞ্চজগতের সঙ্গে জড়িত নরনারীদের শুচিতাবিহীন মসীলিপ্ত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ পৌঁছে দিয়েছিলেন পরম আশ্বাসের বাণী। তিনি অনুভব করেছিলেন তাদের অন্তরের বেদনা ও চরম আর্তি। তিনি বলেছেন— "আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিইনি। যেটা feel করেছি, সে সত্য

practical life-এ realise করেছি, যা জীবনে মরণে পরম সত্য বলে জেনেছি তাই সবার ভিতরে বলিয়া দিতে চেষ্টা করেছি।"[১] সেই সঙ্গে সামাজিক অসম্মানের দিকটি বড় করে না দেখে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনকল্যাণের দিকটি তুলে ধরে বলেছিলেন— "ওতে লোকশিক্ষা হবে।" তিনি স্বয়ং বিনোদিনীকে মাতৃ সম্বোধন করায় তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পরবর্তী যুগের মানুষেরা বলতে পেরেছিলেন— "অভিনেতা অভিনেত্রীদের জাত নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর জীবনচিত্রকে নানাভাবে নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রথম যুগের নাটকে ভক্তিরসের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও গুরুদেবের জীবনাদর্শ প্রচারের বাসনা প্রকাশিত হয় পরবর্তী সময়ে লেখা 'পূর্ণচন্দ্র' (১৮৮৬), 'রূপ সনাতন' (১৮৮৭), 'নসীরাম' (১৮৮৮), 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) প্রভৃতি নাটকে। 'কালাপাহাড়' নাটকে চিন্তামণি যে ভাষায় কথা বলে তা 'কথামৃতে'র অবিকৃত রূপ। নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন— "তখন হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভারতের পৌরাণিক কাহিনি লইয়া মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনী বৈজ্ঞানিকভাবে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব অনুশীলনে নিরত রহিয়াছে। এইরকম সর্বজনীন ধর্মপ্লাবন গিরিশচন্দ্রের ধর্মভাবকে পরিপোষণ করিলেও, তাঁহার জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রভাব আসিয়াছিল ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দুর্লভ সঙ্গ হইতে। অশেষ সৌভাগ্যক্রমে তিনি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এবং এই দুই মহাত্মা ধর্মনেতা তাঁহার মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গি এমনিভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমস্ত নাটকে ভক্তিভাবের অবারিত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।"[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রীম সংকলিত 'কথামৃতে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। আর 'কালাপাহাড়' নাটকের রচনাকাল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ। প্রায় একই সময় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী চিত্রণ সম্ভব হয়েছিল। তৎকালীন গণমানসে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের। শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজির জয় ভারতের আপামর জনসাধারণের মনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক নাটক ও সংগীত একদিকে যেমন তাদের উৎসাহিত করেছিল, তেমনি উদ্বেলিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের হৃদয়। রামচন্দ্র দত্তের মতো নিরিশ্বরবাদী মানুষও রচনা করেছিলেন 'লীলামৃত' নাটক।

অতঃপর বাংলা নাট্যজগতে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে একাধিক নাটক রচনার বিবরণ পাওয়া যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নর-নারায়ণ' (১৯২৬), অমৃতলাল বসুর

'আদর্শ-বন্ধু' (১৯০০), মদনমহোন গোস্বামীর 'ধর্মবিপ্লব' প্রভৃতি নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র মুখ্য হয়ে উঠেছে।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখতে আসার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরিচয় ঘটে। কথামৃতকার শ্রীম জানিয়েছেন— "নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরিশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা দর্শন করিতে আসিয়াছেন, শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন।"[৩] এর পরের ঘটনাবলী গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন পরিবর্তন এনেছিল, তেমনি তার প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর রচনাবলীতে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অভিনীত হয় নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'। সেখানে নাটকের প্রস্তাবনারূপে পরিকল্পিত প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুটি চরিত্র নট ও নটীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের তৎ কালীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসার পর গিরিশচন্দ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নিজের শক্তি এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস।'চৈতন্যলীলা' নাটকে নিমাই-এর ভূমিকায় অভিনেত্রীর (বিনোদিনী দাসী) দ্বিধা দ্বন্দ্বের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মানসিক দ্বন্দ্বের রূপটি এক হয়ে গেছে। নাটকটির প্রার্থনা সংগীতের মধ্যে অভিনেত্রী ও নাট্যকারের আকুতি ধরা পড়েছে এভাবে— "ডাকে হে পতিত তোমায়/পতিত পাবন পুরাও সাধ।/আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে,/দাও হে প্রেম সুধার স্বাদ।"

'চৈতন্যলীলা'র (১৮৮৪) পরবর্তী নাটকের ক্রম অনুসরণ করলে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। নাট্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল অনেকটাই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাগিদে। রঙ্গমঞ্চে যখন প্রচলিত নাটকগুলির অভিনয় একে একে শেষ হয়ে গেল তখনই তাঁকে বাধ্য হয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছিলেন দর্শক ও থিয়েটারের রুচির দিকে তাকিয়ে। সুতরাং রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে সেগুলির অর্থকারী উপযোগিতা এবং দর্শকদের আনন্দদান তাঁর লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে উপস্থিত করেছিলেন নাট্যরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য— লোকরঞ্জন বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয় লোকশিক্ষার আদর্শ।

'নিমাই সন্ন্যাস' (১৮৮৫) রচনার প্রায় দেড় বছর পরে রামকৃষ্ণ ভাবধারা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) নাটক। এই নাটকটি রচনার একটু ইতিহাস আছে, যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নাটকটি গিরিশচন্দ্র রচনা করলেও কাহিনি ও চরিত্র পরিকল্পনায় শ্রীরামকৃষ্ণের যথেষ্ট হাত ছিল। 'ভক্তমাল' গ্রন্থের অন্তর্গত বিল্বমঙ্গলের

জীবনকাহিনি গিরিশকে শুনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কাহিনির নাট্যভাবনা ফুটে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অনুকরণীয় বর্ণনা ভঙ্গীতে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছায়া গিরিশকে প্ররোচিত করেছিল কাহিনির নাট্যরূপ রচনায়। নাটকটির চরিত্র পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যার প্রমাণ 'সাধক' চরিত্রটি। 'ভক্তমাল' বহির্ভূত দ্বিতীয় নতুন চরিত্রটি হল পাগলিনী। এই চরিত্রটির পরিকল্পনাতেও আছে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগত এক বিকৃত মস্তিষ্ক ভক্ত মহিলা চরিত্র। একদিন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ভক্তদের কাছে কৃষ্ণ অবতারের বিভিন্ন ভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধুর ভাব ও পাগলিনীর কথা বলেছিলেন। সেই উন্মাদিনী 'বিল্বমঙ্গল'-এ পাগলিনী কায়া এবং তাঁর চরিত্রের অন্তরালেও রয়েছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণকে একাধারে নারী ও পুরুষ চরিত্রের ভিতর ফুটিয়ে তোলার কারণ প্রসঙ্গে সমালোচক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা থিয়েটার' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "গিরিশচন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রকে নারী আধারে স্থাপন করেছেন তারও পটভূমিকায় আছে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন সম্মতি। এই নাটক রচনার কিছুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন পানিহাটির উৎসবে— সঙ্গে ছিলেন গিরিশচন্দ্রও। সেখানে তাঁর নৃত্যের মধ্যে কখন পৌরুষের দৃঢ়তার সঙ্গে কখন নারীত্বের পেলবতা দর্শন করে অভিভূত গিরিশচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, তিনি নিজেও বলতে পারেন না— তিনি পুরুষ না প্রকৃতি। গিরিশের বিভিন্ন নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের দুই সত্তার প্রকাশ দেখা যায়।"[৪] সমালোচক অজিত কুমার ঘোষও এই যুক্তিকে মেনে নিয়ে বলেছেন— "পরমহংসদেবের আদর্শ এখানে যে স্ত্রী চরিত্রে কল্পিত হইয়াছে তাহা অস্বাভাবিক হয় নাই; কারণ তাঁহার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের সমান বিকাশ হইয়াছিল।"[৫] এই চরিত্রটি 'ভক্তমালে'র বিল্বমঙ্গল কাহিনিকে নতুনভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সাধনার আদর্শ তার চরিত্রে অঙ্গীভূত হয়েছে। সকল প্রকার ধর্ম সাধনা যে শেষ পর্যন্ত এক লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, পাগলিনীর সংলাপে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়— "আমি মা পাঁচভাতারী—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা, আমি একভাতারী এয়ো।" বিল্বমঙ্গলের মতো নাট্যকার নিজেও সদগুরুর কৃপায় পরম শান্তি লাভ করেছিলেন। সমালোচক আরও জানিয়েছেন— "ভগবানের অহেতুকী কৃপার ফলে লম্পট ও পতিতাও ত্রাণ পাইয়া যায়, ইহাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের অনুভূত বাস্তব সত্য। সেই সত্যই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি চরিত্রে। পাগলিনী চরিত্র যে পরমহংসদেবের লীলাকীর্তন করিয়া লিখিত, তাহা অতি স্পষ্ট।"[৬]

পাগলিনী বিল্বমঙ্গলকে যে নতুন চিন্তামণির সন্ধান দিয়েছিল সেই চিন্তামণিকে আমরা পেয়েছি 'কালাপাহাড়' নাটকে। প্রকৃতপক্ষে 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) ও 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) গিরিশচন্দ্রের আত্মপ্রতিকৃতি এবং তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দুটি স্বতন্ত্র রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁকে পৌঁছে দিয়েছেন মিথ্যা চিন্তামণি থেকে সত্য চিন্তামণিতে। 'কালাপাহাড়' নাটকে চিন্তামণিকে ভাবে ও সংলাপে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে চিহ্নিত করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

'নসীরাম' (১৮৮৮) নাটকেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ সচেতনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ বাকরীতি, চরিত্রবৈশিষ্ট্য, নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। 'নসীরাম' 'ভগবতবাক্যমূলক' নাটক। এই পরিচয়ে নাটকের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। নসীরাম বহিরঙ্গে 'নসে পাগলা' অন্তরঙ্গে 'কৃষ্ণপ্রেমিক'। কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন ও বিতরণ তার জীবনের উদ্দেশ্য। "জগতকে প্রেম দে—যে হীন, তাকে প্রেম দে— রাই রাজার ঘরের প্রেম ফুরাবে না, যত পার বিলাও।" নসীরামের পরিণত রূপ হল 'কালাপাহাড়' নাটকের চিন্তামণি। কালাপাহাড় চিন্তামণিকে প্রশ্ন করেছিল, 'কে আপনি ?' চিন্তামণির উত্তর, 'যখন এই শরীর হামাগুড়ি দেয়, তখন শুনতেম কালো, তারপর যখন শরীরের বয়স পাঁচ সাত বছর হলো তখন শুনতাম কালীকৃষ্ণ; দিনকতক নসীরাম বলতো। এখন শুনি চিন্তামণি।" এই সংলাপে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথার আভাস পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কে ?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ— আমি এখানেই থাকি।'

'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ ব্যবহার করেছেন বহুল পরিমাণে। অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন পর্যন্ত করেননি। যেমন চিন্তামণি কালাপাহাড়কে বলেছে— "লোকশিক্ষা দিতে এসেছে, অহংকার ছেড়েছ ? দেখেছ ভাই অহংকারের ফের ? ও কি ছাড়ে! নাহম্ নাহম— তুঁহু তুঁহু।"

পরবর্তী নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার মধ্যে গভীরভাবে অবগাহন করেছেন। 'শঙ্করাচার্য' নাটকটি বন্ধু কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করে লিখেছেন— "ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার দক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ— তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না"[৭] এই আক্ষেপের কারণ বেদান্তরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি শঙ্করাচার্যের আচ্ছাদনে মঞ্চে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শেষ নাটক 'তপোবল' কাহিনিতে পৌরাণিক ছায়া থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আদর্শকে তিনি নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন।

এই নাটকগুলি ছাড়াও গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রায় সমস্ত নাটকে কোনো না কোনো ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব রয়েছে। 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) এর পাগলিনী, 'নসীরাম' (১৮৮৮) এবং 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) এর চিন্তামণি চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। 'জনা'র (১৮৯৪) বিদূষক, 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) এর কঞ্চুকী প্রভৃতি ধর্মমূলক চরিত্রগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে কল্পিত হয়েছে। 'ভ্রান্তি'র (১৯০২) রঙ্গলাল,

'মায়াবসান' এর (১৮৯৭) কালীকিঙ্কর, 'বলিদান'এর (১৯০৫) কিশোর এবং 'শাস্তি কি শান্তি'র (১৯০৮) পাগল চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম ও সেবাধর্মের আদর্শ চিত্রিত হয়েছে। এমনকি লঘু প্রহসনগুলির সংগীতগুলিতেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সুস্পষ্ট। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকের জন্য অসংখ্য গান লিখেছেন। সেই গানগুলিতে যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনেরও প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যেমন 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের একটি গান হল— "যদি শরণ নিতে পারি রাঙা পায়/ নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে কলঙ্ক কোথা পালায়/যে জন করুণা যাচে (ঠাকুর) আসেন তার কাছে/অভয়চরণ তার তরে আছে/ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন 'চৈতন্যলীলা' বা তার পরবর্তী নাটকগুলি স্টার থিয়েটারে দেখতে যেতেন তখন অমৃতাল বসু সেখানকার অভিনেতা। তিনি প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোনো কৌতূহল বোধ করেননি, বরং তাঁকে পরিহাস করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর মানসিক পরিবর্তন এনেছেন এবং তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। অমৃতলাল বসুর ভাবান্তরের পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন— "লোকে জানে, গিরিশবাবু আমার নাট্যকলার গুরু, আমি জানি তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু।"[৮] অমৃতলাল বসুর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়, নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি মূলত প্রহসন রচয়িতা হিসেবে। তাঁর 'আদর্শ বন্ধু' নাটকে চটসাঁই চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায়। চরিত্রটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নসিরাম ও চিন্তামণির আদলে নির্মিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমসাময়িক নাট্যকার হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম সুবিদিত। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তবে তিনি অলৌকিক ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং বাগবাজারের অধিবাসী হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নাটক রচনার সূত্রে রঙ্গমঞ্চের কথা ভেবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে 'ভীষ্ম' (১৯১৩), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'নরনারায়ণ'-এ (১৯২৬) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে নাট্যকারের নিজস্ব উক্তি পাই। এই প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামী সারদানন্দ 'কবিবর ক্ষীরোদপ্রসাদ' নামক প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "ক্ষীরোদবাবু বহুদিন বহুবার আমাদের বলিয়াছেন, 'কর্ণ চরিত্রে আমি নিজের চরিত্রই আঁকিয়াছি। আমি প্রথমে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতাম না।"[৯]

'নর-নারায়ণ' মঞ্চ কর্তৃপক্ষের ফরমায়েসি নাটক নয়— একথা নাট্যকার নাটকের

ভূমিকাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কর্ণ চরিত্রের রহস্য উপলব্ধি নাটকের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করলেও নাটকটি শেষ হয়েছে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব উপলব্ধিতে। নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনই তাঁর উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নাট্যকারের উপলব্ধি তাঁর মানসিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য রাখে। 'রামানুজ' নাটকে রামানুজকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক হিসেবে দেখানো হয়েছে। আদ্যন্ত ধর্মকথায় পরিপূর্ণ এই নাটকে মানুষ ও দেবতার ভেদাভেদ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কুরেশের চরিত্র মাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

গিরিশ যুগের অন্যতম শক্তিমান নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ব্যক্তি জীবনে নানা বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। যৌবনে শিক্ষালাভের জন্য তিনি বিলেত যান, ফিরে আসার পর রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেয়। এই ঘটনা তরুণ দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্ষুব্ধ করে এবং তিনি প্রকাশ্যে হিন্দুসমাজের নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহ করেন। হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম জীবনের রচনায় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম তীব্র আক্রমণের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় আচরণ কিংবা মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা সেখানে প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। শেষজীবনে মনের পরিবর্তন আসে এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাগিনেয় তথা অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী কলকাতায় পড়াশুনা করতে এসে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। সেই সূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। নির্মলেন্দুর মতো দ্বিজেন্দ্র তনয় দিলীপকুমার ছিলেন অধ্যাত্ম পথের পথিক। পিতার হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই গ্রন্থ পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজগতের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথম জীবনে গঙ্গামাহাত্ম্য নিয়ে যিনি তাৎক্ষণিক বিদ্বেষে পরিহাস করেছিলেন, শেষ জীবনে 'ভীষ্ম' নাটকে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। তিনি লিখলেন— "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে/শ্যামবিটপীঘন তটবিপ্লাবিনি/ধূসর তরঙ্গভঙ্গে।/বারিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে/বরিষ অমৃত মম অঙ্গে/মা ভাগিরথী! জাহ্নবী! সুরধুনি!/কলকল্লোলিনী গঙ্গে!"

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৫) রচনা হিসেব উৎকৃষ্ট মানের নয়। অসুস্থ নাট্যকারের শক্তি তখন অস্তমিতপ্রায়। নাটক হিসেবে তাদের উৎকর্ষ অপকর্ষের কথা বাদ দিলে নাট্যকারের মানসিক পরিবর্নতের দিক থেকে এটি মূল্যবান। 'পরপারে' নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে এক পতিতা নারীচরিত্র, নাট্যকারের সহানুভূতি সেই চরিত্রটির প্রতি সুস্পষ্ট। নাট্যকারের এই উদারতার মূলে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শ, যা তিনি কথামৃত আস্বাদন করে লাভ করেছিলেন। এই নাটকে ভবানীপ্রসাদ চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের নবলব্ধ উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ভবানীপ্রসাদের দু-একটি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

১) "এবার তোরে চিনেছি মা/আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি।/ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা/ (এবার) পাঠিয়ে দিয়েছি যমের বাড়ি।"

২) "পেয়ে মানিক হারালাম মা/আমি অতি লক্ষীছাড়া/আঁধারে পথ দেখতে পাইনে/ কোথা আছিস দে মা সাড়া।"

এই গানগুলি শুধুমাত্র ভবানীপ্রসাদের চরিত্রকে পরিস্ফুট করেনি, শেষজীবনে দিশাহারা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরকেও আলোকিত করেছে, যিনি জীবনের অন্তিমলগ্নে পেয়েছিলেন ধ্রুবতারার সন্ধান। 'বঙ্গনারী' নাটকে কেদার চরিত্রটি বিবেকানন্দ চরিত্রের কাব্যিক রূপ।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবদ্দশায় মঞ্চের সংস্পর্শে এলেও নাট্যকার হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন গিরিশচন্দ্রের তিরোধানের পর। সর্বক্ষেত্রেই তিনি গিরিশচন্দ্রের অনুগামী, তবে নট ও নাট্যকার হিসেবে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দুর্লভ নয়। যুবক বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের সংস্পর্শে আসেন। ১৩১৯ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজ চরিত' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর এক বন্ধুর অনুরোধে রামানুজের জীবন অবলম্বন করে নাটক রচনা শুরু করেন। 'রামানুজ' নাটকের বিভিন্ন দার্শনিকত্ব— অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নাট্যকারকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বামী সারদানন্দ। 'রামানুজ' (১৯১৬) নাটকে আপাতপাগল ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত দার্শনিককে পাই কাঞ্চিপূর্ণ চরিত্রে। তার সংলাপে 'কথামৃতে'র শুধু আভাসমাত্র নয়, মাঝে মাঝে অপরিবর্তিত রূপ চোখে পড়ে। কাঞ্চিপূর্ণ বাল্যকাল থেকে শ্রীবরদারাজের (বিষ্ণু) সেবক, সাধারণ লোকের চোখে তিনি বরদারাজের নিত্যদাস। তার স্বভাব বালকের মত। অভিমান কাকে বলে তা সে জানত না। অধিকাংশ সময় তার স্বভাবে অলৌকিক আকার ধারণ করত। তার সঙ্গে সবসময় একজন অদৃশ্য পুরুষ থাকতেন। লোকের সঙ্গে বাক্যালাপকালে তিনি সবকিছু ভুলে গিয়ে সেই পুরুষের সঙ্গে কথা বলতেন। অপরেশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যেও মাঝে মাঝে চরিত্র পরিকল্পনা ও সংলাপে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

নট ও নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী স্বল্পকালের জন্য নাট্যজগতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'সাধনা' নাটকটি শ্রীরামকৃষ্ণকে উৎসর্গীকৃত একমাত্র নাটক। তিনি 'সমাজ' নাটকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের দুর্ভিক্ষে সেবাকার্যের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর অপর নাটক 'ধর্মবিপ্লব', 'কালাপাহাড়ে'র কাহিনি অবলম্বনে রচিত এবং চরিত্র পরিকল্পনা, কাহিনি বিন্যাসে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ লক্ষ করা যায়। চিন্তামণির বদলে এখানে রয়েছে বামাচরণ চরিত্র। 'বিধির বিধান' নাটকে পুলহ ঋষির চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াপাত ঘটেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে বিভিন্ন দিক থেকে উপলব্ধি করার চেষ্টায় তাঁর অমৃতসমান জীবনকথা, জীবনদর্শন, সমাজচিন্তা প্রভৃতি নিয়ে অসংখ্য নাটক সমকালে ও পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে আছে নাট্যকারদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং তাঁদের রচনায়। পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের অঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে অসংখ্য নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন, এমনকি প্রগতিবাদী নাট্যসংস্থাও শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র ও সংলাপকে ব্যবহার করেছেন নাটকের সাফল্যের জন্য। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের কেন্দুলীতে এসেছিলেন পোলিশ নাট্যপরিচালক জার্জিগ্রোটোস্কি। এখানে এসে তিনি একটি থিয়েটার ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ রীতি এই বিশ্ব লোক নাট্য গবেষককে মুগ্ধ করেছিল।[১০] যাই হোক বাংলা নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও এসেছেন ঈশ্বর উপাসনার প্রতীক হয়ে, মানুষের সান্ত্বনার শেষ আশ্রয় হিসেবে, কোথাও বা তাঁর প্রভাব পড়েছে সবার অলক্ষ্যে। সেই সঙ্গে নাট্যকারদের মানস পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে তাঁদের নাটকে বর্ণিত চরিত্রের আচরণের মধ্যে। সেই পরিমাণ এত বিপুল এবং বৈচিত্রপূর্ণ যে, সমস্ত উদাহরণ সংকলন করবার জন্য স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন আছে।

তথ্যসূত্র

১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ২২০৫, পৃ. ১৫০।

২. ড. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ২২০৫, পৃ. ১৪৮

৩. শ্রীম কথিত, 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত', শুভম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ৩০০।

৪. স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, স্বামী চৈতন্যানন্দ সম্পাদিত, 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ৫১৩।

৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃ. ১৫৮

৬. তদেব, পৃ. ১৫৭।

৭. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃ. ৫১৬।

৮. তদেব, পৃ. ৫১৮

৯. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, 'উদ্বোধন' (শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন), উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩১৪।

১০. Sunday, 30 March, 1981, 'Advocate of a Poor Theatre' দ্রষ্টব্য।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র উত্তরাধিকার

ড . স্বর্ণকমল গোস্বামী

একদা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তথাকথিত আধুনিক কবিদের ব্যবধান ছিল যোজনব্যাপী দূরত্বে। আধুনিক বাংলা কবিতার আসরে সেদিন রবীন্দ্রনাথ নামটি ভুলেও উচ্চারিত হয়নি, বরং রবীন্দ্রবিরোধিতা যে আধুনিকতার উৎসভূমি বা চরিত্রলক্ষণ এমন কথা তথাকথিত কবি তথা আধুনিক কাব্যের সমালোচকেরা বাহুল্যের সঙ্গে বারংবার স্বীকার করেছেন। আসলে আধুনিকতার প্রারম্ভিক পর্বে রবীন্দ্রবিরোধিতাই আধুনিকতার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আধুনিকতার পুরোধা মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিদের রবীন্দ্র বিদ্রুপ বা রবীন্দ্র বিরুপতার কথা মনে পড়ে। 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬) 'প্রগতি' (১৯২৭), 'পরিচয়' (১৯৩১) প্রভৃতি পত্রিকা সেই উন্মাদনার চিহ্নগুলিকেই ধরে রেখেছে। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুলের কাব্যরচনা চতুর্থ দশক পর্যন্ত অব্যাহত। পরবর্তীসময় এই দশকেই যোগ দিলেন জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮১)। কবি ধর্মে এঁরা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কবিতার ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এবং রূপনির্মাণ প্রসঙ্গে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী স্বতন্ত্র। কিন্তু মুখ্যত এঁদেরই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল রবীন্দ্রোত্তর যথার্থ আধুনিকতা'।[১] এই নবীন কবিগোষ্ঠী য়ুরোপীয় কাব্যের আধুনিকতাকে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার সাধনা হল তাঁদের প্রাথমিক সাধনা এবং তার মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবনাকে রূপায়িত করতে চাইলেন তাঁরা। অথচ লক্ষ্য করার বিষয়, রবীন্দ্রমানসিকতা বা তাঁর রচনারীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে পথটিকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রবিরোধিতার নেশা তাদের কেটে গেল। অর্থাৎ এই নতুন কবিগোষ্ঠীর মনে কাজ করছিল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তারই ফলে একদিন তাঁরা যেমন বুঝতে পারছিলেন রবিপ্রদক্ষিণে,

অন্যদিকে তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, অন্ধ অনুকরণে বাংলা কবিতার পালাবদল ঘটানো যাবে না। তার জন্য সচেতন বিদ্রোহের প্রয়োজন। তাই তাঁরা মনে-প্রাণে রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগের কাব্যাদর্শের সাথে রবীন্দ্রভাবনার সংগতিসূত্রটি অন্বেষণ করেছেন সুধীন্দ্রনথ দত্ত তাঁর 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধে। তাঁর বিবেচনায় দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্র কাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে— এইটুকু মাত্র বলতে পারা যায়। কিন্তু তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যারা ভাবাবেগ ও রোমান্টিসিজমকে সংহত করে কবিতার ভিতরে তীথিকের মতো তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের ঈষদঙ্কুরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায়, তাঁরা তাকিয়ে দেখে উপরে-নিচে-সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাঁদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলছে।"[২] সুধীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন— 'রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায়', 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন', সেই বিবর্তন কীভাবে সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ আধুনিক কবিগোষ্ঠীর কাব্যপ্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিরাজ করছেন, তাঁদের কাব্যে ও জীবনে রবীন্দ্রনাথ কোনো নতুন ভাবনার, নতুন অনুপ্রেরণার সঞ্চার করতে পেরেছেন কি না, তা দেখা যেতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার সমস্যা একসময় যাঁদেরকে বেশি আলোড়িত করেছে, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনাকে নিজেদের শিল্পচর্চার সঙ্গে মিলিয়ে আধুনিকতার নতুন তাৎপর্য তৈরি করে তুলেছেন।"[৩] আর সে কারণে রবীন্দ্র ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সম্মিলনে আধুনিক কবিতা হয়ে উঠেছে যথার্থই আধুনিক, খুঁজে পেয়েছে তার নবরূপ ও মৌলিক চরিত্রলক্ষণ।

স্মরণ রাখতে হয়, বাংলা কাব্যের তথাকথিত তরুণ আধুনিক কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রভাববিলাস কাটিয়ে আধুনিক জীবনের অবক্ষয়, হতাশা, ক্ষোভ, দেহচর্যাকে প্রাধান্য দিয়ে কাব্যে এক নতুন সুর সংযোজনের প্রয়াসী হলেন। রাবীন্দ্রিক জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা খুঁজে নিতে চাইলেন কবিতার এক নতুন শিল্পাদর্শকে। হুইটম্যান বা লরেন্সের শারীরিকতা, র‍্যাঁবো, বোদলেয়র বা মালার্মের ভয়ঙ্কর আত্মিক শূন্যতা, ইয়েটস্-এর মৃত্যু চেতনা ও এলিয়টের অবক্ষয়ীচেতনা। প্রকাশরীতিতে পাউন্ড, এলিয়ট, হপকিন্স এবং মুক্তছন্দ ও স্প্রাংরীদম্। অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায়— ''Extra artistic Concern for apposite forms.''

এই আঙ্গিক সচেতনতা বাংলা আধুনিক কবিতাকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র ভাবাদর্শ, যা তাঁদের ভাবিয়েছে ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিসত্ত্বার বিরোধ নয়, বরং মিলনেই যে শিল্পের পরম ঋদ্ধি— একথা বুঝেছেন রাবীন্দ্রিক নন্দন ভাবনায় অনুপ্রাণিত উত্তরকালীন আধুনিক কবিসমাজ। এ প্রসঙ্গে এলিয়টের প্রথা-প্রগতির সমন্বয় চিন্তা আধুনিক বাংলা

কবিতাকে কীভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে তা দেখিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব— "Eliots emphasis on the importance of tradition in literature has made some of our very modernised poets conscious that they have to find a place in the continuous tradition of Bengali Poetry and that they have to write with their whole past literature in their bones."[৪] বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সার্থকতম সম্মিলন ঘটেছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে মনোযোগী হলেন রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের তরুণ কবিসমাজ।

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নানারকম আবর্ত, অর্থনৈতিক সংকট, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের গ্লানি সহ্য করে এল স্বাধীনতা। এই কয়েক বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে কবিতাতে অনিবার্যভাবেই তার ছায়াপাত। বাংলা কবিতাতে এই আলোড়ন ও আন্দোলনের রক্তাক্ত চিহ্ন ধরা পড়ল পাঁচের দশকে। কবিতায় সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক বিশেষত বামপন্থী মতাদর্শ প্রাধান্য পেল এই যুগপর্বে।[৫] অবশ্য কবিতার মূল ধারাটি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ধারা হলেও এরই সমান্তরালে একটি অনতিব্যক্ত রোমান্টিক লিরিক প্রবাহ অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। এই ধারারই কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকে এই গীতিময়তার ধারাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বা তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্যাকে পুনর্বিবেচনার বোধ জাগল এই পর্বের কোন কোন কবির কবিতায়, সমালোচনায়। চল্লিশের কবিদের জন্য রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর মানবিকতাবোধ, সমাজচৈতন্য এবং কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে গদ্য কবিতার উত্তরাধিকার। যে উপেক্ষার মধ্যে চল্লিশের শেষ বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তার থেকে তাঁকে সরিয়ে এনে উপলব্ধি করার বাস্তব প্রেরণা দেখা দিল পাঁচের দশকে বিশেষত ষাটের সূচনায়— রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর মুহূর্তকে উপলক্ষ্য করে। কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন— "বাংলা কবিতার একটা অংশ যখন মর্মত উত্তর রাবীন্দ্রিক হবার পথে চলেছে, তখন পঞ্চম দশকের কবিরা লিখতে শুরু করলেন।"[৬]

পঞ্চাশের কবিদের রচনায় একদিকে যেমন যন্ত্রণা, ক্ষোভ, হতাশার ক্রুদ্ধমূর্তিটিকে আমরা স্পষ্ট হতে দেখি, তেমনি রোমান্টিক লিরিকের পুনরুজ্জীবন এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিকে আমরা অনুভব করতে পারি। বিশেষত প্রেম ও বিরহভাবনায় রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতার উত্তরাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ। যেমন—

ক) "দুয়ার খুলে দাও, প্রহরী আছে তাড়া ?
হৃদয়ে ছিলে জেগে দেখে কি কালোমেঘে

উতলা হ'লো আজি শ্রাবণ-বারিধারা ?"

(দুয়ার খুলে দাও প্রহরী/ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

খ) "তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় নদীর কোনো নাম,
জীবন নয় পাহাড় থেকে এসে
দুঃখ পাওয়া আঘাতে আশ্লেষে
জীবন মানে আরো—
সোনার ফুল রাত্রিবেলা ঝরে
সকালবেলা তুমি আমার ঘরে;
তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় জীবন সংগ্রাম।"

(তোমাকে আমি/সদর স্ট্রীটের বারান্দা : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার নানা দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে আলোচ্য পর্বের কবিতাকে। হয়তো প্রত্যক্ষ প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কিন্তু, কবিতায় কিছু কিছু প্রসঙ্গ যেভাবে ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে, তাতে একথা কিছুতেই বলা যাবে না যে, রবীন্দ্রনাথ একালের কবিতা থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়েছেন। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যখন লিখেন— "রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড় জলপ্রপাত আমি/দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে বিনিয়ে,/ কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি/রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে।" (দৃশ্য কাব্য/যৌবন বাউল : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

রবীন্দ্র প্রভাবকে মর্মস্থ করে নিয়ে পঞ্চাশের যে কয়েক জন কবি সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বরমণ্ডল গড়ে তুলেছেন, তাঁদের অন্যতম কবি শঙ্খ ঘোষ। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ তিনি ব্যবহার করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে। 'মুক্তধারা' নাটকের একটি খণ্ডচিত্র ব্যবহৃত হতে দেখি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতায়'।

"দুপুরে বাতাস ভরা কেঁপে ওঠা অশ্বত্থের পাতা
যেমন নির্জন শব্দ তোলে
এখনো অম্বার সুর ততখানি ঝরে পড়ে 'সুমন, সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা।" (আরুণি উদ্দালক/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কিংবা তিনি যখন আরো লেখেন—

ক) "নষ্ট হয়ে যায় প্রভু, নষ্ট হয়ে যায়
ছিল, নেই মাত্র এই ইঁটের পাঁজায়

আগুন জ্বালায় রাত্রে দারুণ জ্বালায়
আর সব ধ্যান ধান নষ্ট হয়ে যায়।" (ইট/নিহিত পাতাল ছায়া)

খ) "সন্ধ্যেবেলা শুধু আমার
মুখের রঙে
ঝরে পড়ার ঝরে পড়ার
করে পড়ার শব্দ জানে তুমি আমার নষ্ট প্রভু!" (নষ্ট/নিহিত পাতাল ছায়া)

শঙ্খ ঘোষের এই ধরনের কবিতার স্পিরিট রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্বের ভাব সাদৃশ্যকে মনে করায়। এই পর্বেরই আর একজন কবি লিখেছেন— " ...লেখক যে যে কবিতায় প্রত্যক্ষ বা ঈষৎ পরোক্ষভাবে 'ঈশ্বর' বা 'প্রভু-র' সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন সেখানে তাঁকে অংশত রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী মনে হয়। অর্থাৎ খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য পর্বের রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী।"[৭]

আবার পঞ্চাশের কবিদের একটা বড়ো অংশ ঐতিহ্যকে আঘাত করতে চেয়েছেন জোর গলায়। তাঁদেরই একজনকে আমরা বলতে শুনেছি কবিতায়—

"নিকষবৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরেও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিনজোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয়
পাপোশে।"

(আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

কিন্তু তাঁদের রচনাতেও মাঝে মাঝে রোমান্টিক প্রেমাতুরতা প্রকাশ পেয়েছে, সে স্বপ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। যেমন, সুনীলেরই অন্য অনেক কবিতায়—

"তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি উড়ে যায়। স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ। স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্ণার শব্দ ওঠে। এও
স্বপ্ন—
টুনটুনি মল্লিকা ঝর্ণা-ধুল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা। আমি। দুঃখে সব স্বপ্ন হয়।"

(অরূপ রাজ্য : বন্দী, জেগে আছো)

কবি তারাপদ রায় যখন লেখেন তখন তাঁর শিল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ও গান যে এখনো তাঁদের মত, আধুনিকদের অনুপ্রাণিত করে তা বলা চলে—

ক) "অমলকুসুম তুমি অলকে দিয়ো না, ফুলদানিতে
বড় স্থির, বড় তুচ্ছ মনে হবে, ঈশ্বরের ছবি
তোমার সংসারে নেই-গৃহকোণে, অলিন্দে, সিঁড়িতে
কোথায় মেলাতে পারো বনস্মৃতি, শ্রাবণ সুরভি।"

(মৃণ্ময়ী : 'ছিলাম ভালবাসার নীলপতাকাতলে স্বাধীন'/তারাপদ রায়)

খ) "হায়! হায়!
আপনি সব জেনেশুনে আমাদের সর্বনাশ করে গেছেন,
যেদিকে তাকাই শুধু লিরিকের লতা
হাওয়ায় গড়িয়ে পড়ে . . . ।"

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি/তারাপদ রায়)।

ঠাট্টাছলে লেখা তারাপদ রায়ের আর একটি কবিতাতেও দেখি রবীন্দ্র অনুরাগ—

"ভাবতে গেলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়
প্রভু সরিয়ে নিন আপনার রচনাবলী,
পঁচাত্তর টাকায় ঘর ভরে গেলো।
ত্রিশ বছরই কাটতে চায় না,
আর আপনি শতবার্ষিকী পাড়ি দিয়েও
এখনো পাঁচসাত বছর দেখছি
বহাল তবিয়তে আছেন।
আমাদের কথা বলছি না,
কিন্তু প্রভু, আপনি, আপনি কি ক্লান্ত হন না ?"

(প্রভুর প্রতি/তারাপদ রায়)

রবীন্দ্রনাথ এখনো তাই বাঙালি কবির কাছে জাগ্রত অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের কবিতাতেও অনুরূপভাবেই জীবন্ত হয়ে আছেন তিনি। তাঁর মানবিকতার আবেদন, দেশপ্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি মমতা এ সমস্তই উজ্জীবিত করেছে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত কবিসম্প্রদায়কে। তার কিছু নিদর্শন—

ক) "আমার মননে/রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে/এবং মেলাই তাকে বাস্তবের
তুমুল রোদ্দুরে/আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।"
(ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ : নিজবাসভূমে/শামসুর রহমান)

খ) "শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা, ঠাকুর।"

(রবীন্দ্রনাথ : আল মাহমুদের কবিতা)

সব মিলিয়ে তাই বলা চলে, এখনো রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের বিশেষত বাংলা কবিতার অন্যতম অনুপ্রেরণা। তিনি জেগে আছেন বাঙালির প্রাণে, বাংলা কবিতার শিকড়ে। হয়তো খুব স্পষ্ট করে সর্বদা তাঁকে আমরা অনুভব করি না, কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে পেরিয়ে এসেছেন আধুনিক যুগের তরুণতর কবিসম্প্রদায়। বরং বিদেশী কবিদের কবিতার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাঁরা বৈচিত্র্য খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রজীবন এবং রবীন্দ্রশিল্পাদর্শ এখন বাঙালি শিল্প চেতনায় প্রায় সংস্কারের মতো দৃঢ়বদ্ধ, যদিও আপাত প্রচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে প্রায় সবচেয়ে নিকট আত্মীয় এবং সেই অর্থে সবচেয়ে জীবন্ত পুরাণ (Myth)। আর এই পুরাণের আশ্রয় নিতে বাধ্য নতুন যুগের মননশীল কবিবৃন্দ। জীবনানন্দ দাশ যথার্থই বলেছেন—

> "ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে ফিরে শেকস্‌পীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে— এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচার সাপেক্ষ বলে বোধহলেও অনেককাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হবে না— এই আমার মনে হয়।"[৮]

জীবনানন্দ এই মূল্যায়ন করেছিলেন আজ থেকে আশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। তারপর বাংলা কবিতার ইতিহাস নানা বিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে, নানা আলোড়নের মধ্য দিয়ে স্তর থেকে স্তরান্তরে এসে পৌঁছেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অমূলক বা অসঙ্গত প্রমাণিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক সপ্রাণ ঐতিহ্য।[৯]

তথ্যনির্দেশিকা

১. বিংশ শতকের চতুর্থ দশক প্রকৃতপক্ষে বাংলা আধুনিক কবিতার প্রথম দশক, এই দশকের যাঁদের আমরা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষ বলে জানি— "তাঁদের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল।"—অশ্রুকুমার শিকদার, আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, কলকাতা ১৩৯২, পৃ. ৯৫

২. কবিতার কথা, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৯

৩. "আধুনিক কবিতারূপ অসম্পূর্ণ ইমারতটি গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র কাব্যের ভিত্তির ওপরই ভর করে। এই কাব্যরুচি এবং জীবনবোধের মূল আশ্রয় হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ"—মণীন্দ্র রায়, রবীন্দ্রকাব্য আর আজকের বাংলা কবিতা, আধুনিকতা ও একালের বাংলা কবিতা, কলকাতা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৪

৪. ''Tendencies in Modern Bengali Poetry.'', Abu Sayeed Ayyub, Longmans Miscellany, Calcutta, 1943.

৫. "ঐ দশকের সারা বিশ্বেই প্রচণ্ড ক্রান্তিকারী সংঘাত চলেছিল, তাছাড়া সেই জাগতিক সংঘাতের অতিরিক্ত সংঘাত চলেছিল সারা ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বাংলা দেশের নিজস্ব বহ্নিময় অভিজ্ঞতায় মথিত হয়েছিল যাবতীয় সৎ বাঙালির ধ্যান-ধারণা। নবীন কবিরা এই যুগপৎ নিবিড় ও ব্যাপক সংঘাতে যে সাড়া দিয়েছিলেন, তার প্রচুর সাক্ষ্য মেলে ঐ দশকে প্রকাশিত কাব্যে।"—অমলেন্দু বসু, অরুণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন : চল্লিশ দশক, কলকাতা, ১৩৭৮ গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. গ

৬. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, আধুনিক কবিতার ইতিহাস, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পৃ. ১০৭

৭. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : নিহিত পাতাল ছায়া, সারস্বত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

৮. কবিতার কথা, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, পৃ. ২৬

৯. প্রসঙ্গত আরও একবার আধুনিক কবির স্বীকারোক্তি স্মরণ করা যেতে পারে— "আধুনিকতার ইতিহাসে কেউ রবীন্দ্রকীর্তিকে বাদ দিতে পারেন না, উত্তরাধিকারকে রূপান্তরিত করতে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন মাত্র। সেই উত্তরাধিকারের ইমারতে মহল অনেক এবং নিছক কাব্যের একটি মাত্র মহলও প্রায় অন্তহীন।" রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্য আধুনিকতার সমস্যা, বিষ্ণু দে, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৭৩-৭৪

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

সমর সেনের কবিতায় তেতাল্লিশের ছোঁয়া

ড. আশুতোষ বিশ্বাস

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ঘটে যায় সর্বনাশা মন্বন্তর। এক মন্বন্তরোত্তর সমীক্ষায় উঠে আসে তেতাল্লিশের এই দুর্ভিক্ষ নাকি পুরোটাই মানব-সৃষ্ট। ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্তের কথানুযায়ী— ''the famine was a man made famine''. অন্যান্য দুর্ভিক্ষ পর্যবেক্ষরাও বলেছেন বাংলায় খাদ্য-ঘাটতি একটু-আধটু ছিলই, কিন্তু তা দুর্ভিক্ষ হওয়ার মতো নয়। বাংলায় তিন সপ্তাহের মতো খাদ্য-ঘাটতি থাকার কথা ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। যুদ্ধের দিনগুলিতে ভারতকে চাল রপ্তানি করতে বাধ্য করানো হয়েছিল—মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার জন্য। ব্রিটিশরাজের ভ্রান্তনীতিগুলোর মধ্যে একটা ছিল—সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় দশজনের বেশি বহনযোগ্য নৌকা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। এর ফলে দুর্ভিক্ষের আগাম খবর পাওয়া সত্ত্বেও তা দূর করার জন্য তৎক্ষণাৎ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নি। উপকূলবর্তী এলাকায় দশজনের বেশি আরোহী বহনক্ষম নৌকাকে চলাচলের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার পেছনে ব্রিটিশরাজের যুক্তি ছিল— জাপান উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না, কারণ যুদ্ধ জাহাজ ঢুকলেই তা বোঝা যাবে আর সেদিকে কড়া নজর রাখা যাবে। এছাড়াও মিত্রশক্তির বিপুল সৈন্য সমাবেশ, বার্মার শরণার্থীর বিপুল অনুপ্রবেশ ১৯৪৩-এর বাংলায় দুর্ভিক্ষকে অনিবার্য করে তোলে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ খাদ্যাভাবে, অনাহারে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মারা গিয়েছিল। আর দুর্ভিক্ষের সুযোগে ব্ল্যাক-আউটের ভেতরে শহর, শহরতলিতে অমানবিক লোভী দালালেরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। নারীব্যবসা, মজুতদারী, চোরাকারবারী—অসাধু উপায়ে লাভ হাতিয়ে নেবার বীভৎস খেলায় সুবিধাভোগী মানুষেরা সেদিন মেতে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষের চরম দুর্দিনে বিপন্ন মানুষের পাশে সেদিন অবশ্য মার্ক্সবাদী প্রগতিশীল কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মানবতার শত্রুকে চিহ্নিত করে, তাদের মুখোশ খুলে দিতে কবি-শিল্পীরা এককাট্টা অবস্থানে স্থিত ছিলেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসক ৭ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে War cabinet Meeting করেছিল লন্ডনে। সেই মিটিং-র অত্যন্ত গোপন নথি থেকে জানা যায়— (Cabinet paper 65/36) আর্থার হারমান লিখেছেন যে, উইংস্টন চার্চিল পরোক্ষভাবে বাংলার এই দুর্ভিক্ষকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাইসরয় হিসেবে মার্শাল ওয়াভেলকে নিযুক্ত করেছিলেন উইংস্টন চার্চিল। ওয়াভেল প্রতি মুহূর্তে তার মিলিটারি বাহিনিকে খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের কাজে ব্যবহার করতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন, মানে তাকে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আসলে চার্চিল বাংলার বুকে নেমে আসা দুর্ভিক্ষকে লাঘব করার কাজে বিন্দুমাত্র সহায়ক ভূমিকা নেননি এবং কাউকে নিতেও দেন নি। বরং আমাদের বাংলাদেশ যখন দুর্ভিক্ষে ধুঁকছে, ঘরে ঘরে নিরন্ন মানুষের হাহাকার বাতাস মথিত করছে তখন চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য প্রকাশে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন। উপনিবেশের মানুষদের বলে যাচ্ছেন, যতটা সম্ভব তার চেয়েও বেশি দৃষ্টিপাত তারা করছেন বাংলার দুর্ভিক্ষ নিরসনে। ব্রিটিশরাজ নিজের মাতৃভূমিকে যেমন দেখে যেমন শুশ্রূষা দেয়, তেমনই দেখভাল করছে এই বাংলাকে। এবং হাস্যকর ভাবে তিনি আরো বলেন যে বাংলার এই দুর্ভিক্ষ কোনো মারাত্মক দুর্ভিক্ষ নয়। তার শোনা কথা অনুযায়ী যে তিন লক্ষ বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষে, অনাহারে মারা গেছে সেকথাও সত্য নয়। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি অন্যরূপ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী— দুর্ভিক্ষে সাত লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। এবং ১৯৪৩ সালে বাংলায় খুব ভালো শস্য উৎপাদিত হলেও অপ্রতিরোধ্য সাইক্লোনে প্রায় পাকা ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ''The starvation of anyhow underfed Bengalis is less serious than that of sturdy Greeks.''[১] আর এটাও ঠিক যে বাংলার এই দুর্ভিক্ষে বাংলার মানুষই বেশি মারা গিয়েছিল। ''Churchill's Secret War' (2011)[২] নামক একটি নতুন চাঞ্চল্যকর গ্রন্থে লেখিকা তথা সাংবাদিক মধুশ্রী মুখার্জি এক চাঞ্চল্যকর দাবি জনসমক্ষে এনেছেন যে দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে চার্চিলের গৃহীত নীতি ও শাসন প্রক্রিয়া বাংলার দুর্ভিক্ষকে আরো বেশি মারাত্মক পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ রাজত্বের অধ্যায়ে ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ একটি কলঙ্কময় অধ্যায়।[৩]

আর একটি মন্বন্তর-উত্তর সমীক্ষায় বলা হয়েছে— ''This was a unique femine caused by policy failure, instead of any moonsoon failure.''[৪] সমালোচকের এই বক্তব্য থেকে আমরা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সাক্ষ্য পাই। আমাদের বাংলার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও ১৯৪৩-এর বাংলায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হওয়ার পেছনের অনেকগুলি নির্ণায়ক কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি নিঃসংশয় চিত্তে বলেছেন দুর্ভিক্ষের সময় বাংলায় প্রচুর পরিমানে খাদ্যশস্য মজুত ছিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত

ভীতির আবহ, আর অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করা বা কিনে রাখার প্রবণতা অসাধু মজুতদার, ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। রাতারাতি খাদ্য শস্য কেনার লড়াইয়ে সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষদের সাধ থাকলেও তাদের সাধ্য তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার কারণেই দুর্ভিক্ষ তার সর্বগ্রাসী রূপ নিতে বেশি সময় নেয় নি। সাংবাদিক মধুশ্রী মুখার্জি লন্ডনে যুদ্ধকালিন ক্যাবিনেট মিটিং এ Winston Churchill-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যে বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে-চার্চিল এই দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলার মানুষদের তথা বাংলাকেই দায়ী করেছেন— "Churchill has been quoted as blaming the famine on the fact indians were 'breeding like rabbits'."[৫] অর্থাৎ এখানকার মানুষদের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে বাংলাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী আছে। আমাদের ঐতিহাসিকেরা সত্য কথা বলতে আগেও ভয় পাননি, এখনও পান না। তাঁরা নিঃসঙ্কোচে তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে এই দুর্ভিক্ষকে মানুষ্যসৃষ্ট বলেছেন বুক চিতিয়ে।

চারের দশকের তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'সালেমানের মা' (কবিতা), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কমিউনিস্টপন্থী কবি না হলেও তার 'চল্লিশের দিনগুলি' (কাব্যগ্রন্থ ১৯৯৪) কবিতায় তেতাল্লিশের ছায়া পড়েছে। দিনেশ দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, এমনকি জীবনানন্দ দাশের লেখনীতে এই দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানবাত্মার মর্মভেদী কান্নার কাব্যরূপ শোনা যায়—

"এখন টু শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়
সময়ের হাতে অন্তহীন।"[৬]

সমর সেনের 'তিন পুরুষ' কাব্যগ্রন্থে—'লোকের হাটে', 'জোয়ার ভাটা', 'বিকলন', 'গৃহস্থবিলাপ', 'সাফাই', '২২ শে জুন', 'স্ত্রোত্র' প্রভৃতি কবিতায় দুর্ভিক্ষের নিদাঘ যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় দুর্ভিক্ষ-জনিত কবি মনের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে। একজন বুদ্ধিজীবীসুলভ প্রত্যাশাহীন সংশয় কখনো পৌরাণিক অনুষঙ্গে, কখনো সরাসরি কূ-চক্রান্তকারী, ধূর্ত, মধ্যবিত্ত, বেনিয়াকে তীব্র কটুভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ঝালাপালা করে দিয়েছেন। এই সময়ের একজন বিশিষ্ট সমর সেনের সমালোচক তথা বিশিষ্ট একজন কবির লেখনিতে জানা যায়—

> "তিনপুরুষ"-এর প্রথম কবিতা 'একটি পুরনো কবিতা' কোনোদিনই 'সমর সেনের কবিতা'-য় জায়গা পায়নি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ যে চিঠি লিখেছিলেন সমর সেন তাতে ছিল একটি কবিতা, জানা যায় কবিতাটি

'দুর্দিন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রতিরোধ, শারদীয় ১৩৪৯'-এ। 'একটি পুরনো কবিতা' তারই পরিবর্তিত রূপ। অব্যবহিত পরের 'খোলা চিঠি'-তে কবিতাটি আসেনি। চিঠিতে সমর সেন যা লিখেছিলেন তা থেকে তাঁর দ্বিধা নজরে পড়ে খুব স্পষ্ট ভাবেই। তিনি লিখেছিলেন 'কবিতাটি কেমন হয়েছে জানি না, হয়ত বদরুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।' 'দুর্দিন'-এ ছিল খুব সরব ঘোষণা, যা সমর সেনের সঙ্গে মানানসই নয়। নাকি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি একটু ধাঁধায় পড়েছিলেন! শেষ পর্যন্ত 'তিনপুরুষ'-এ কবিতাটির ঠাঁই হলো, অনেক মেদ ঝরিয়ে। ছয় পঙক্তির প্রথম স্তবক পুরোটাই বাদ যায়, যেখানে ছিল কিছু বিবৃতি মাত্র। শেষ স্তবকের 'হিটলার, টোজোর এ গুপ্ত জাতভাই, এই প্রত্যক্ষ ভাষণ বদলে যায়, বদলে ঘুরে আসে আগের একটি পঙক্তিই, কবিতাটি সাময়িকতার চাপ কিছুটা কাটিয়ে ওঠে। তবু স্বস্তি পাননি, তাই 'সমর সেনের কবিতা' সংকলন করার সময় কবিতাটিকে নির্বাসনেই পাঠান।"[৭]

'তিনপুরুষ' কাব্যগ্রন্থের 'অকাল' নামের যে কবিতা ছিল, সেটিও 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে নাম ঈষৎ 'আকার'-এর পরিবর্তন সংগঠন করে করেছেন 'আকাল'। অবশ্যই তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের আভাস রাখার জন্য। আর 'আনন্দমঠ' নামে যে কবিতাটি আছে সেটির পূর্ব নাম ছিল 'বাবুবৃত্তান্ত'।

'নষ্টনীড়' কবিতার নাম ব্যঞ্জনায় আমাদের দেশ ও দশের 'নীড়' বা বাসা ভেঙে যাবার আভাস ভেসে ওঠে। আর সবই তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষজাত প্রত্যক্ষ ফলাফল। যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমাদের বাংলায় উৎপাদিত হয়, তাতে এদেশে মহামারি বা দুর্ভিক্ষ হবার কথা নয়, তবুও আখেরে আমাদের বাংলা দুর্ভিক্ষে কবলিত হয়। এর কারণ সহজেই অনুমেয়— আমাদের দেশে আসা এই দুর্ভিক্ষ মনুষ্যসৃষ্ট, কোনোভাবেই প্রাকৃতিক নয়। 'নষ্টনীড়' কবিতায় কবি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন—

"সূর্য ওঠে, হলুদ আলো সবুজ ধানে—
কিন্তু দুর্দিন এল, এ কী দুর্দিন এল।
… … …
শবাসনে তান্ত্রিকেরা স্তব্ধ,
দিনের ভাগাড়ে নামে রাত্রের শকুন।

নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে
রক্তমাখা হাড় দেখি সাজানো বাগানে।"[৮]

'জোয়ার ভাটা' কবিতায় দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাংলার ছবি সমর সেনের কবিতায় তির্যক ছায়া ফেলেছে। বৃষ্টিহীন উলঙ্গ প্রান্তর। রাখাল বালক নিজের অঙ্গনে সকাল সকাল ফিরে আসে। অন্ধকার ঘরে বসে লোকক্ষয়ের ধারাপাত—

"হেমন্তের প্রবীণ বিষন্নতা
দিনান্তের মাঠে, জনহীন গ্রামে
ভিটেতে ঘুঘু ডাকে;
চাষীরা পায়ে হেঁটে গেছে দূর দেশান্তরে
প্রাণের সন্ধানে নগরের প্রেতলোকে।
একটি গ্রাম্য কুকুর পড়ন্ত রোদে জল খুজে ধোঁকে,
... ...
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে।"[৯]

'লোকের হাটে'— কবিতায় লিখেছেন—

"কেটেছে দুবছর; সীমান্তে শত্রুর ছায়া,
বর্গী আর বুলবুলে খেয়ে গেছে ধান,
ঘোর জ্বরে মন্বন্তরে কেটেছে দুবছর;
এ দুবছর
পুষ্টিহীন চালের ছলনায় জীর্ণ হিন্দুস্থান
দেখেছে ভুতের নাচ, শুনেছে শকুন গান।"[১০]

সমর সেন তার কবিতায় দুর্ভিক্ষের খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন—উজাড় হওয়া গ্রামের ছবি, বাগানে রক্তমাখা হাড়ের ছবি, ফ্যান খুঁজে খুঁজে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে'-র করুণ ছবি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি এই সর্বগ্রাসী মানবাত্মার অভিশাপস্বরূপ দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেছেন ব্রিটিশরাজকে আর এর সাথে এদেশের হৃদয়হীন বেনিয়া মহাজন, মজুতদারী, কালোবাজারী, ফাটকাবাজদের। 'তিনপুরুষ' কাব্যগ্রন্থে সমর সেনের লেখার কাব্যছন্দের আঙ্গিক পরিবর্তনও আমরা খেয়াল করি। প্রাচীন বাংলার পয়ার-পাঁচালির ছন্দকে কবি তার বিদ্রুপের প্রকাশমাধ্যম ভাষা হিসেবে বেছে নিলেন, সচেতনভাবে। 'স্ত্রোত্র' কবিতায়—

"মহাজন গান গায়, নদারৎ ধান।
অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান।।
অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বর কথনে।
প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে।।"[১১]

"২২ শে জুন" কবিতায় উঠে এসেছে আমাদের দেশের বুকে সংঘটিত হয়ে যাওয়া

দুর্ভিক্ষের পরবর্তী অনুভব। ২২ শে জুন, ১৯৪৪ এই দিনটি ছিল অ্যাডলফ হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের দিন। এই দিনটিকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রাখার বাসনা যেমন এই কবিতানামের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ্যভূমিকা পেয়েছে— তেমনি আমাদের দেশের তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের ছায়াকেও অঙ্গীকৃত করে রাখা হয়েছে—

"গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই
কঙ্কাল ভরেছে দেশ।
এ রোদে সোনার ধান পোড়ে
মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।
কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার
দীর্ণ করে পৃথিবী আমার।
দেবতাকে গাল দিয়ে কলকাতায় ফিরি।"[১২]

সমর সেনের একান্ত মানবিক সহানুভূতিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের কথা কবিতায় বাঙ্ময় করেছেন সত্য— কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের পেছনে যে রাজনৈতিক ভণ্ডামি ছিল—তাকেও তিনি সরাসরি আক্রমণ করতে ছাড়েননি। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবি হৃদয় দিয়ে বুঝেছিলেন যে কতিপয় অর্থবান, পুঁজিপতি মানুষের নিজস্ব সুবিধার জন্য তারা যে সমাজকে তৈরি করেছে— সে সমাজ আসলে এক দুর্বল সমাজ। এই দুর্বল সমাজ ভেঙে গড়ে ওঠা নতুন সমাজের স্বপ্ন কবি দেখেছেন— এ নতুন সমাজ গঠন করবে সমাজের মেহনতি-খেটে খাওয়া মানুষই। আর এই সমাজে সেদিন স্বার্থপর সুবিধাবাদী, মধ্যবিত্তশ্রেণির বিলোপ ঘটবে। ইংরেজ শাসনে যে মধ্যবিত্তশ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল তা কিন্তু ইংরেজ সরকারেরই মদতে এবং আসলে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই ইংরেজ শাসকশ্রেণির মূল রক্ষক, অথচ তারা এই দেশেরই মানুষ। এ এক বড়ো ধরনের গদ্দারী। এই মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়কে সমর সেন ক্ষয়িষ্ণু বাবুসংস্কৃতির অংশ বলেই মনে করেন। আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই— সমর সেনের একটা আত্মজীবনীমূলক গদ্যগ্রন্থ রয়েছে 'বাবুবৃত্তান্ত' নামে, সেখানে দ্বিধাহীনভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণি সম্প্রদায়ের আত্মস্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মজার কথা সমর সেন কতটা সৎ, বিবেকী, বুদ্ধিজীবী যে তিনিও নিজেকে মধ্যবিত্ত বাবুসম্প্রদায়েরই একজন প্রতিভূ বলে মনে করেন এবং নিজেকেও তথা ব্যক্তি ও তাঁর কবিসত্তাকেও বিদ্রুপ করেন। 'বাবুবৃত্তান্ত' নামক কবিতায় (যদিও 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে বাবুবৃত্তান্ত নামটি পরিবর্তন হয়ে হয়েছিল 'আনন্দমঠ') বাবুসম্প্রদায়ের ভূমিকার কথা প্রকাশ করেছেন। 'আনন্দমঠ' নামে আমরা অবশ্যই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে সমর সেনের মৃদু কটাক্ষ অনুভব করি, সন্দেহ নেই। শূদ্র সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মশাস্ত্র পড়ে সময় কাটানো বাঙালি সমাজকে কবি ভালো চোখে দেখেন নি। এবং যখন

আমাদের এই ভারতবর্ষ মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল তখনও এই সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে বেদ, উপনিষদ শাস্ত্র পড়ে বৈষ্ণব সেজেছে, এই 'বৈষ্ণব সাজা' কথাটির মধ্যে আর যাইহোক ধর্মনিষ্ঠতা নেই, যেটুকু আছে তা হল ভন্ডামি। সব সময়ের জন্য সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কবি তাঁর ইন্টেলেকটুয়াল শব্দাঘাতে বার বার আঘাত করেছেন।

"ঘৃণ্য শূদ্র যত শত হস্ত দূরে রেখে
গৌরবে পড়েছি গীতাশ্রীমদ্ভাগবত,
দুর্দান্ত যবনকালে সেজেছি বৈষ্ণব।
ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এল; স্বাগতম।
পড়েছে মুসলমান, বন্দেমাতরম
ধ্বনি ওঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে,
যবন দুর্যোগ শেষে, আহা মরি, শ্বেতাঙ্গ সকাল!"[১৩]

সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও তার দ্বারা আক্রান্ত যে কাউকেই কবি সমর সেন ঘৃণাভরে তীব্র আক্রমণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে (১৮৮২), হিন্দুত্বের যে নব-উজ্জীবন ঘটেছিল তাকেও তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। সমর সেন নির্দ্বিধায় বলেন যে, 'আনন্দ মঠ' থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের... "কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অবনতি শুরু হয় আনন্দমঠ থেকে, কেননা তিনি তখন তাঁর ইংরেজ-ঘেষা রাজনীতির রূপ দিতে শুরু করেন সাহিত্যে। সে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান বিদ্বেষ (যবন বধের পর 'বন্দেমাতরম' গাওয়া হয়), ইংরেজদের সঙ্গে আপস এবং হিন্দুধর্ম সংস্কার ক'রে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করা।" 'আনন্দমঠ'-এ সন্ন্যাসীরাই তাদের আচরিত হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য যবন বা মুসলমান হত্যায় মেতে উঠেছিল, আর ইংরেজ শাসককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেই একইরকম ভূমিকা কবি অনুভব করেছিলেন, জাতীয়তাবাদী এদেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে। ১৯৪৪ থেকে ৪৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত চারটি কবিতার মধ্যে দেশভাগ আর সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কথা উদ্ভাসিত হয়েছিল। ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ কবিতায় সোভিয়েত রাশিয়া আর জাপান যুদ্ধের আসন্ন মুহূর্ত— "মেঘে মেঘে লাল ঝড়/বসন্তের বজ্রধ্বনি মাঞ্চুরিয়ায়", আর আমাদের মুলুকে তখন—"লাটের ভেলকিতে পরম শত্রু আজ দোস্তে পরিণত,/স্বজন শত্রুতে। এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা"। 'জয়হিন্দ' কবিতাতেও ভারতের রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির ছাপ—'ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন প্রায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের মিত্রশক্তি জাপানকে হারিয়ে ব্রিটিশ, ফরাসী আর ওলন্দাজরা উন্মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও এই দ্রোহ-সময়েই বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহের ফলে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) স্বাধীনতালাভের একটা প্রবল সম্ভাবনা উঁকি মেরে গিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

এই নৌবিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের তথা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে শত্রুর মতো কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে নির্দিষ্ট সীমারেখায় লাগাম দিতে না পারায়—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সেই মাহেন্দ্রক্ষণ চিরতরে বিনষ্ট হলো। কংগ্রেসের লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকাকেও কবি আক্রমণ করেছেন—

"বম্বেতে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ
রাস্তায় রক্তের ছিটে
বন্দুকের খরশব্দ থামলে শহরে
বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে,
সর্দারের ধমকে পার্কের রেলিং কাঁপে।"[১৪]

'জন্মদিনে' কবিতায় কবিচিত্তের আশাহত নির্যাস উৎসরিত হয়। যদিও কবি কখনোই বেশিমাত্রায় দেশভাগ নিয়ে চিন্তিত নন— তিনি বেশি চিন্তিত শোষণমুক্ত, সাধারণ মানুষের বাসযোগ্য এক পৃথিবীর জন্য। কাজের শেষে রাত্রিতে সুনিশ্চিত নিবিড় ঘুমে কবি যেতে চান। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সহমর্মিতায় একটা স্বাধীন স্বদেশ উপহার পাওয়ার আশায়, অনেক রক্তনদী সাঁতরেও শেষপর্যন্ত রাম-রহিম একে অন্যের বুকে অস্ত্র চালায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নগ্ন বীভৎস রূপে কবির স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। কবির শেষ প্রশান্তিবচন মুহূর্তে লীন হয়ে যায়। অনিবার্য মৃত্যুতে শেষ মিতালি হয়তো ইহলোক বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো 'লোক'-এ থাকে, সেখানে—

"মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে:
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।"[১৫]

আমাদের ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুর্ভাগা দেশ', কবিতায়— 'মৃত্যুমুখে চিতাভস্মে হতে হবে তোরে সবার সমান।' দুই দ্বৈরথকবি নিজের নিজের মত ও পথের মাধুকরি ওজস্বিতায় সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্ন পথের পথিক হলেও কিভাবে যেন তারা এই জায়গায় মিলে যান!

প্রসঙ্গ ও তথ্য নির্দেশ

১. "Hillsdale college" কৃত 'Charchill Project', April 8, 2015, "Did Churchill Cause the Bengal Fenie?" শিরোনামে লিখিত প্রজেক্ট রিপোর্টে এই তথ্য উপলব্ধ।

২. বিবিসি নিউজ ইন ইন্ডিয়া, আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা, SOUTIK BISWSA' র "Life and time in the world's largest democracy' নামক তাঁর Blog-এ এই তথ্য জ্ঞাপন করেছেন।

৩. Churchill's Secret War : লেখিকা মধুশ্রী মুখার্জি, প্রকাশকাল ২০১১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ শাসক ভারতের সর্বাত্মক ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে উইংস্টন চার্চিলের ভূমিকা নিয়ে এই গ্রন্থটি আলোকিত। চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তার কূটনৈতিক চাল চেলে আমেরিকার সঙ্গে সামঝোতা করে হিটলারকে দূরে সরাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে তিনি অবশ্যই বিগত শতাব্দীর একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কোনো সন্দেহ নেই। তিনি চরমভাবে তার উৎকর্ষ দেখিয়েছেন শাসনে ও কূটচাল প্রয়োগে। নাৎসি বাহিনির বর্বরতা পাশ কাটিয়ে গেলেও ভারত ভূ-খণ্ডে তিনি যে শাসন নিয়মাবলি গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মানবিক নানাবিধ কাজকর্মকে তিনি বিলোপ করে দিয়েছেন। বাংলাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিলেন। ১৯৪০-৪৪ সালের মধ্যে ভারতের প্রতি তার নেওয়া সমস্ত পরিকল্পনা ও নীতি আয়োগ একটাও মানবিকতার পথে যায় নি। এই দেশ থেকে খাদ্য শস্য ভাণ্ডারকে সব চালান করে দিয়েছেন ইংল্যান্ডে। এই দেশের কৃষি নির্ভর মানুষদের দিকে একবার ফিরেও তাকান নি। যুদ্ধের আবহে নিজের দেশের জনগণ ও মিত্র শক্তিকে খাবারের কমতি হতে দেন নি, কিন্তু যে দেশ থেকে খাবার চলে যাচ্ছে সে দেশটাও তার রাজত্বের সীমারেখায় পড়ে— এই বিষয়টি তিনি একবারের জন্য ভেবে দেখেন নি। আর এর ফলশ্রুতিতে ভারতে তথা বাংলায় নেমে আসে খাদ্যাভাব, মহামারি এবং দুর্ভিক্ষ। শাসক হিসেবে এই দেশের মানুষ যে তার মুখাপেক্ষী এই বোধহীনতা চার্চিলের সমস্ত কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। লেখিকা তথা সাংবাদিক মধুশ্রী মুখার্জী তার এই গ্রন্থে বাংলায় দুর্ভিক্ষের জন্য চার্চিলের ভুল রাষ্ট্রনীতিই যে দায়ী সে ব্যাপারে স্পষ্ট মত দান করেছেন, এবং নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সহযোগে তার যুক্তিটিকে প্রকট করেছেন। এই দুর্ভিক্ষ কোনোভাবেই প্রাকৃতিক নয়, বা চার্চিল কথিত ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো কোনো ঠুনকো কারণ নয়। বরং তিনি এই দুর্ভিক্ষকে বলতে চেয়েছেন যে এটা মারাত্মক কোনো বিষয় নয়। মধুশ্রী মুখার্জি তার এই গ্রন্থে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে তার মতকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর গ্রথিত করেছেন।

৪. Vimal Mishra, Associate Professor, Indian Institute of Technology, Gandhinagar.

৫. Churchill's Policies Contributed to 1943 Bengal Femine– Study', Michael Safi, 29th March, 2019, World news, The Gurdian.

৬. '১৯৪৬-৪৭', 'জীবনানন্দ দাশ', 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ', পৃ.২৪৬

৭. 'সমর সেনের কবিতা: গোধূলি প্রান্তরে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা', ইরাবান বসুরায়, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ- ১৩৩।

৮. 'নষ্টনীড়', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১২১

৯. 'জোয়ার ভাটা' 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১১৭

১০. 'লোকের হাট', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৩৬

১১. 'স্ত্রোত্র', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১১৯

১২. '২২ শে জুন', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১২৪

১৩. 'আনন্দমঠ', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১১৭

১৪. 'জয় হিন্দ', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৪০

১৫. 'জন্মদিনে', 'সমর সেন', 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, মে, ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৪২

গ্রন্থ সহায়তা

১. আইয়ুব, আবু সয়ীদ : 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৬৮

২. ত্রিপাঠী, দীপ্তি : 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পূনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৭

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত : 'বিষণ্ণতাবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', মার্চ ১৯৯৯, বিবেক ভারতী, কলকাতা।

৪. বসুরায়, ইরাবান : 'সমর সেনের কবিতা : গোধূলি প্রান্তরে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৯

৫. মিত্র, অশোক : 'কবিতা থেকে মিছিলে ও অন্যান্য প্রবন্ধ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪

৬. সেন, সমর : 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট প্রেস, প্রথম আনন্দ-সিগনেট সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২

৭. সেন, সমর : 'বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক', সম্পাদনা : পুলক চন্দ, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

৮. দাশ, জীবনানন্দ : 'কবিতার কথা', প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪২৪, প্রজ্ঞাবিকাশ,

কলকাতা, ১৩৬২

৯. দাশ, জীবনানন্দ : 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ', পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, সম্পা: দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়', ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩।

১০. দেব, সব্যসাচী এবং চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ (সম্পাদিত) : 'সংকলিত সমর সেন', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লে, কলকাতা, ১৯৯০

১১. সেন, সমর : 'কয়েকটি কবিতা', (সম্পাদনা : দেব, সব্যসাচী), তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, আগস্ট, ২০১২

১২. সেন, সমর : 'গ্রহণ', (সম্পাদনা : দেব, সব্যসাচী), তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, আগস্ট, ২০১২

১৩. সেন, সমর : 'নানাকথা', (সম্পাদনা : দেব, সব্যসাচী), তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, আগস্ট, ২০১২

১৪. সেন, সমর : 'খোলা চিঠি', (সম্পাদনা : দেব, সব্যসাচী), তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, আগস্ট, ২০১২

১৫. সেন, সমর : 'তিন পুরুষ', (সম্পাদনা : দেব, সব্যসাচী), তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, আগস্ট, ২০১২

১৬. সিকদার, অশ্রুকুমার : 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮১

১৭. সিকদার, অশ্রুকুমার : 'কবির কথা কবিতার কথা', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০

১৮. 'অনুষ্টুপ পত্রিকা', 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা', দ্বাবিংশবর্ষ : দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, (সম্পা), পুলক চন্দ, ১৯৮৮

১৯. 'অনুষ্টুপ পত্রিকা', 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা', দ্বাবিংশবর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, (সম্পা), অনিল আচার্য, ২০১৬

অন্তর্জাল

১. www.the gurdian.com/worldnews/mar/1209

১. www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/soutikbiswas/2010

১. https://winstonchurchill.hilsdale.edu

১. http://theprint.in/science/proved-by-science

১. www.bengalfemine1943, wikipedia

নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা কবিতা

প্রদীপকুমার পাত্র

নকশাল আন্দোলন হলো ভারতের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। ১৯৬৭ সালে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকায় সশস্ত্র কৃষকগণ, ধনী ও চা বাগানের মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি দখল করার জন্য লড়াই শুরু করে। এই বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন— চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সাধারণভাবে নকশালপন্থীরা সংগ্রামের চারটি কাঠামো উল্লেখ করেছিল। তারা মনে করত ভারতের জনগণের প্রধান শত্রু— ১. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ২. সোভিয়েত শোধনবাদ, ৩. জমিদার শ্রেণি, ৪. আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি। নকশালপন্থীদের মতে এই শ্রেণি শত্রুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্ছেদ করতে পারলেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অনিবার্য। সেজন্য তারা বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষক শ্রেণিকে বিপ্লবী ঘাটি হিসেবে প্রস্তুত করে। তাদের নীতি দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করতে গেলে গ্রাম দিয়ে শহরগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে। তারপর সেগুলো দখল করলে চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব হবে। এদের মতে সশস্ত্র সংগ্রামই বিপ্লবের একমাত্র পথ। কাজেই তারা সংসদীয় ব্যবস্থাকে বয়কটের আহ্বান জানায়। দেশের সক্রিয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে এদের অভিমত, তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা সোভিয়েত শোধনবাদ অথবা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগী। কাজেই এরা সকলেই বিপ্লবের শত্রু। আর এই বিপ্লবের শত্রু তথা শ্রেণিশত্রুকে শেষ করাই ছিল নকশালপন্থীদের মূল লক্ষ্য।

দেশের অগণিত তরুণ-তরুণী চলে আসে এই বিপ্লবীদের কাজে। এদের কাছে নেতারা নির্দেশ পাঠায়, তারা পুলিশকে হত্যা করে অস্ত্র সংগ্রহ করে। সরকারও নকশালদের মুক্তাঞ্চল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জোরদার অভিযানে নামে। উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ভয়াবহ সংঘর্ষ। এই একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি আর কালোবাজারির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে নকশাল নেতৃবর্গ মনে করেন জমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং এই সর্বাত্মক উদ্দীপনার মধ্যেই বিপ্লব সাফল্য লাভ করবে।

সংঘর্ষ, হিংসা, প্রতিহিংসা এবং দমনমূলক নীতির তাণ্ডবে চতুর্দিকে তখন এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। পুলিশি দমননীতির মাঝেও বিপ্লবীদের শ্রেণিশত্রু শেষ করার অভিযান চলতেই থাকে। হাজার হাজার তরতাজা তরুণ যুবক নিরুদ্দেশ হয় এবং অসংখ্য যুবক গ্রেপ্তার হয়। আবার জেলের ভিতর অনেক বিপ্লবীদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয়েও অনেক বিপ্লবী কর্মীর জীবনদীপ নিভে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— চারু মজুমদার, দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, মুরারি মুখোপাধ্যায় ও আশু মজুমদার প্রমুখ।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেখা যায় সমস্ত ভারতবর্ষে এ সময়ে বিভিন্ন নামে গণ-আন্দোলন, বিশেষত ছাত্র-যুবরা আন্দোলনে ফেটে পড়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্মের যুব সমাজ তথা ছাত্রসমাজ নিজেদের চাওয়া-পাওয়া আশা-হতাশা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিষয় এককথায় নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলো তারা নিজেদের মতো করে আদায় করতে চায়। তৎকালীন চারদিকে অর্থনৈতিক অসাম্য, সামাজিক অন্যায় অত্যাচার, রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা তাদের অর্থাৎ যুবসমাজ বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে অস্থির করে তুলেছিল। যৌবনের সৎ আদর্শবান আত্মদানের আবেগ ফেটে পড়েছিল এসবের বিরুদ্ধে। এই বিপুল ছাত্র যুব আন্দোলনের একটি ধারা নকশালবাড়ি আন্দোলনে যোগদান করেছিল। সংসদীয় রাজনীতির সুবিধাবাদ থেকে বেরিয়ে আসা শুধু নয়, এই আন্দোলন স্পষ্ট করেছিল আমাদের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোকে। চিনিয়ে দিল আমাদের সমাজব্যবস্থাকে। বুঝিয়ে দিল সংঘবদ্ধভাবে কৃষি বিপ্লবের গুরুত্ব। আর সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালো রাষ্ট্রশক্তিকে। নকশালবাড়ির আন্দোলন শুধুমাত্র বন্দুকের লড়াই নয়, ধ্যান-ধারণার লড়াইও বটে। তাই এই লড়াইকে দমন করার জন্য যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রশক্তির সংগঠিত বাহিনী।

সত্তরের দশকের এই টালমাটাল পরিস্থিতির বিষয়ে অনিল আচার্য 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় 'সত্তর দশক' নামক বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যায় বলেছেন— " ...সত্তর দশককে 'মুক্তির দশক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল প্রথমেই। শোষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখে কিছু মানুষ। আবার ভয় পেয়েছিল অন্যপক্ষ। এমন একটা টালমাটাল সময়ে সমাজতত্ত্ববিদ নানা চিন্তার ও চেতনার এবং প্রতিক্রিয়া সন্ধান পান। যদিও বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। কোন সাহিত্য সমালোচক যদি সন্ধান করেন তাহলে এই ব্রিটিশ জুতোর পালিশওয়ালা নেতিয়ে পড়া চাকর মধ্যবিত্ত আবার সেই অসম্মানের ইতিহাস ভেঙ্গে ফেলার জন্য উদগ্রীব একই শ্রেণির অপর অংশের সন্ধান পাবেন গল্পে-কবিতায়-উপন্যাসে। কেননা এই সত্তর দশকটা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্ম বিচারের দশক— আত্মসমীক্ষার দশকও। তাদের ন্যুব্জ চাকুরি মানসিকতাকে বসন্তের

একটি বজ্রনির্ঘোষ এমন কাঁপিয়ে দিতে পারে তারা ভাবেনি…"। নকশালবাড়ির মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটেছিল কৃষক বিদ্রোহ। যেমন— বীরভূম, খেলি, গোপীবল্লভপুর, লখিমপুর, শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নকশালবাড়ি আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনীতির ইতিহাসেই বিখ্যাত নয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলন শুধুমাত্র লড়াই নয় এর মধ্য দিয়ে মানুষের চৈতন্যের অন্তঃমূলে ঘা দিয়েছিল। এই আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে কালজয়ী উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনকেন্দ্রিক যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে তা কেবল রাজনৈতিক দলের নয়, বরং বলা যেতে পারে গুণগত মানের বিচারে তা কালজয়ী রূপ ধারণ করেছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার মধ্যে সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনকেন্দ্রিক রচিত সাহিত্য হিসেবে ছোটগল্প এক স্বতন্ত্র স্থান দখল করেছে। বিজিত ঘোষ 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' শিরোনামে পুনশ্চ থেকে একশ কুড়িটি গল্প প্রকাশ করেন। এছাড়া উক্ত আন্দোলনকেন্দ্রিক আরও নানান ছোটগল্প রয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার থেকে নাটকের আবেদন বেশি প্রকট। ফলে যেকোনো বিপ্লব ও আন্দোলনকে নাটকে বিষয়রূপে ব্যবহার করেন সাহিত্যিকেরা। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'চলো সাগরে' (জানুয়ারি ১৯৭০) নাটকের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে নকশালবাড়ির সশস্ত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া উৎপল দত্তের 'তীর' (প্রথম অভিনয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭), অনল গুপ্তের 'রক্তের রং' (১৯৬৮), মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'রণক্ষেত্র আছি' (ডিসেম্বর ১৯৭৬) প্রভৃতি নাটকগুলি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত।

তবে নকশালবাড়ি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে কবিতার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। কবিতা না বলা কথার অনেক কিছু প্রকাশ করে। মানুষের ভালোলাগা-মন্দলাগা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সাফল্য-ব্যর্থতা প্রত্যেকটি অনুভূতির মধ্যে কবিতার অবাধ যাতায়াত। কবিতা মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে বলেই সমাজের সামান্য অসঙ্গতিও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। সমাজের না বলা কথা কবির কলমের ডগায় ভর করে শব্দের মধ্যে দিয়ে সকলের সামনে প্রকাশিত হয়। সমাজের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সকলের সামনে বের করে আনেন কবিরা। নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই তা সাহিত্য-জগতে স্থান পেল। বিশেষ করে কবিতার জগতে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য কবির আবির্ভাব ঘটে এবং অগণিত কবি উক্ত আন্দোলনের

নানান দিক তাদের কাব্য-কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা হলেন— সরোজ দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, কমলেশ সেন, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সমীর রায়, অঞ্জন কর, সাগর চক্রবর্তী, সৃজন সেন, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দেব, রণজিৎ দাশ, রঞ্জিত গুপ্ত, কৌশিক ব্যানার্জী, বিপুল চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অরুণ মিত্র, মুরারি মুখোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ সিংহ, দ্রোণাচার্য ঘোষ, মৃদুল দাশগুপ্ত, সুশীল পাঁজা, নবারুণ ভট্টাচার্য, প্রবীর রায়, সুব্রত রুদ্র, দেবদাস আচার্য, সুব্রত সরকার, গৌতম চৌধুরী, ব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ।

নকশাল আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র কাব্য ধারার জন্ম দেয়। এই আন্দোলনের উর্বর ভূমিতে ফসল ফলিয়েছে অজস্র বাংলা কবিতার। নকশালবাড়ি আন্দোলন ১৯৬৭ সালের মে মাসে হলেও শুধু সত্তরের তরতাজা তরুণ-তরুণী বা কবি-সাহিত্যিকেরাই নন এই উত্থাল-পাথাল সময়স্রোতের আবর্তে আন্দোলিত হয়েছিল চল্লিশ থেকে ষাট-এর দশকের অনেক কবিও। চল্লিশের দশকের অন্যতম খ্যাতনামা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই সময়ের হত্যার চিত্র স্পষ্ট তুলে ধরেছেন—

"কেন না হত্যাই সত্য, হত্যা ধর্ম, কে মারে এবং কাকে মারে
এই নষ্ট চরিত্রের ভিড়ে কেউ নেই হিসেব নেবার।
শুধু হত্যা চাই।"

(নরক- ২: মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে)

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শক্তিমান কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় তাঁর প্রিয় ছাত্র তিমিরবরণ সিংহকে স্মরণ করেছেন—

"ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া ?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।'

(তিমির বিষয়ে দু-টুকরো (আন্দোলন); মুর্খ বড়ো, সামাজিক নয়)

নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ বাহিনী আন্দোলনকারীদের উপর গুলি ও লাঠির আঘাত করে। এর ফলে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী প্রাণ হারায়। একইভাবে কবি শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র তিমিরবরণ সিংহ মারা যান। কবি সেই প্রিয় ছাত্রের মৃত্যু উপলক্ষে উক্ত কবিতায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের আশ্চর্য

স্বরলিপি তুলে ধরেছেন—

"যখন দেখি, 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' তখন বুঝতে পারি
বিষয়টা সহজে যাবার নয়। কিংবা যখন দেখি অমুক-তমুক কে
ছারপোকা-মার্কা বাক্সে ভোট দিন, তখন বুঝতে পারি বাক্সের আড়ালে
মস্ত কলা এবং কৌশল আছে। অথবা যখন অধ্যয়ন করি
'এশিয়ার মুক্তি সূর্য জিন্দাবাদ' তখন রাস্তার মোড়ে একটা ভিখারীর
বাড়ানো-হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি এই দু'নম্বর মুক্তি সূর্যের দিকে—
ভুরু কুঁচকে তাকাই— ..."

(একটি শ্লোগান এর জন্য; গান্ধীনগরে রাত্রি)

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও আদতে তা হয়ে উঠেছে ক্ষমতার হস্তান্তর। 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' বিষয়টা অত সোজা নয় কারণ 'ছারপোকা-মার্কা বাক্সে' ভোট দিয়ে আমরা ক্ষমতা তুলে দিই কোনো এক ব্যক্তির হাতে যে তার গলদ ফায়দা লুটে। 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য জিন্দাবাদ' মন্তব্যটি করে ভিখারির ভিক্ষার বাড়ানো হাত সরিয়ে আমরা " ...এই দু'নম্বর মুক্তি সূর্যের দিকে/ভুরু কুঁচকে তাকাই" অর্থাৎ আমরা বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হই।

সত্তরের নকশালবাড়ি আন্দোলন কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যকে যে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল তা তার সাক্ষাৎকার থেকে প্রমাণিত হয়। 'কোরক' সংকলনে জানুয়ারি ২০১৪ তে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে কবি বলেছেন— "সত্তরের দশক সম্পূর্ণভাবে চল্লিশ থেকে আলাদা। এ এক উচ্চারণের সময়, কবিতা লিখতে লিখতে তরুণরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।" (শব্দ-শাব্দিক; এপ্রিল জুন ১৯৮৮) মণিভূষণ ভট্টাচার্য "গান্ধীনগরে এক রাত্রি" কবিতায় দেখিয়েছেন যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমকালীন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য। উক্ত কবিতাটির শেষাংশে কবি বলেছেন—

"অধ্যাপক বলেছিলো, 'দ্যাটস রঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে ?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিই নি শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখো'
চটকলের ছকু মিঞা, 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামী ও .সি .কে।'
উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারে সেই ডানপিটে তেজী রক্তধারা
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।"

উপরি-উক্ত কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য সমকালচিত্র তুলে ধরেছেন।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম শহীদ কবি দ্রোণাচার্য ঘোষের ছবি সত্তরের দশকের কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'জলপাই কাঠের এসরাজ' কাব্যের 'এল পার্টিডো কমিউনিস্টরা' কবিতায় এঁকেছেন। কবি লিখেছেন—

"তারা ঘুমায়, বুকের ক্ষতে এদেশে ভারতবর্ষ আঁকা
জাগে হাজার, জালে কোথায় রাক্ষস প্রাণ ভোমর রাখা
পায়ের উপর শব্দ পায়ের
হারিয়ে যাওয়া সেই যে ভাইয়ের
একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে
চৈত্র আসে রক্তস্রোতের পলাশ শিমুল আর অশোকের।"

অন্যদিকে মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'জলপাই কাঠের এসরাজ' কাব্যগ্রন্থের 'আগামী' কবিতায় স্পষ্টভাবে বলেছেন—

"ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্ধু নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ!
ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ"

কবি মৃদুল দাশগুপ্ত উপরোক্ত অংশে ইতিহাসের পুনরুসন্ধান করেছেন। জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে হত্যাকান্ড হয়েছিল তাতে মারা গিয়েছিল অগণিত মানুষ। তেমনি নকশাল আন্দোলনকে দমানোর জন্য পুলিশ বাহিনী গুলি চালায় যাতে কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ মারা যান। কবি মৃদুল দাশগুপ্তের 'আগামী' কবিতায় শুধু একজন দ্রোণাচার্য ঘোষের কথা বলেননি। উক্ত কবিতায় দ্রোণাচার্য ঘোষ হলেন সমগ্র শহীদদের প্রতিনিধি। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'জলপাই কাঠের এসরাজ' কাব্যের 'মুক্ত মানুষের পদ্য' কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা অন্যদিকে পূর্বপুরুষ নিয়ে গর্ববোধ—

"আমি বাখরগঞ্জ, গৈলাগ্রামের, আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে
লিখেছিলেন মনসামঙ্গল"

এরপর কবি সত্তরের নকশাল আন্দোলনের পটভূমি কবিতায় ফুটিয়ে তুলে নিজ মনের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন—

''গরল আমি ডরাই না হে
বিশ্বে আমি ভয় পাই না
আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি।''

সত্তরের দশকের অন্যতম শক্তিশালী কবি সুশীল পাঁজা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে মুরালি মুখোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ সিংহ, দ্রোণাচার্য ঘোষ প্রমুখ কবিদের প্রতি আর্তি প্রকাশ করেছেন। উক্ত কবিরা নকশালবাড়ি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন। কবি লিখেছেন—

''অনির্বাণের দিদির চিঠি পাই
তেসরা জুনের বিষণ্ণ বিকেলে '
তোমার বন্ধু আর নেই
পয়লা মে'র ভোর রাতে
প্রেসিডেন্সি জেলে—
পুলিশ রিপোর্ট সাংঘাতিক ভেদ বমিতে!
ওর জীবন সাথী অরুণা অর্ধ উন্মাদ
নিশ্চয় একদিন এসো . . .''

(প্রেসিডেন্সি জেলে রক্তাক্ত দেহ অনির্বাণ)

সত্তরের দশকের কবি সৃজন সেনের কবিতার মধ্য দিয়ে সমকাললগ্নতা ও স্বপ্ন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবি বলেছেন—

''তুমি তোমার দু'চোখ ভরে আগুন ধরে রাখো
হৃদয় পূর্ণ করে রাখো প্রবল ঘৃণা
বীজ ও মাটি শস্য দিয়ে যাচাই করে দেখো
প্রেমিক আমার বলবে তুমি দেশপ্রেমিক বিনা ?''

(অনুরোধ; থানা গারদ থেকে মা-কে)

উপরোক্ত কবিতায় কবি দু'চোখে আগুন এবং হৃদয় কলসে ঘৃণা ভরতে আসে না বললেও বীজ ও মাটির প্রসঙ্গ এনেছেন। এর মধ্য দিয়ে তার স্বপ্ন ও বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটেছে। অন্যদিকে কবি সৃজন সেন তাঁর 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় বিপ্লব ও প্রেমকে এক ছাদের তলায়

দাঁড় করিয়েছেন। কবি বলেছেন—

"আর যদি শোনো—
শত্রুর উদ্ধত বেয়োনেটের সামনে দাঁড়িয়ে
আত্মসমর্পণ না করার অপরাধে একটি সীসার গোলক
এক ঝলক রক্ত ঢেলে কাউকে বিদ্ধ করেছে
তবে মনে মনে বলো— একদিন তাকে তুমি ভালবেসে ছিলে।"

অর্থাৎ কবি 'প্রিয়তমাসু' কবিতার মধ্য দিয়ে প্রেমের জয়গান করেছেন। কবি বলেছেন যে, যতই আমরা কাল সংকটে পড়ি তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে প্রেম অপরাজেয় থাকবে।

সত্তরের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি সুব্রত রুদ্রের কবিতায় ফুটে উঠেছে অপ্রাপ্তির বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস। নকশালবাড়ি আন্দোলন দমন করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে যে অত্যাচার চালায় তার একটা দিক কবি সুব্রত রুদ্রের কবিতায় ফুটে উঠেছে। ইতিহাস যে সবসময় অতীতের সত্যকথা বলেনা তার একটা দিক তাঁর কবিতায় পাই—

"সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে
লড়াই
নীল বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বিদ্রোহ, বিদ্রোহ,
সলাপুর কমিউন, তেলেঙ্গানা নকশালবাড়ি

এদেশের সব ভুল
ভুল ইতিহাস লেখা হয়েছে এত কাল।" (স্বাধীনতা; শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সত্তরের দশকের কবি দেবদাস আচার্য তাঁর 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি' কাব্যের 'ঝড় : সত্তর দশক' কবিতায় নকশাল আন্দোলনের দামামার শব্দ শোনা যায়। কবি উক্ত কবিতায় বলেছেন— "তখন গামবুট পায়ে বিপ্লবী গেরিলার মতো মেঘ নেমে আসে" এখানেই শেষ নয় কবি আরও বলেছেন—

"পৃথিবীর খুব কাছে, প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায়
তখন বুলকের বুকের লোমে হাওয়া লাগে।"

'মেঘ নেমে আসে' অর্থাৎ কবি এখানে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বলতে চেয়েছেন যা 'পৃথিবীর খুব কাছে' অর্থাৎ বাস্তব পরিবেশে জনসম্মুখে চলে আসে। এই দুর্বিষহ পরিবেশ

থেকে কোনো ব্যক্তি বাদ যাবে না। কবি বলেছেন " ...প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায়/তখন টু লোকের বুকের লোমে হাওয়া লাগে।"

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ও সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্য হলেন সত্তরের দশকের অন্যতম খ্যাতনামা কবি। কবি নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর কবিতার মধ্যে একাধারে মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, অন্যদিকে মানবতার চূড়ান্ত অসম্মান এই দু'য়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট তবে তা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। কবি তাঁর 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কবিতায় বলেছেন—

"এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না
এই জল্লাদের উল্লাস আমার দেশ না
এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না
এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না"

কবি কবিতার মধ্যে দিয়ে জোরালোভাবে নিজের দেশকে দেশ বলে অস্বীকার করেছেন। কবির কাছে দেশ হল প্রেম-ভালোবাসার আবাসভূমি। কবি তাই দেশ বলতে 'মৃত্যু উপত্যকা', 'জল্লাদের উল্লাস', 'রক্তস্নাত কসাইখানা' এবং 'বিস্তীর্ণ শ্মশান'কে মেনে নিতে পারেননি। কবি নবারুণ ভট্টাচার্য নকশাল আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি পুলিশ বাহিনীর মধ্য দিয়ে যে রক্ত প্রবাহিত করে তারই একটি খণ্ডচিত্র উক্ত কবিতায় এঁকেছেন। কবি কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তাই তিনি বলেছেন—

"আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব
বুকের মধ্যে টেনে নেব কুয়াশায় ভেজা কাশ বিকেল ও ভাসান
সমস্ত শরীর ঘিরে জোনাকি না পাহাড়ে পাহাড়ে জুম
অগণিত হৃদয় শস্য রূপকথা ফুল নারী নদী
প্রতিটি শহীদের নামে এক একটি তারকা'র নাম দেব ইচ্ছামতো।"

কবি আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছেন যে 'মৃত্যু উপত্যকা', 'বিস্তীর্ণ শ্মশান' এই দেশ তাঁর দেশ নয়, তাঁর যে দেশ ছিল তা তিনি জোর করে ফিরিয়ে আনবেন। সেই দেশে 'জল্লাদের উল্লাস' বা 'রক্তস্নাত কসাইখানা' থাকবে না, থাকবে 'কুয়াশায় ভেজা কাশ বিকেল' জোনাকি, 'ফুল নারী নদী' অর্থাৎ রূপকথার রাজ্য বা শান্তির আবাসভূমি। কবি আরও বলেছেন আকাশের তারার নাম কোনো মনীষীর নামে না রেখে নকশাল আন্দোলনের শহীদদের নামে দেবেন। নকশাল আন্দোলনের ফলে আন্দোলনকারীরা মুষ্টিমেয় মনীষীদের মূর্তি ভেঙে দিয়ে নিজেদের সংগ্রামী নেতাদের মূর্তি স্থাপন করেছিল। তা আবার আমরা 'প্রতিটি

শহীদের নামে এক একটি তারকার নাম দেব ইচ্ছামতো' পঙক্তির মাধ্যমে পাই।

কবি নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কাব্যের 'একটি ফুলকির জন্য' কবিতায় নকশাল আন্দোলনের যেন একটা পূর্বাভাস দিয়েছেন। কবি বলেছেন—

"একটা ব্যথা বর্শা হয়ে মৌচাকেতে বিঁধবে কবে
সারা শহর রক্ত লহর, আশ মিটিয়ে যুদ্ধ হবে।"

এখানে মৌচাক বলতে কবি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত শোধনবাদ, জমিদার শ্রেণি, আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত ভোট সর্বস্ব রাজনীতির দ্বারা নির্মিত এক অরাজকতা পূর্ণ আবাসভূমির কথা বলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে বর্শা হলো এই অরাজকতাকে শোধন করার জন্য যুব শক্তি দ্বারা গঠিত আন্দোলন। এই দু'য়ের যোগাযোগে এক ভয়াবহ দুর্বিষহ আন্দোলন সৃষ্টি হয় যার নাম নকশালবাড়ি আন্দোলন। যুদ্ধ কেমন হবে ? তার একটি আগাম বার্তা তুলে ধরেছেন কবি—

"একটা কুঁড়ি বারুদ গন্ধে মাতাল করে ফুটবে কবে
সারা শহর উথাল পাথাল, ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে।"

এই আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের একটি ধারা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী প্রমুখ মনীষীদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে এবং তার জায়গায় সিধু, কানহু, তিতুমীর এর মূর্তি স্থাপন করছে। কেননা আন্দোলনকারীদের বিশ্বাস বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী প্রমুখ মনীষীদের মূর্তির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকতা প্রকাশ পায়। তাই তারা সেগুলি সমূলে ধ্বংস করতে চায় এবং তার জায়গায় স্থাপন করে সিধু, কানু, বিরসা মুন্ডা, তিতুমীর এর মত বীরদের, যারা ইংরেজ সরকার দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এ প্রসঙ্গে অমিত ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে, "মূর্তি ভাঙ্গার আন্দোলন, জাতীয় নেতা, বিশেষতঃ গান্ধী বা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নেতাদের মূর্তি ভাঙা, বা মুখে কালি বোলানোর মতো বহু ঘটনা বিভিন্ন এলাকায় ঘটেছে। কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগরের মূর্তি, যার সামনে থেকে এখন অনেক প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয়ে থাকে সেই মূর্তি বহুবার কালিমালিপ্ত হয়েছে"। এই মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গ কবি নবারুণ ভট্টাচার্য 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সেখানে কবি বলেছেন— "প্রতিটি শহীদের নামে এক একটি তারকার নাম দেবো ইচ্ছে মতো" অন্যদিকে ব্রত চক্রবর্তী তাঁর "জীবন দেখায়" কাব্যের "বৃত্তের ভেতর" কবিতায় মূর্তি ভাঙার একটা আভাস দিয়েছেন। কবি বলেছেন—

"ভাবমূর্তি নষ্ট হবার ভয়ে মূর্তি ভাঙিনি কোনোদিন,
কিন্তু জানবার লোভে, নিজেকে ভেঙেছি অজস্রবার।"

এই অংশে কবি বলতে চেয়েছেন নকশাল আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি ভেঙেছে ঠিকই তবে নিজেদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাননি। ভাবমূর্তি বলতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। ভাবমূর্তি নষ্ট হলে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনকারীরা যে শুধু অস্ত্রের লড়াই করেনি, তারা চৈতন্যের জাগরণ ঘটিয়েছেন তাও কবি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন—

"কিন্তু জানবার লোভে, নিজেকে ভেঙেছি অজস্রবার।"

নকশালবাড়ি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে পঞ্চকবির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন— দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, মুরালি মুখোপাধ্যায় ও আশু মজুমদার। ২৫ জুলাই ১৯৭১ সালে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে মুরারি মুখোপাধ্যায়কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আবার ২৬ নভেম্বর ১৯৭১ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে খুন হন অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ সংহ, দ্রোণাচার্য ঘোষ এবং আশু মজুমদার।

কিশোর বয়স থেকেই দ্রোণাচার্য ঘোষ ছিলেন সংগ্রাম ও কবিতায় সমর্থিত প্রাণ। তাঁর কবিতা জোতদার ও জমিদারদের কাছে চোখের বালিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি মনে করতেন সশস্ত্র সংগ্রামই মুক্তির একমাত্র পথ। তাই তিনি কবিতায় বলেছেন—

"মুঠিতে নিশান জ্বলে, মেহনতী মানুষের রক্তের অক্ষরে
লেখা হয় ইতিহাস, অমর উজ্জ্বল ইতিহাস,
লেখা হয় দৃপ্ত এক মুক্তির শরীর।"

(আমাদের রাস্তাগুলো; গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা ও দিনলিপি)

ইতিহাস কথাটির অর্থ হল অতীতের কথা। ইতিহাস গ্রন্থে অতীতের বিভিন্ন জয়-পরাজয় বর্ণিত হয়। তবে গ্রন্থটির গঠন প্রকৃতিতে রাজা রাজড়াদের উল্লেখ থাকলেও এর ভেতরে মেহনতী বা শ্রমজীবী মানুষের চোরাস্রোত প্রবাহিত হয়। কবি কবিতাটির মধ্যে যেন সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। কবি আবার বলেছেন—

"যা ছিল পুরনো কথা পরিত্যক্ত সেসব এখন
গভীর বিশ্বাসে জলে সশস্ত্র বিপ্লব
মুক্তি এই এক পথে অন্য কোন শব্দ নেই বুকের ভেতর।"

(দ্রোণাচার্য ঘোষ, আমাদের রাস্তাগুলো; গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা ও দিনলিপি)

ইতিহাস যে অতীতের কথা ব্যক্ত করে বর্তমানে সেই কথা পরিত্যাগ করে, নকশাল আন্দোলন তথা বর্তমান রাজনীতির টালমাটাল পরিবেশের মোকাবিলা করার জন্য বা মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম তা থাকবে। কবির প্রগাঢ় বিশ্বাস রাজনীতির এই অস্থির পরিবেশ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার কথা বলেছেন।

ষাট ও সত্তর দশকের অস্থির টালমাটাল রাজনীতির কথা অমর কবি দ্রোণাচার্য ঘোষের কবিতায় পাই।

"আমাদের জন্মে শুধু অবিরাম শোষণের গ্লানি:
এখন সময় নেই চপল ছাপায় ব'সে গল্পের আসর
এখন সময় নেই পান করি অসহায় চরিত্রের মদ;
তীক্ষ্ণ বুলেটের মুখে বস্তুত এখন প্রয়োজন
শ্রেণীশত্রু নিধনের কঠিন কঠোর এক দৃঢ় সংগঠন।"

(দ্রোণাচার্য ঘোষ, বস্তুত এখন প্রয়োজন, গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা ও দিনলিপি)

কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ এক সংগঠন চেয়েছেন যারা বুলেটের মধ্য দিয়ে শ্রেণিশত্রু নিধন করবে। অর্থাৎ কবি শ্রেণিশত্রুকে শেষ করে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করতে চেয়েছেন।

ষাটের দশকের কবি কমলেশ সেন কবিতার সময়কে চিত্ররূপে তুলে ধরেছেন। তিনি যেন কবিতার মধ্যে সময়কে ধারাভাষ্যকার রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"এক লক্ষ
এক লক্ষ সজ্জিত মানুষ
উত্তরের পলাশ ফোটা মাঠে
তাদের,
তাদের বুকের আগুন
নিঙরিয়ে নিঙরিয়ে
স্তূপাকার করছে।"

(কমলেশ সেন, এক লক্ষ সজ্জিত মানুষ উত্তরের মাঠে, সজ্জিত মানুষ)

উপরোক্ত কবিতায় কবি সময়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেন এক তারে বেঁধেছেন। "তাদের বুকের আগুন/নিঙরিয়ে নিঙরিয়ে/স্তূপাকার করছে।" অর্থাৎ সমকালনগ্নতা ভিত্তিক অস্থির পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের মনে যে দুর্বিষহ জ্বালা-যন্ত্রণা ও তা থেকে পরিণত হয়েছে

'তাদের বুকের আগুন' এই আগুন তারা 'নিঙরিয়ে নিঙরিয়ে/স্তূপাকার করছে'। অর্থাৎ সমস্ত আগুন বা উত্তেজনা দিয়ে তারা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কবি কমলেশ সেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে এইভাবে সময়কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমকাললগ্নতার সঙ্গে মানুষের চৈতন্যের পরিবর্তন দেখিয়েছেন।

চরমপন্থী আর নয়া সংশোধনবাদের দ্বান্দ্বিক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা এই জটিল সময়ের কথা আমরা সৃজন সেনের কবিতায় পাই। তাঁর 'থানা গারদ থেকে মাকে' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতায় কবি বলেছেন—

"ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুখতে চায় কোন আহাম্মকের দল ?
মেহনতী মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামকে রোধ করতে
কোন হিটলার আজ কলকাতার রাস্তায় ?
শোষিতের প্রতিটি ঘর আজ বিপ্লবের দুর্গ
শোষিতের প্রতিটি হাতে আজ লাল পতাকার উল্লাস,
বন্দুকের বদলে বন্দুক ধারণ করে
শোষিতের রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে
প্রতিটি বুকে আজ সূর্য প্রতিজ্ঞা।"

উপরোক্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি সৃজন সেন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর কথায় শোষিত শ্রেণি আজ কোন কিছু মুখ বুঝে সহ্য করবে না। তারা হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ চায়। তারা এখন বন্দুকের বদলে বন্দুক দিয়ে লড়াই করতে চায়। শোষিত বা মেহনতী মানুষেরা আজ নিদেদের অধিকার আদায়ে বদ্ধপরিকর। তাঁরা নিজেদের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিজেরাই অর্জন করতে সূর্য-এর মত জোরালো প্রতিজ্ঞা করেছে। অন্যদিকে, কবি সৃজন সেন বামপন্থী মতাদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। এমনকি তাদের 'লাল পতাকার উল্লাস' দেখতে পেয়েছে। উক্ত কবিতাটি সমাকাললগ্নতার পরিচয় বহন করেছে। সে সময়ে বামপন্থী দলের যে বিপুল উত্তেজনা বা জোরালো উত্থান ঘটেছিল তা তাঁর কবিতায় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

নকশালবাদী কবিদের কবিতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাঁরা কাব্যচর্চায় আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়কেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই পর্বের কবিদের কবিতায় হতাশার ছবি তেমন নেই আছে যন্ত্রণার গোঙানি। নকশালবাড়ি কবিদের কবিতাও সেই সঙ্গে সত্তর দশকের কবিতা প্রসঙ্গে নির্মল ঘোষ তাঁর "নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে বলেছেন— "আমরা এমন পড়তে চাই যাতে ধরা পড়বে শোষণের আসল স্বরূপ, যে

কবিতা পড়ে অনুপ্রেরণা পাবেন লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ এবং যে কবিতা প্রকৃতই হবে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামী হাতিয়ার। আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন কবিতা হলো এমন একটা জিনিস যা ঠিক স্লোগান নয়। আমাদের বক্তব্য হলো কবিতার বিষয় ও কবিতার আঙ্গিক এই দুটোর মধ্যে আগে বিষয়, পরে আঙ্গিক। বক্তব্যকে সাধারণের উপযোগী করে বলার জন্য কবিতা যদি কারুর কাছে স্লোগান বলে মনে হয় তবে সেই শ্লোগান হলো সত্তরের দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা।" কোনো কবি যখন তার বক্তব্য বিষয় সরাসরি এবং সাধারণ ভাব ব্যক্ত করেন তখন তাঁর কবিতা স্লোগানধর্মীতা লাভ করে। তবে নকশালবাদী কবিরা তাঁদের কবিতা শ্লোগানধর্মী করেননি। তাঁরা শোষকের সঙ্গে শোষিতের লড়াই, সাধারণ মানুষের অধিকারের দাবি প্রভৃতি বিষয় কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কেবল ষাট-সত্তর দশকের কবিদের কবিতায় পাওয়া যায় এমন নয় পরবর্তী দশকের অর্থাৎ আশি-নব্বই দশকের কবিরা উক্ত বিষয় অবলম্বনে কবিতা রচনা করেছেন। তাছাড়া একুশ শতকের কবিরা আবার অনেকেই তাঁদের কবিতা রচনার বিষয় হিসাবে নকশাল আন্দোলনকে বেছে নিয়েছেন। এই দিক দিয়ে দেখলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নির্মল ঘোষ; নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য; করুণা প্রকাশনী; কলকাতা; তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৬।

২. ফটিকচাঁদ ঘোষ; নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কবিতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; কলকাতা; ২০১৬

৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত; জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর; পার্ল পাবলিশার্স; কলকাতা, মে ১৯৯৭।

৪. অনিল আচার্য; সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড); অনুষ্টুপ; কলকাতা; ১৯৮২।

৫. আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত); আধুনিক কবিতার ইতিহাস; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ; মাঘ ১৪১৭।

বর্তমান সময়ে সংস্কৃতবিদ্যার আবশ্যকতা : অথর্ববেদ

ড. বিপুল চন্দ্র বেপারী

সারাংশ : সম্-কৃ+ক্ত কর্মণি= সংস্কৃত। সম্পরিভ্যাং করতৌ ভূষণে (অ. ৬/১/১৩৭) ইতি স্যুট্। পাণিনি প্রভৃতিভিঃ বৈয়াকরণৈঃ ভূষিতং পরিশোধিতং চ যৎ তদেব সংস্কৃতম্ অন্যৎ তু প্রাকৃতমিত্যাদিকম্। বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃতভাষার এই দুটি রূপ। বৈদিক সংস্কৃত তথা বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিষ্ণাত হয়ে প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালের সংস্কৃত প্রেমী মানুষ সংস্কৃতে অবগাহনের দ্বারা জীবনের নবসংস্কার সাধন করেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বেদ। "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ঠ পরিহারয়োরলৌকিকমু-পায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।" বেদ হল জ্ঞান, পরমজ্ঞান। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" —অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, বেদের এই দুটি অংশ। শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। একে ত্রয়ীবিদ্যাও বলা হয়। ঋক্, সাম ও যজুঃ— এই তিন বেদকে নিয়ে ত্রয়ী বিদ্যা। তবে অথর্ববেদও ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্গত। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরস।' আর্যসভ্যতার অগ্রগতির অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল অথর্ববেদ। অথর্ববেদকালীন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি পরিবার প্রথা। বৈদিকসাহিত্য তথা বৈদিক আর্যদের দৈহিক রীতিনীতি, ভাবধারা এবং বর্তমানকালের মানবের জীবনকেও সংস্কৃতায়ণে সংস্কৃত করার মূল আকর অথর্ববেদ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পাশাপাশি এখান থেকে লৌকিক ধর্মের পরিচয়ও মানুষ পেতে পারে। তবে অথর্ববেদে ধর্মবিশ্বাস ও সমাজজীবনের প্রতিফলন থাকলেও মানবজীবনের সরল ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্রও কিন্তু অথর্ববেদ। প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতির পাশাপাশি বর্তমানকালীন লৌকিক সংস্কৃতিরও অপরিহার্য দলিল অথর্ববেদ। অপর তিন বেদ থেকে অথর্ববেদের জনপ্রিয়তা অধিক পরিমাণে, কারণ অথর্বমন্ত্রগুলিতে মানব হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ, যাদুবিদ্যা, রাজার আচরণীয় কর্ম, মারণ, উচাটন প্রভৃতি বিদ্যা অথর্ববেদ থেকে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। চরক ও সুশ্রুত অথর্ববেদ থেকেই আকর গ্রহণ করে তাদের শাস্ত্রকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তাই অবলীলায় বলা যায়, গৃহ্যসূত্রের জনক হল অথর্ববেদ। সকল মানবের দৈহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধনের মূল

আকর অথর্ববেদ। রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গ্রামীণজীবনের সকলপ্রকার দুঃখ-কষ্ট নিবারণের মূল উৎস অথর্ববেদ।

মূলশব্দ : সংস্কৃতায়ন, ইষ্টপ্রাপ্তি, অপৌরুষেয়, ব্রহ্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, পরমজ্ঞান, শ্রবণবিধৃত, স্মৃতিসঞ্চিত, অথর্বাঙ্গিরস, ব্রহ্মবেদ, রসায়ন, অভিষ্টপ্রাপ্তি, দেবস্তুতি, প্রতিষেধক, মন্ত্রশক্তি, আয়ুষ্যমন্ত্র, ঐশ্বর্যলাভ, মুক্তি, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি।

ভূমিকা : সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতা সর্বজনবিদিত। এই সংস্কৃত ভাষা সংস্কার করা ভাষা। সম্- কৃ + ক্ত কর্মণি = সংস্কৃত। সম্পরিভ্যাং করতৌ ভূষণে (৬/১/১৩৭) ইতি স্যুট্। পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণৈঃ ভূষিতং পরিশোধিতং চ যৎ তদেব সংস্কৃতম্ অন্যৎ তু প্রাকৃতমিত্যাদিকম্।সংস্কৃতভাষার দুটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমাবস্থায় যে রূপটি বিদ্যমান ছিল সেটি হল বৈদিক সংস্কৃত এবং পরে যে রূপটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তা হল ধ্রুপদী সংস্কৃত। বৈদিক সংস্কৃত শিক্ষায় তথা বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিষ্ণাত হয়ে প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের সংস্কৃতপ্রেমী মানুষ সংস্কৃতে অবগাহনের দ্বারা জীবনের নবসংস্কার সাধন করেছে। বৈদিক সংস্কৃতে সংস্কৃতায়ন না হলে মানব তার জীবনের উৎকর্ষতায় কখনোই পৌঁছতে পারবে না।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বেদ। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব জাতি ধর্মার্থ, কাম মোক্ষের সন্ধান 'বেদ' নামক অলৌকিক জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। আচার্য সায়ণ বেদভাষ্যে বলেছেন— "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।" বেদই ভারতবর্ষের মানবের চিরন্তন মর্মবাণী। মনুর ভাষায়— "বেদ: অখিলধর্মমূলম্।" ভারতভূমির সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম, সকল কর্মের মীমাংসা, সকল জ্ঞানের পরিণতি স্বরূপ শাস্ত্র বেদ। বেদ শাস্ত্র "সর্বজন সুখায়, সর্বজন হিতায়।" সকল মানব পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকলের কল্যাণের জন্য বেদ শাস্ত্রই একমাত্র পাথেয়। ইহলোক ও পরলোকের অমৃতস্বরূপ হল বেদ। বেদ নিত্য, স্বতসিদ্ধ, অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘ্য। বেদ সনাতন ও অপৌরুষেয়। বেদ সূর্যালোকের মতো স্বয়ং স্বপ্রকাশ ও পরব্রহ্মের নিশ্বাসস্বরূপ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদেতদৃগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরসঃ।" বিশ্বকবির ভাষায়— "যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো, তা কবির আয়ত্বের অতীত।"

বেদ + অচ্ = বেদঃ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, পরমজ্ঞান। প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি জ্ঞান পার্থিব জ্ঞান। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। এতদ্ভিন্ন অতিন্দ্রিয় পরমজ্ঞান 'বেদ' থেকে লভ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়— "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে। এণং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"

ব্রহ্মতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুতিবচন হল বেদ। বেদের দুটি অংশ— মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদকে ত্রয়ীবিদ্যাও বলা হয়। প্রচলিত মতে, ঋক্, সাম ও যজুঃ ত্রয়ীর অন্তর্গত। তবে ত্রয়ী কথায় অথর্ববেদও বোধ্য। কেন-না, অথর্ববেদের মন্ত্র লক্ষণ ঐ তিন বেদের মন্ত্র লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, আলাদা নয়। যাইহোক, ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মতো অথর্ববেদের মূল্যও কোনো অংশে কম নয়। অনেকে অথর্ববেদের অস্তিত্বের প্রমাণ সাপেক্ষে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের একটি মন্ত্রের উপস্থাপনা করেছেন— "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত।।" বিরাট পুরুষের আদি যজ্ঞ থেকে ঋক্, সাম ও যজুঃ উৎপন্ন হলেও অনেকে 'ছন্দাংসি' শব্দে অথর্ববেদকে বুঝেছেন। সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ সনৎকুমারকে তাঁর অধীতশাস্ত্রের ও বিদ্যার নাম কীর্ত্তণের মধ্যেও অথর্ববেদের নাম জানা যায়— ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদং অথর্বানমিতিহাসপুরাণম্...। শুক্লযজুর্বেদে তিনবার অথর্ববেদের উল্লেখ আছে— "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশেসিতমেতৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথরর্বাঙ্গিরসঃ। যাহোক্, ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মতো অথর্ববেদের মূল্যও কোনো অংশে কম নয় একথা সর্বজন বিদিত।

অথর্বাঙ্গিরস : 'অথর্বাঙ্গিরস্' হল অথর্ববেদের প্রাচীন নাম। অথর্ব ও আঙ্গিরস্ শব্দ দুটি মিলে 'অথর্বাঙ্গিরস্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রাচীনকালে 'অথর্বন্' শব্দের দ্বারা একশ্রেণির অগ্নি উপাসককে এবং 'আঙ্গিরস্' শব্দের দ্বারা প্রাচীন অগ্নি যাজক সম্প্রদায়কে বোঝাতো।

অথর্বাঙ্গিরস্ শব্দার্থ : 'অথর্ব' শব্দে ভেষজবিদ্যা, শান্তি ও পৌষ্টিকাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া এবং 'আঙ্গিরস্' শব্দে শত্রুবধাদিকারক মারণ ও উচাটনমূলক অমঙ্গল, অভিচার ক্রিয়াকে বোঝায়। 'ভৃগ্বাঙ্গিরস্' ও 'ব্রহ্মবেদ' বলেও অথর্ববেদ পরিচিত। অথর্ববেদে কুড়িটি কাণ্ড, আটত্রিশটি প্রপাঠক, নব্বইটি অনুবাক্, সাতশ একত্রিশটি সূক্ত বা ছয়হাজার মন্ত্র আছে।

অথর্ববেদের সমাজ : আর্যসভ্যতার অগ্রগতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিল অথর্ববেদ। অথর্ববেদকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পরিবার প্রথা, বিবাহ ছিল সমাজীবনের এক পবিত্রতম অনুষ্ঠান। যজ্ঞকর্মে স্ত্রী স্বামীকে সর্বদা সহায়তা করতেন। দাম্পত্যজীবন ছিল খুবই উন্নত। অথর্ববেদে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যা থেকে পুত্রসন্তান লাভের বাসনা প্রকট ছিল। যা বর্তমান সমাজেও প্রচলিত। অথর্ববেদের সময়ে অতিথির বিশেষ সমাদর ছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতি : চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বেশি ছিল। অভিচার বিদ্যায় ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। বেশভূষা, বিলাসদ্রব্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট চেতনা ছিল। বিভিন্ন মন্ত্র

থেকে স্নান, অনুলেপন, অঙ্গসজ্জা ও গন্ধদ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারীদের কেশপ্রসাধন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষ-নারী উভয়ই অন্তর্বাস পরতেন। ব্রীহি, ধান, দুধ ছিল সেই যুগের প্রধান খাদ্য। কৃষি ও পশুপালন উন্নত ছিল। বয়নশিল্প ছিল বিশেষ উন্নত। আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল সঙ্গীত ও নৃত্য। শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টি ছিল বিশেষ উন্নত। শাস্ত্র ও বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রাধান্য ছিল।

জ্যোতি-রসায়নাদি বিজ্ঞান : অথর্ববেদের সমাজ জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। আথর্বন্ পুরোহিত ছিল ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। শারীরবিদ্যার অঙ্গরূপে অস্থিবিদ্যা ও লতাগুল্মের ব্যবহার করতেন।

গৃহ্যসূত্রের উৎস : অথর্ববেদে চিকিৎসা, ঔষধিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষিক গণনায় সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল। এছাড়াও ছিল তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজাল, কুহক ও অভিচারকর্মের প্রাধান্য। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতিচর্চ্চার পথিকৃৎ ছিল অথর্ববেদ। যার পূর্ণাঙ্গরূপ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। অথর্ববেদে ধর্মার্থকামমোক্ষকে গৃহ্যসূত্রের উৎস বলা হয়েছে।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব : আর্য-অনার্যশক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ যেমন আর্য সভ্যতা বিস্তারের একটি দিক, তেমনি অনার্য-আর্য সম্পর্কের ফলে আর্য সংস্কৃতির উপর অনার্য সংস্কৃতির প্রভাবও একটি বিশেষ দিক। অনার্যজাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের যে প্রচলন ছিল, অথর্ববেদোক্ত মারণ-উচাটন-বশীকরণাদি কুহকবিদ্যার মধ্যেও তার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। অথর্বসংহিতায় তন্ত্রবিদ্যা ও যোগরহস্যের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো, যা আজও প্রবহমান।

জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক ভাবনা : হিন্দুদের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা অথর্ববেদে প্রতিফলিত। এই সংহতির ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তমসূক্তে কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরাদির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। অথর্ববেদীয় পুরোহিত ইতিহাস, পুরাণ ও গাথার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এগুলি পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির অগ্রদূত ছিল। পরবর্তীকালের ক্ষত্রিয়প্রধান গ্রন্থগুলিতে যেভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেখা যায়, তার মূল উৎস অথর্ববেদীয় পুরোহিত পরম্পরা।

দার্শনিক প্রভাব : ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি বিকাশে অথর্ববেদের দান অসীম। উপনিষদ্‌যুগের চিন্তাধারায় যে দার্শনিক প্রভাব, তার সূচনা অথর্ববেদ। Shende-এর ভাষায়— ''The Philosophical thoughts in the A.V. Fall Midway between the Sacrificial Brahmana of the Upanisada.'' অথর্ববেদে মৃত্যু, স্বর্গ, অমৃতত্ত্ব, ব্রহ্মচর্য, কাল, সত্য, ঋত, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সম্পর্কে যেমন অপূর্ব আলোচনা আছে, তেমনি আছে অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও প্রশ্নোপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ আলোচনা।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাবগম্ভীর ও সাধনমার্গের আলোচনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল, যা প্রবহমান ধারায় আজও বয়ে চলেছে।

ব্যাধি ও প্রতিষেধক : ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদে চিকিৎসক, চিকিৎসা ও ব্যাধির উল্লেখ পাওয়া গেলেও ভারতীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। অথর্ববেদে বহু প্রকার ব্যাধির উল্লেখের পাশাপাশি তার প্রতিষেধক হিসেবে বিবিধ লতা, গুল্ম ও বৃক্ষের নাম পাওয়া যায়। কোনো কোনো রিষ্টিশান্তি মন্ত্রে রোগনিবারক ভৈষজ্য লতাগুল্মের স্তুতিও শোনা যায়। অগ্নি ও জলকে দেবতা ও ব্যাধিনাশক পদার্থরূপে স্তুতি করা হয়েছে এই বেদে। Nature Cure অর্থাৎ প্রাকৃতিক চিকিৎসার উৎসও অথর্ববেদ।

ভৈষজ্যমন্ত্র : অথর্ববেদে দেবস্তুতি থাকলেও পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারই এখানে মুখ্য বিষয়। এই বেদের ভৈষজ্যমন্ত্র অভিষ্টপ্রাপ্তি ও ব্যাধি নিবারণের জন্য উপাদেয়। ঋষিগণ রোগব্যাধির জন্য নেপথ্যে বিশেষ বিশেষ অসুর বা দানবের কল্পনা করে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তা দূর করতে চাইতেন। বর্তমানকালেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদে জ্বরকে বলা হোত জ্বরাসুর বা তক্মন। ঋষির ভাষায়—

"অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়নগ্নিগিরি বা ভিদুন্নন্।

অধাহি তরমন্নর সো হি ভূয়া অধান্যঙ্ভূধরাং বা পরেহি।।"

হে অসুর, তুমি মানুষদের জ্বলন্ত অগ্নির মতো সন্তাপিত কর এবং তাদের শরীর রক্তশূন্য করে পীতবর্ণে পরিণত কর। হে জ্বর, তুমি অধোগামী ও অক্ষম হও এবং এ রাজ্য থেকে দূর হয়ে পাতালে প্রবেশ কর অথবা বিনষ্ট হও। ঋষির এই যে আকুতি যা বর্তমানকালের মানুষও অবলীলায় গ্রহণ করেছে।

লতাগুল্ম ও জল : অথর্ববেদে মন্ত্রশক্তিযুক্ত লতাগুল্ম ও জলকে ভেষজ হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন ছিল। বর্তমানকালের মানুষও অথর্ববেদীয় এই ভেষজ ব্যবহার করে নানা ব্যাধি থেকে চিরমুক্তি লাভ করেছে। ভেষজের এই ব্যবহার ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিমরূপ। অথর্ববেদে জলকে আপদেবতা হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে—

"শং নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।

শং যোরভি স্রবন্তু নঃ।।"

অর্থাৎ জলদেবতাগণ যজ্ঞের জন্য সুখকর হোন, পানের উপযোগী হোন এবং মঙ্গলদায়ক হয়ে আমাদের প্রতি ক্ষরিত হোন।

রোগাদি ও প্রতিষেধক : অথর্ববেদে জ্বর, অশ্মরীরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শূলযন্ত্রণা, উদরীরোগ,

চক্ষুরোগ, ব্রণ, বাত, কুষ্ঠ, কৃমি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের উল্লেখের পাশাপাশি প্রতিষেধকেরও উল্লেখ আছে। অথর্ববেদীয় এই সকল প্রতিষেধকাদি প্রয়োগে বর্তমানকালের মানুষও যথেষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে। অথর্ববেদে এক একটি রোগকে রাক্ষসরূপে কল্পনা করে তার হাত থেকে নিস্তারণেরও ব্যবস্থা আছে। ঋষির ভাষায়—

"তপনো অস্মি পিশাচানাং ব্যাঘ্রো গোমতামিব।

শ্বানঃ সিংহমিব দৃষ্টা তে ন বিন্দন্তে ন্যঞ্চনম্।।"

অর্থাৎ গোহিংসক বাঘ যেমন গবাদিযুক্ত ব্যক্তির দুঃখদায়ক হয়, সেরূপ আমি মন্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসদের তাপক হয়েছি। আরও বলেছেন—

"যং গ্রামমাবিশত ইদমুগ্রং সহো মম।

পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি ন পাপমুপজানতে।।"

শল্য ও অস্থিবিদ্যা : ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদে ব্যাধি ও চিকিৎসার উল্লেখ থাকলেও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভৈষজ্যবিদ্যার ব্যাপক প্রসারের বিষয় অথর্ববেদেই প্রথম পাওয়া যায়। বর্তমানকালের যে শল্যবিদ্যা বা Surgery এবং অস্থিবিদ্যা বা Osteology-র প্রধান আকর অথর্ববেদ। অথর্ববেদের সময়েও যে শল্যবিদ্যা ও অস্থিবিদ্যা উন্নত ছিল তার প্রমাণ মেলে। ঋষির ভাষায়—

"লোম লোম্না সংকল্পয়া ত্বচা সংকল্পয়া ত্বচম্।

অসৃক্তে অস্থি রোহতু বিচ্ছিন্নং সং ধেহ্যোষধে।।"

অর্থাৎ হে ভৈষজ্যগুল্ম, তুমি কেশের সঙ্গে কেশ এবং ত্বকের সঙ্গে ত্বক্ সংযুক্ত কর। অস্থি ও শোণিত সবল হোক, ভগ্ন অংশ তুমি যুক্ত কর।

আয়ুষ্যমন্ত্র : অথর্ববেদে দীর্ঘজীবন ও সুন্দর স্বাস্থ্যলাভের জন্য আয়ুষ্যমন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়ুষ্যমন্ত্র পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে যা জাতকর্ম, উপনয়ন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। এরকম ব্যবহার অথর্ববেদের যুগেও বর্তমান ছিল। ঋষির ভাষায়—

"যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।।

যথা সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।।

যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।।"

অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক যেমন ভীত হয়না, বিনষ্টও হয় না, সেরূপ হে প্রাণ, তুমি অভয় হও। যেরূপ সূর্য ও চন্দ্র ভয় পায়না বা বিনষ্ট হয় না। সেরূপ হে প্রাণ, তুমি নির্ভয় হও। সত্য ও মিথ্যা যেমন ভয় পায় না, ক্ষয়ও পায় না, সেরূপ হে প্রাণ, তুমি অভয় হও।

পৌষ্টিকমন্ত্র : অথর্ববেদে কৃষক, বণিক ও পশুপালকদের সমৃদ্ধি ও সাফল্য লাভের জন্য যেমন মন্ত্র আছে, তেমন আছে দস্যু ও তস্কর বিতাড়ণের জন্য পৌষ্টিকমন্ত্র। এছাড়াও আছে ক্ষেত্রবর্ষণ, শস্যরক্ষা, শস্যবৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ, গবাদিপশুর মঙ্গলের জন্য মন্ত্র। বর্তমানকালেও মানুষ এসকলগুলো অনুকূলে পাবার আশে নানারকম যজ্ঞক্রিয়া করে থাকে, যার মূল আকর অথর্ববেদ।

রোগারোগ্যাদি ও ঐশ্বর্যলাভের মন্ত্র : অথর্ববেদে রোগারোগ্য, আয়ু ও ঐশ্বর্যলাভের মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়। বজ্রপাত ও অগ্নিদাহ থেকে গৃহরক্ষার জন্য জল, বায়ু, অরণ্যের পুষ্টিসাধনের জন্য, সর্বপ্রকার বিপদ নিবারণের জন্য, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ত্রুটিবিচ্যুতিজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, পারিবারিক অশান্তি ও মনোমালিন্য দূর করার জন্য নানাবিধ মন্ত্রে সমৃদ্ধ সূক্ত আছে। বর্তমানকালের মানুষও অথর্ববেদীয় এই সকল মন্ত্রের সফল প্রয়োগের দ্বারা নিজের জীবন সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ঋষির ভাষায়—

"সহৃদয়ং সংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোন্যমভিহর্যত বৎসং জাতমিবঘ্ন্যা।।"

"অনুব্রতঃ পিতুহ পুত্রো মাতা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচাং বদতু শান্তিবাম্।।"

অভিচার ও অভিচারক্রিয়াদির নিষ্কৃতির মন্ত্র : অথর্ববেদে অভিচার মন্ত্রের প্রাধান্য সবচেয়ে অধিক। অভিচার কথার অর্থ "শত্রুমারণানুকুলব্যাপার।" শত্রু, সর্প, ভূতপ্রেতাদির উপদ্রব নিবারণের মন্ত্র অভিচারমন্ত্রের অন্তর্গত। অভিচার মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি অঙ্গিরা। বর্তমানকালে জ্যোতিষশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে দুঃস্বপ্ন অশুভ প্রভাবকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে অবিচার মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। অভিচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়ও অথর্ববেদে আছে। যাদুকরের যাদুপ্রদর্শনীতে মায়ার প্রভাব ও শত্রুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত অভিচারক্রিয়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার মন্ত্রের উৎসও অথর্ববেদ।

মুক্তির মন্ত্র : অথর্ববেদে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির মন্ত্র দেখা যায়। বর্তমানকালেও যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই সকল মন্ত্র প্রয়োগ করে অভিশাপাদি প্রয়োক্তারকে পুনরায় অভিশাপ ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।

যাদুমন্ত্র : বর্তমানকালের যাদুমন্ত্রের প্রকট ব্যবহারের উৎস অথর্ববেদ। অতীতকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালেও দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যেও যাদুমন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বরুণসূক্ত তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋষির ভাষায়—

"সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী ন মিনোতি তানি।।
যে তে পাসা বরুণ সন্তপ্তা ত্রেদা তিষ্টন্তি বিশিতা রুষন্তঃ।
ছিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু।।
শতেন পাশৈরভি ধেহি বরুণৈনং মা তে মোচ্যনৃতবাঙ্নৃচক্ষঃ।
আস্তাং জাল্ম উদরং শ্রংসয়িত্বা কোশ ইবাবন্ধঃ পরিকৃত্যমানঃ।।"

রাজাদির নিরাপত্তা ও উন্নতির মন্ত্র : বর্তমানকালে রাজার নিরাপত্তা ও উন্নতিসাধনের জন্য যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার ঘটানো হয়, তার মূল উৎস অথর্ববেদ। রাজপুরোহিতগণ বর্তমানকালের মতো প্রাচীনকালেও রাজার সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকতেন।

ক্ষাত্রবেদ : রাজপুরোহিত রাজার নির্বাচন, অভিষেক, শক্তি সমৃদ্ধি, রাজ্যরক্ষা, শত্রুদমন, যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে রক্ষা করা, রাজার আধ্যাত্মিক শুভাশুভ সকল ব্যাপারে যে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন, তা অথর্ববেদ থেকে জানা যায়। তাই অথর্ববেদের অপর নাম 'ক্ষাত্রবেদ'।

বিবাহাদি প্রেমমূলক মন্ত্র : অথর্ববেদে নারীদের নানাবিধ কামনাপূর্তির অনুষ্ঠান, মনোমত পতিলাভ, সুখপ্রসব, সন্তানলাভ, গর্ভরক্ষা, স্বামী সন্তানের মঙ্গলকামনা, বিবাহ ও প্রেমমূলক মন্ত্র পাওয়া যায়। বর্তমানকালেও যার ব্যবহার চলমান। ঋষির ভাষায়—

"স্বপ্ত মাতা স্বপ্ত পিতা স্বপ্ত শ্বা স্বপ্ত বিশ্পতিঃ।
স্বপন্তস্যৈ জ্ঞাতয় স্বপ্তয়মভিতো জনঃ।।"

ঈর্ষা থেকে নিষ্কৃতির মন্ত্র : অথর্ববেদে সপত্নীবিনাশ, সপত্নীর আকর্ষণ থেকে পতিকে রক্ষা অথবা স্বামীর ঈর্ষামূলক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্র আছে। যার প্রয়োগমূলক ব্যবহার বর্তমানকালেও অবিরাম ধারায় বহমান। বর্তমানকালে যাকে আমরা 'বাণ' মারা বলি, এই শিক্ষা অথর্ববেদীয় শিক্ষা। ঋষির ভাষায়—

"দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনুশোচতু।
বস্যাস্যৈ মিত্রাবরুণৌ হৃদশ্চিত্তান্যস্যতম্।
অথৈনামক্রতুং কৃত্বা মমেব কৃণুতং বশে।।"

অর্থাৎ হে দেবগণ, ঐ পুরুষের চিত্তে কামনা প্রেরণ করুন। আমার প্রতি প্রেমাবেগ আর চিত্তে আপ্লুত হোক। তেমনি আছে পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য মন্ত্র। ঋষির ভাষায়—

"এষা তে রাজন্ কন্যা বধূর্নির্ধূয়তাং জম।

সা মাতুর্বধ্যতাং গৃহেহথো ব্রাতুরথো পিতুঃ।।"

গীতি কবিতার উৎস : নীরস গীতিকবিতার নিদর্শন অথর্ববেদ থেকে পাওয়া গেলেও বর্তমানকালের সরস গীতিকবিতার উৎসও অথর্ববেদ। অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তের পৃথিবী স্বতন্ত্রভাবেই মহীয়সী কিন্তু ঋগ্বেদে পৃথিবীর মহিমা দ্যৌস্পিতার সঙ্গে সংযুক্ত। অথর্ববেদের পৃথিবী ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রী। ঋষির ভাষায়—

"সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষাতপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী।

সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।।"

ক্রান্তদর্শী ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবী আমাদের মাতা, তিনি কল্যাণকারিণী। "ভূমো মাতুর্নিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।"

যজ্ঞীয় মন্ত্র : ঋগ্বেগের মতো যজ্ঞসম্বন্ধীয় কিছু মন্ত্র অথর্ববেদে পাওয়া যায়। ষোড়শ কাণ্ড-এ পবিত্রতাবিষয়ক জলের মহিমা বর্ণনায় যে গদ্যমন্ত্র পাওয়া যায়, তা যজুর্বেদীয় গদ্যমন্ত্রের সমতুল্য। এছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ামূলক সূক্ত, সোমযাগের বিষয়ও অথর্ববেদে দেখা যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়কাদি মন্ত্র : অথর্ববেদে সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক সূক্ত, দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ সূক্তগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। অথর্ববেদের অপর নাম ব্রহ্মবেদ। এখানকার মূল আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। এছাড়া ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তের তুলনায় অথর্ববেদের দর্শনতত্ত্ব আরো বেশি রহস্যময়। দেহের সৃষ্টিকল্পনায় কাল এক বিশেষ তত্ত্ব। কালই সৃষ্টির উৎস ও নিলয়। তিনি সর্বেশ্বর। কাল থেকেই দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের উৎপত্তি। কালেই ব্রহ্ম সমাহিত এবং কালের গর্ভেই আছে অমৃতত্ত্ব। ঋষির ভাষায়—

"কালে তপঃকালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।

কালে হি সর্বেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতিঃ।।"

উপসংহার : বৈদিকসাহিত্য তথা বৈদিক আর্যদের দৈহিক রীতিনীতি, ভাবধারা এবং বর্তমানকালের মানবের জীবনকেও সংস্কৃতায়ণে সংস্কৃত করার মূল আকর অথর্ববেদ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পাশাপাশি এখান থেকে লৌকিক ধর্মের পরিচয়ও মানুষ পেতে পারে। তবে অথর্ববেদে ধর্মবিশ্বাস ও সমাজজীবনের প্রতিফলন থাকলেও মানবজীবনের সরল ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্রও কিন্তু অথর্ববেদ। প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতির পাশাপাশি বর্তমানকালীন লৌকিক সংস্কৃতিরও অপরিহার্য দলিল অথর্ববেদ। অপর তিন বেদ থেকে অথর্ববেদের জনপ্রিয়তা অধিক পরিমাণে, কারণ অথর্বমন্ত্রগুলিতে মানব হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ, যাদুবিদ্যা, রাজার আচরণীয় কর্ম, মারণ, উচাটন

প্রভৃতি বিদ্যা অথর্ববেদ থেকে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। চরক ও সুশ্রুত অথর্ববেদ থেকেই আকর গ্রহণ করে তাদের শাস্ত্রকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তাই অবলীলায় বলা যায়, গৃহ্যসূত্রের জনক হল অথর্ববেদ। সকল মানবের দৈহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধনের মূল আকর অথর্ববেদ। রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গ্রামীণজীবনের সকলপ্রকার দুঃখ-কষ্ট নিবারণের মূল উৎস অথর্ববেদ। এই বেদ সেই প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আজও প্রবহমান ধারায় সকল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

তথ্যসূত্র

১. কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকা।
২. মনুসংহিতা।
৩. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।
৪. আপস্তম্ব য. প. সূ.।
৫. ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত।
৬. সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায় নারদ সনৎকুমার সংবাদ।
৭. অথর্ববেদ সংহিতা।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

The Concept of Sannyasa in the later Upanishads

Sheuli Das

Introduction : Upanisads are representing the highest peak of Indian culture. The only source of Vedic culture is the Vedic literature. Amongst it are the four Vedas, the Rgveda, the Samaveda, the Yujurveda and the Atharvaveda and it's are four part like *Samhitas, Brahmanas, Aranyakas* and the *Upanisads*.

The Rgveda is a collection of hymns, the Samaveda is a collection of songs, the Yujurveda is a collection of sacrificial formulas and the Atharvaveda is a collection of spelt and charms. Brahmans contain observations on various sacrificial rites and ceremonies. Aranyakas contain philosophic speculation about the nature of truths and Upanishad elaborate further philosophic speculations of Aranyakas. Upanisad marked a reaction against sacrificial religion and revealed the ultimate truth and reality, a knowledge of which was considered indispensable for the emancipation of man. Besides, certain other Hindu scriptures too have been included in Vedic literature.[1] The last part is Upanishad which is called Vedanta.

The main aim of the Upanisads is to record the highest knowledge about the ultimate reality, which is identified with the self. The Upanisads are full of different stories or legend which shed some light. On the educational system of those days From Upanisad we get glorious picture

of the value based education that prevailed in ancient India. The Universal value of *ahimsa, satya, asteya, brahmacarya* and *aparigraha* were considered to be essential qualities of a student's life.[2]

Social Life : During the later Vedic age very important changes in the Aryan society.

a) The Varnashrama or caste system -The term varna is used definitely in the sense of cast without reference to colour of the skin. The varnashrama system is called system of caste, whose beginning may be traced in four fold classify fication of society in the Rgvedic period which was perfected during this period in various direction. The Brahmanas and the Kshatriyas emerged as the two leading classes.The Brahmanas claimed superiority over all other varna but the Kshathiyas remaind their contender. Later on, these two varnas compromised with each but the Brahmanas and the Kshatriyas in no way participated in productive activities of society but desired to draw maximum economic advantage do themselves. Therefore they thought it wise to compromise among themselves by which Brahmans were provided superior social status and Kshatriyas were gradually accepted owners of the land. [3]

The cast system had not become rigid by that period. The cast of an individual was not sole by determined by birth and the profession normally laid down for the different caste were not scrupuloudy followed in practice. The same way barring the Sudras these was no prohibition to interdining and inter marriage among different caste.[4]

The first reference to the Varnashrama system is made in purusha sukta verses of the Rgveda (Rg Veda 10.90)

Human is inherently divided four orders. Varnashrama Dharma is a Sanskrit name given to the divisional structure of the Indian society. When this order of society is intert wined with the four order of the life or the Ashram's, like Brahmacharya, Garhastya, Vanaprastha and Samnayasa.[5]

Here Brahmacharya means is student life. Garhasthya or the house holder life, Vanaprastha or the retired life and Sannyasa or the devotional life. It gives rise to the varna shrama dharma. It can also be put as the presence of varna in different ashramas of life.

During the first order the primary duties of an individual were to get education to obey his teacher or Acharya and observe celibacy and second order he had to earn his livelihood get married, rear children and hounour guests and third order at that time, he had to observe celibacy and concentrate on Philosophic meditation and during the fourth order had to observe religious rituals and try to attain *Nirvana*.

The four orders was unique feature of the Vedic society. It provided an individual not only an opportunity to satisfy his physical desires and spiritual ambitious but also to benefit society with the knowledge, experience and sacrifice of ascetics and hermits.[6]

Sannayasa System : Sannyasa is a traditionally conceptualized for men or women in late years of their life but bramacharis have the choice to skip the house holder and retirement stage renounce worldly and materialistic pursuits and dedicate thus lives to spiritual persuits.

Sannyasa is a form of asceticism is marked (sign) by renunciation of material desires prejudices, represented by a state of disinterest and detachment from material life and the purpose of spending one's life in peaceful, love inspired, simple spiritual life.[7]

Sannyasa is a Sanskrit word. Its in nyasa means purification. So Sannyasa means "Purification of Everything".[8] It is a composite word of 'sam' which means "together, all, 'ni' which means 'down' and 'asa' from the root as meaning "to throw" or "to put". A literal translation of Sannyasa is this 'to put down everything all of it.' Sannyasa is sometimes spelled as sannyasa.[9] The word Sannyasa in Sanskrit mean renunciation.

Sannyasa has four stage. It has been historically a stage of

renunciation ahimsa which non violence. If it peaceful simple life and spiritual pursuit in Vedic traditions.

The term *Sannyasa* has makes appearance in the *Samhita, Aranyakas* and *Brahmanas*, the earliest layers of Vedic literature (2nd millennium BCE) but it is rare. The farm Sannyasa evolves into a rite of renunciation in ancient sutra texts and thereafter became a recognized well discussed stage of life (Ashrama) by about the 3rd and 4th centuary CE.[10]

In Dravidian languages "Sannyasi" is pronounced as 'Sanyasi' and also 'Sannasi' in colloquial form, sannyasis are also known as *Bhiksu, Pravrajita, Yati, Sramana* and *Parivrasajaka* in Hindu texts.[11]

A Hindu Sannyasi in ancient and medieval literature and they are usually associated with forests and remote hermitages in their spiritual, literary and philosophical pursuits.

Sannyasa is Sanskrit word. The word *Sannyasa* means renunciation. A Sannyasi is one who received Sannayas Diksha and became part of the Holy order of Sannyasis. *Sannyasis* carry the title of Swami or in the case of women Swamini or Sadhvi.[12]

Jamison and witzel state early. Vedic text make no mention of Sannyasa or Ashrama system unlike the concepts of Brahmachari and Grihastha which they to mention.[13] Instead, Rgveda uses the term Antigriha in hymn 10.95.4 still part of extended family where people (older) lived in ancient India, with an outwardly role.[14] It is in later Vedic era and overtime. *Sannyasa* and other new concepts emerged while older ideas evolved and expanded. A three stage Ashram concept along with Vanaprashtha emerged about or after 7th century B.C. when sages such as *Yajnavalkya* left their homes and roamed around as spiritual recluses and pursued their *pravrajika* life style.[15]

Among the thirteen major or principal Upanisads all from ancient era many include section related to Sannyasa.[16] The history of this tradition

can be traced back to the earlier Upanisads, According to Ranade, R.D. the foundations of the asrama systems has been already firmly laid down even in the earlier Upanisads.

Kane, P.V. has also stated that in the times of earlier Upanisads, the three asrama were known and all four were known by their specific names at the time Jabalopanisad.[18]

The motivations and state of a Sannyasi are mentioned in Maitrayani Upanishad which a classical major Upanisad that Robert Hume included among the list of "Thirteen Principal Upanishads" of Hinduism.[19] Maitrayani start with the question "given the nature of life, how is jay possible? And "how can one achieve moksha (liberation)?" in later sections if offers a debate on possible answer and its views an Sannyasa.[20]

"The later Upanisads reveal a clear destinations between the third and the fourth orders of life and lay down strict specific norms for the ascetics to achieve emancipation, the fourth goal of life."[21]

Among the later Vedic Upanisad may be treated as the most significant because they exhibit the duties, responsibilities, Maksha variety of the Sannyasa different types of Sannyasinies that influenced in later Sannyasa system in Hinduism. The word 'Sannyasa' probably appears first find out in the Mundakapanisad.[22] P.V.Kane observed that the reference of 'Sannyasa' distinct by appears first in Jabalaupanisads.[23] In that Upanisad it refers that an individual after end of Bramhmacharya enter family life then forest life and finally praurajya.[24]

If we serach all the Samnyasa Upanisads it will be very big subjects there are a good number of Upanisads on it belonging to all the Vedas. T.R. Chintamani Dikshit has edited a book where he has collected 17 Upanisad on 'Sannyasa'.

Sannyasa Upanisads are a group of minor Upanisasd of Hinduism related to the renunciation, monastic practice and asceticism.[25] There are

nineteen Sannyasa Upanishad in the Muktika Upanisads[26] Nirvana a Upanishad is related Rgveda and Aruneya, Maitreya, Brihat-Sannyasa, Kundika which are related Samaveda and Brahma. Avadhutaka, Kathashruti which are related black Yajurveda, and Jabala paramahamsa, Advayataraka, Bhikshuka, Turiyatitavadhuta, Yajnavalka, Shatyayaniya Upanishads are related white Yajurveda, Ashrama, Naradaparivrajaka Paramahamsa and Parabrahma Upanishad which are related Atharvaveda.

Most of the Sannyasa Upanishads present yoga and Vedanta philosophy according to Patrick allivelle, major Hindu monasteries of early medieval period belonged to the Advaita Vedanta tradition.[27]

Types of Sannyasa : The later Upanisad propound Samnyasa as a way salvation. Four types of Samnyasa are mention in the later Upanisads unlike 'Vairagyasannyasa.' Jnanasannyasa, Jnanavairagya Sannyasa and Karma sannyasa.

Vairagyasannyasa arises out of recluse being disgusted with wordly pleasures. Jnanasannyasa is one which restored by a person who has studied various branches of knowledge and being 'sadhana catustaya sampanna.' gives up everything, knowing worldly pleasures as meaningless.

When both Jnana and vairagya are assimilated to a person then he takes resort to sannyasa he becomes the highest kind of sannyasin.

Karmasannyasin takes resort of sannyasa order after enjoing first three orders of life.

Ashrama Upanishad identified various types of Sannyasi renouncers based on their types of recluse—

1) ***Kutichaka*** Kuticaka is considered as the first order of a Samnyasin. He is required to retain a tutt of hair on his head and wear a sacred thread and seeking atmospheric world. He is advised to take bath thrice a day.

2) ***Bahudaka*** 'Bahudaka' is second in the order of secluses. He has to take bath twice a day.

3) ***Hamsa*** Hamsa is the third order. The Hamsa ascetic wears matter hair, puts on the forehead the mark of either the horizontal lines of holy ash or he. The perpendicer dicular one of sandal. They are advised to take bath once in a day and should use a sag as bath towel.

4) ***Paramahamsa*** The Paramahamsa a ascetic is devoid to tuff and sacred thread, receives alms in the vessel of his hands wear a single lion cloth has a single garments one bamboo stuff either wears as single garments.[28]

5) ***Turiyatita*** Turiyatita is always conscious of the feeling "I am that (soham). He stays naked and eats food directly by his mouth.[29]

6) ***Avadhuta*** Avadhuta has a choice to perform various duties and follow the rules laid down in the sastra for the benefit and guidance of the worldly people.[30] The Sannyasa group of minor Upanisads differ from other groupings brodly based on their over all focus, even through there are overlaps. They contrast with the sannyasa Upanisads which are a generic nature the yoga Upanisads are related to yogo the Shaiva Upanisads which highlight aspect of Shaivaism, The sakta upanisad which focus on Shaktism and the vaishnava Upanishads which highlight vaishnavism.[31]

The Sannyasa Upanishad are notable for their descriptions of the Hindu sannyasi. His character and his state of existence as he leads the monastic life in the Ashram a tradition.[32]

They generally assert that the life of the sannyasi is one of carefree simplicity of 'compassion for all living beings.[33] Self knowledge is his journey and destination.[34] They also offer contrasting view on. Who, how and what age one many renounce the world for spiritual pursuits.[35]

The Jabala Upanishad asserts that any-one can renounce, the choice

is entirely up to the individual, regardless of which Ashrama he is in. The Upanishad seems to justify suicide as an individual choice in certain circumstances, a view opposed by earlier Vedic text and principal Upanishads. Those too sick may renounce the worldly life in their mind. This Upanishad presents the Vedanta philosophy view that one who truly renounces lives an ethical life, which includes not injuring anyone in thought, word or deed such a sannyasi (renunciate) abandons all rituals, is without attachments to anyone and is one who is devoted to the oneness of at man and Brahman.

The later Upanisad such as Naradaparivrajaka Upanisad classification that all renunciation is paramahamsa but people enter the state of sannyasa for different reason for detachment and getting away from their routine meaningless word to seek knowledge and meaning in life to honour rities of Sannyasa they have undertaken, because he already has liberating knowledge.[36]

Kundika and Laghu sannyasa Upanishads discusses when and how someone may renounce and answers its gives are different from those found in other Upanishads such as Jabala Upanishads.[37] This Upanishad describe renounciation as stage of life where a man lives like a man Yogi, sleep on sand and near temples, remain calm and quite, kind no matter what other do to him while pondering on Vedanta and meditating on Brahman through om.[38]

Brahmapanisad discusses Atma (Soul) and its four avasthas (jagrata, swapna, susupti, Turiya) and four seats for the purpose of achieving Dhyana (meditation) of the Nirguna Brahman and its third chapter forms of rituals and external religious observations and declaring the highest complete state of man is one that is dedicated entirely to knowledge.[39]

Sannyasa Upanishad described six life styles for six types of rennunciates,[40] and classified in the Upanisads symbolic items the Sannyasins carried and their life style like Kutichaka carried triple staff.

Hamsa carried single staff and while paramahamsas went without them.

In the Asrama and the Bhiksuka Upanisads the four types of renouncers are distinguished in terms of both their life style and symbolic articles they posses. The Kathashruti Upanishad discusses rities of posseage for a sannyasi. Parabrahma Upanishad links Brahma to consciousness in dreaming state. Mahesvara to his consciousness in deep sleep and Brahman as the Turriya the fourth state of consciousness.[41] The Upanishad calls those who merely have a mass of hair for topknot and visible sacred string across their chessas "Pseudo Brahmin" with hollow symbols. Who are not acquiring spiritual self knowledge.[42]

The Sannyasi states Upanishad is one who is attached to his soul and nothing else, he seeks and knows the highest truth, he is one with imperishable Brahman (ultimate reality) he is peaceful pure, truthful, content sincere, free from anger, free from love or hate and without material possessions.[43] 'All these paths such as Bhakti, Yogo, Samnyasa are resorted to by the later Upanisad which lead aspirant towards his goal.'[44]

The importance of these Upanisadsis enormous. Those who want to know about the system of Sannyasa, instiation, practices, variety aim, end fruit of Sannyasa, they may get a clear picture from these Upanishad. From these text we understand that there are different types of sannyasins in Indian life and culture, their actitvities, Physical appearances, habit etc. These Upanishads have a value to the Sannyasism in India.

End Notes

1. www. history discussion.net/history of India/vedic civilization and culture in India.
2. The Journal of Ebang Amra, Upanishad 1, P.229
3. www. history discussion.net
4. Ibid

5. https://www.lawc to pus.com Emergence of varna shrama Dharma in The History of Ancient India.
6. www. history discussion.net / history of India
7. S. Radhakrishnan, 1922. The Hindu Dharma, International Journal of Ethics, 33.(1):1-22
8. Monier-william's, A Sanskrit English Dictionary
9. Angus Stevenson and Maurice wait, 2011, Concise Oxford English Dictionary
10. Patrick Olivelle, 1981, Contribution to the Semantic History of Sannyasa Journal of the American Oriental Society, vol-101, No.-3, p. 265-274 Quoted by sannyasa system opcit-10 see, https://www. Google.com
11. ibid
12. see. www. sanatankultura.com
13. JF Sprockhoff, 1981, Aranyaka and Vanaprastha in der Vedichen Literature. P.19-90
14. Jamison and witzel, 1992, vedic Hinduism Harvard University Archives, p. 47
15. JF Sprockhoff. 1976, Sannyasa, Quellen studien zur Askese in Hinduismus, Unter Suchungen uberdie sannyasa Upanishads, Wiesbaden see, https:// en.m.wikipedia.org/sannyasa
16. Olivelle, Patrick, 1992. The Sannyasa Upanishads, Oxford University Press, pp.x-xi,4-9
17. Ranade, R.D, Opcit p.326 Quoted by Mrinalini, The Earlier and Later Upanishads, of cit. 202, p. 264
18. Kane, P.V. History of Dharmasastra, Vol-ii, Pt.II, Pune, 1941, p. 422
19. Hume, Robert Ernest, 1921, The Thirteen Principal Upanishads, Oxford University Press
20. Deussen, Paul, Sixty Upanishads of veda, vol-I, MLBD, p. 367-373
21. Monohar, Mrinalini, The Earlier and Later Upanishads, of Cit, p. 265
22. Mulca-3.2.6
23. P.V. Kane, History of Dharma Sastra, vol-II, p. 422
24. Jabala, up-4.1

25. Patrick, Olivell, Upanishads, 1998
26. ibid, The Sannyasa Upanishad. Pp-x-xi
27. ibid pp.17-18
28. Ramanathan, A.A. Sannyasa Upanishads (Translated) Theosophical Publishing, House, Chennai
29. Monohar, Mrinalini, The Earlier and Later Upanishads, of cit, p. 268
30. Avadhutopanisad 12, 13
31. Winternitz, Moriz, Sarma, V. Srinivasa, History of Indian Literature, MLBD, 1996, pp-317-224
32. Patrick, Olivelle, The Sannyasa Upanishads, pp.5, 227-235
33. ibid pp-127-128, 236-237
34. ibid pp-269-271, 278-280
35. ibid The Ashram System, 1993, pp-118-119, 178-179
36. The Sannyasa Upanishads : Hindu Scriptures on Asceticism and Renunciation, p-99
37. Olivelle, Patrick, The Asrama System, 1993, pp-117-119
38. Nair, Shantho, N. Echoes of Ancient Indian Wisdom
39. Olivelle, ibid, 1992, pp-84, 92
40. A.A Ramanathan, Sannyasa Upanishad
41. Olivell, ibid p. 267
42. ibid p-269, Foot note-13
43. ibid pp-176-177m 186
44. Monohar, Mrinalini, ibid p-284

Bibliography

1. Deussen, Paul, Sixty Upanishads of the Veda, Vol. I, 1997, MLBD.
2. Hume, Robert Ernest, The Thirteen Principal Upanishads, 1921, Oxford University Press.
3. Kane, P.V., History of Dharmasastra, Vol-II, 1941, Pune.
4. Monohar, Mrinalini, Vivek, The Earlier and Later Upanishads, A Comparative Study, 2011, Bharatiya Kala Prakashan, New Delhi.

5. Monier, Williams, A Sanskrit English Dictionary.
6. Olivelle, Patrick, The Sannyasa Upanishads, 1992, Oxford University Press.
7. Olivelle, Patrick, Contribution to the Semantic History of Sannyasa, 1992, Oxford University Press.
8. Ramanathan, A.A., Sannyasa Upanishad, Transfer Theosophical Publishing House, Chennal.
9. Radhakrishnan, S, The Hindu Dharma, International Journal of Ethics, 33(1) 1922.
10. Sprockhoff, Joachim F, Sannyasa, Qullen Studies Zur Askese in Hinduismus (in German). Unter Suchungenuberdie Sannyasa Upanishads, 1976.
11. The Journal of Ebang Amara, Vol-1, 2016
12. Winternitz, Moriz, Sarma, V. Srinivasa, History of Indian Literature, 1996, MLBD

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

New Generation of Human Right

Shyamal Mahato

Introduction : Dynamic multidirectional and multidimensional development of human rights and their protection are the most outstanding features of contemporary international relations. This development finds its reflection, on the one hand, in a trend to strengthen and extend the established substantive legal standards with their implementation procedures, and on the other hand, in a tendency to promote and draft new human rights. Both trends, particularly the latter, may be generally explained as a result of scientific and technological developments with their advantages and threats, increasing economic and social progress, emerging new human needs and aspirations of the developing nations and globalization of crucial human problems faced by these countries. These sets Of rights, which qualified to be called as the third generation of human rights or new generations of human rights, in fact, has an inherent nature to be identified by the name of Third Group of Human Rights. This conception of third generation of rights tends to ensure the protection of human values, through directly applicable to the third world, of a more global character which were absent in the preceding generations of groups of rights. The third generation is considered to be complementary to, and the continuance Of the existing human rights codified in legally binding instruments. The idea of new generation is to serve not only purely theoretical purposes but also, as closely related to the latest progress in international relations. It tends to be a synthesis of new human aspirations and an attempt to

define desirable directions of the human rights developments.

The human rights movement emerged in the 1970s, particularly from former socialists in Eastern and Western Europe, with major contributions also from the United States and Latin America. The movement quickly jelled as social activism and political rhetoric in many nations and Was put high on the world agenda. By the 21st century, the human rights movement expanded beyond its original anti-totalitarianism to include numerous cases involving humanitarianism and social and economic development in the Third World. The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) was embraced by the United Nations General Assembly in 1948, partly in response to the atrocities of World War Il. In spilt of fact that the UDHR was a non restricting goal, it is currently considered by some to have obtained the power of international customary law which may be invoked in appropriate circumstances by national and other judiciaries. The UDHR is considered as a Bible On the Human Rights. Human rights have moved from absolute domain of States Sovereign to the realm of International Law, enforceable by International Bodies. The division of human rights into three generations was at first proposed in 1979 by the Czech jurist Karel Vasak at the International Institute of Human Rights in Strasbourg. He used the term at least as early as November 1977. 1 His divisions follow the three watchwords of the French Revolution: Liberty, Equality and Fraternity. The three generations are reflected in some of the rubrics Of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Universal Declaration of Human Rights includes rights that are thought of as second generations as well as first generations ones, but it does not make the distinction in itself.

I. The Human Rights of First Generation: The International Covenant on Civil and Political Rights

The various rights contained in the Covenant of the Civil and Political Rights are not new rights. These are the rights that had developed in

course of a very long period of time since the time of Greek City State and concretised in the form of the Magna Carta; the American Declaration of Independence and the French Declaration of the rights of the Rights of man and of the Citizen. Thus, these rights reflect since quite a while ago settled human values and as such are joined in the national constitutions of various States, in the International Covenant On Civil and Political Rights, in the European Conventions on Human Rights and in Inter American African instruments. Since these rights arc incorporated in different important International and national documents, they represent an over whelming consensus of International community giving rise to the rules of International customary law of Journal application. Louis B. Sohn has suggested that the consensus on virtually all provisions of the Covenant on Civil and Political Rights is so wide spread that they can be considered as part of the Law of mankind, a jus logens for, All First Generation of human rights deal essentially with liberty and participation in political life. They are generally civil and political in nature, and Serve to shield the person from overabundances of the State. The first generation of human rights included primarily those rights defined in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). First Generation rights include, among Other things, freedom of speech, the right to a fair trial, freedom of religion, and voting rights. Spearheaded by the United States Bill of rights and in France by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in the 19th century, they were first enshrined at the global level by the 1948 Universal Declaration of Human Rights and given status in International Law in Article 3 to 21 of the Universal Declaration, and the International Covenant on Civil and Political Rights. At the point first generation human rights are limited this directly limits second generation rights. Improving first generation rights is a casual link from first generation human rights to improve socio-economic outcomes .

2. The Second Generation of Human Rights: The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights

At the principal hotspot for the inception of Civil and Political rights, is considered to be the American and French Revolution, So economic and social rights are considered to be originated in the Russian Revolution of 1917 and in the Paris Peace Conference of 1919. The particular significance of Paris Peace Conference Was the establishment of the International Labour Organization which laid emphasis on the concept of Social Justice by proclaiming that "peace can be established only if is based upon social justice", and "the failure of any nation to embrace humane conditions Of labour is an snag in the method of different nations which want to improve the conditions in their own countries."

The International Labour Organisation has been successful in the developing many international labour guideline in the structure shows and proposal coupled with effective system Of supervision and the investigation of complaints. However, the real credit goes to the efforts of the American President Roosevelt who for the first time has expressed his hope for an instrument dealing with the economic and social rights. In his message to Congress of January 6, 1941, President Roosevelt referred to the four essential freedoms, viz. freedom of speech and expression, freedom of each individual to worship God in his own way, freedom from want and freedom from fear to which he looked forward as the foundation of a future world. "Freedom from want" it might be contended, shaped the premise on which the concept of economic and social rights was formulated. President Roosevelt in his another message to Congress in 1944, made the idea Of 'freedom from want" clear. He was of the view that economic problems in the world have acquired alarming magnitude, therefore, he advocated for drastic economic and social reforms. In this opinion "true individual freedom can't exist without economic security and independence." These professions had practiced their full impact upon the United Nations when

it began to address itself to the human rights issue.

Second-Generation of human rights are related to equality and began to be recognized by Governments after World War I. The Second-Generation consisted mainly of the human rights specified in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). They are fundamentally social, economic and cultural in nature. They ensure different members of the citizenry equal conditions and treatment. Secondary rights would include a right to be utilized, rights to lodging and medicinal services, just as standardized savings and unemployment benefits. Like First-Generation rights, they' were also covered by the Universal Declaration of Human Rights, and further embodied in Article 22 to 27 of the Universal Declaration, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In the United States of America, President Franklin D. Roosevelt proposed a Second Bill of Rights, covering much the same grounds, during his State of the Union Address on 11 January, 1944. Today, many nations or groups of nations have developed legally binding statement ensuring thorough arrangements of human rights, e.g. the European Social Charter.

3. The Third Generation of Human Rights: Collective Rights

In recent years there has been growing support, manifested in various international forums, for the notion that a Third-Generation of human rights, composed of solidarity rights, is emerging. The principle assumptions behind this concept are: (a) That the principle categories or sets of human rights presently recognized by International Law (civil and political rights on the one hand and economic, social and cultural rights on the other hand) can be termed respectively First and Second Generation of Human Rights; (b) That these rights are not sufficiently flexible or dynamic to be able to respond adequately to present circumstances; (c) That there is a set of more or less homogeneous demands which are distinguished primarily by the fact that solidarity is a prerequisite to their

realization; and (d) That these new demands are presently in the procedure of securing international recognition as human rights.

Third-Generation human rights are those rights that go past the insignificant civil and social rights as expressed in many progressive documents of International Law, counting the 1972 Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development. Because of the present day tilting toward national sovereignty and the preponderance of would-be offender nations, these rights have been hard to enact in legally binding documents. The "Third-Generation of Human Rights" remains to great extent informal, and in this houses an extremely broad spectrum of rights, including:

1. Group and collective rights.
2. Right to self-determination
3. Right to economic and social development.
4. Right to a healthy environment.
5. Right to natural resources
6. Right to communicate and communication rights.
7. Right to participation in cultural heritage.
8. Rights to intergenerational equity and sustainability.

Individuals are also members of such units, groups or communities as a "family, religious community, social club, works union, proficient association, racial group, people, nation and state. It is not surprising, therefore, that international law not Only recognizes inalienable rights of individuals, but also recognized certain aggregate rights practiced mutually by individuals who are assembled into larger communities, including people are nations. Karel Vesak has pointed out that the third generation of human rights "infuse the Human dimensions into regions where it has very regularly been missing having been left to the State or States" and that these rights can be acknowledged uniquely through the concerted

endeavours of considerable number of entertainers the social scene: the individual, the State, public and private bodies, and the international community". According to Karel Vesak two generation of human rights represents the first two of the three guiding principles Of the French revolution, which is liberty and equality. The third generation of the human rights referred to the fraternity of brotherhood. These categories of rights, according to Karel Vesak, are based on the sense of solidarity, which is essential for the realization of the major concern of the international community such as peace, development and environment." The most cherished rights belonging to the third category of rights are the right to self determination, the right to development and right to peace.

Some countries have constitutional mechanisms for safeguarding Third-Generation of Human Rights. For example, the New Zealand Parliamentary Commissioner for the Environment, the Hungarian Parliamentary Commissioner for Future Generations, the Parliament of Finland's Committee for the Future, and the erstwhile Commission for future Generations in the Knesset in Israel. Some international organizations have offices for Safeguarding such rights. An example is the High Commissioner on National Minorities of the association for Security and Co-activity in Europe.

The Directorate General for the Environment of the European Commission has as its crucial, safeguarding and improving the earth for present and future generations and promoting sustainable development. The "Three-Generations" account of human rights, negative rights are frequently connected with the First-Generation of Rights, while positive rights are related with the second and third generations. Some philosophers and political scientists make a distinction between negative and positive rights. Rights considered positive rights, as at first proposed in 1979 by the Czech jurist Karel Vasak, may include Other civil and political rights such as protection of person and property and the right to counsel, as well

as economic, social and cultural rights for example public education, health care, social security, and a minimum standard of living.

Man has been quite successful in conceptualizing human rights, which can be divided into three different generations. The First-Generations deals mostly with negative rights (i.e. the right not to be subjected to coercion) such as freedom of religion, free speech and the right to a fair trial. The Second-Generation of Human Rights concerns positive rights (i.e., right to be provided with something by others) such as the right to be employed, housing and health care. These rights were triggered by World War Il and are encapsulated in the International Covenant in Civil, Economic and Social and Cultural Rights (ICESCR). The Third-Generations of Human Rights is mostly environmental rights (i.e. sustainable development) and they are generally still in the form of freely restricting laws, for example the Rio and Stockholm Declarations.

4. Fourth Generation of Human Rights

However, today civilization is at the beginning of the knowledge age, an age where most populations are presumed not to work in agriculture or industry but in producing knowledge instead. Unlike agriculture, which is affected by climate or industry that pollutes the environment, this type of production is interconnected with natural conditions as it digests and produces one thing: information. Living things are biologically nothing but genetic codes and— through molecular manufacturing— materials are physically nothing but a set of atomic structures. Thus, in the knowledge age, reality is no different than information itself. One of the main problems in the knowledge age is how information is being managed by the legal system. The nomenclature used by the legal system is "intellectual property" (IP) and the name itself bears a fallacy as it attributes information to property, whereas, the characters of information significantly differ from tangible properties or "goods". The first difference is with regards to scarcity. Goods are valuable because they are scarce, once they

are consumed. their value decreases. Information on the other hand is abundant. Scientists rely on information from their predecessors to create a new theory and authors rely on information from previous writers to write books. So, if information enters the public sphere (i.e., it's consumed), the quantities are multiplied and not reduced. The second difference is in form. Goods can exist only once in space and time and while information is abstract, it can exist in many heads and it transcends time. The third difference is with regard to its divisibility. Goods can be divided between people but information is indivisible. The fourth difference is multiplication. "Information wants to be free".

Conclusion

The philosophy of human rights examines the underlying basis of the concept of human rights and critically looks at its content and justification. The intellectual foundations of the modern concept Of "Human Rights" can be traced through the philosophy and the concepts of human rights in the Dharma of Vedic Period, the Universal Equality of the City States of Classical Greece. The forerunner of human rights discourse was the development of Roman law followed by the Enlightenment Concept Of natural rights developed by the jurists such as John Locke and Immanuel Kant and through the political realm in the United States Bill of Rights and the Declaration of the privileges of Man and of the Citizen. Presently, human rights have moved from absolute domain Of States sovereign to the realm of international law, enforceable by international bodies which has given birth to the recent concept of new generations of human rights. The journey of human rights from the Vedic period to the fourth generations of human rights depicts the fact no other concept of law is so bejeweled with stars as that of concept of natural right or human rights. It is concluded that the Concept of human rights runs like a golden thread throughout the legal philosophy of human rights.

References

1. David G. Littman, "Human Rights and Human Wrongs", National Law Review, New York,
2. N.R. Sharma, Human Rights in the World Pointer Publishers, Jaipur, 1999
3. ibid.
4. Karel Vesak, "A 30-year Struggle : The Sustained efforts to give force of how to the UDHR", The UNESCO Courier, November, 1977
5. Retrieved from David G. Littman, "Human Rights and Human Wrongs", http://www.nationalrevicw.corn/comment/comment-littman()11903.asp,, visited on 2 February, 2013.
6. Karel Vesak. "Human Rights : A Thirty-year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of law to the Universal Declaration Of Human Rights", United nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO Courier, Paris November.
7. ibid.
8. D. Kaufmann. in Human Rights and Development : Towards Mutual Reinforcement" in Philip Alston and Mary Robinson (edited), Human Rights and Governance: The Empirical Challenge, The foundation for Economic Education, Inc., New York, 1967.
9. Retrieved from <http://www.wikipcdia.com>, visited on February, 2011.
10. Positive rights permit or Oblige action, whereas negative rights permit or oblige inaction. These permission or obligations may be of either a legal or moral character. Likewise, the notion Of positive and negative rights ay be applied to either liberty rights or claim rights. either permitting one to act or refrain may include civil and political rights such as freedom of speech, property, freedom from violent crime, freedom of worship, habeas corpus, a fair trial, freedom from slavery and the right to bear arms. United Nations Centre.
11. Maurice Cranston, "Human Rights : Real and Supposed" in D.D Raphael (edited), Political and the Rights of Man, Indiana University Press.

Implication of Education Status on Debt Profile and Family Planning: A Comparative Study between Scheduled Tribes of Purulia and Bankura District of West Bengal

Sadhan Kumbhakar

Dr. Subhasis Bhattacharya

Introduction : The Scheduled tribes in West Bengal are backward in each and every aspect of the human development and they are therefore obligatory to animate in abject poverty, deprivation, disadvantage and social alienation. The study decided to explore into a comparative analysis of the education status of scheduled tribes and how the education affects the other quality of life towards improvement. The study can be used as inputs in the planning process to bring them to the main stream of the society.The funds disbursed on educational institutions available to tribal populations have not until now achieved about an essential alteration in the tribals intimidating situation mostly because the social, political and economic forces allege contrary to them have so far discouraged all actual opulence ***(Hainmendorf, 1982)***. The progression of the incorporation of the tribals into the extensive Indian society will finally be established by political pronouncements, and these will be completed on the foundation

of ethical assessments ***(Hainmendorf, 1982)***. Thus, it appears that except knowledgeably supervision sections of the Indian population mature an essence of cultural abidance and discernment for tribal ethics, even the most stretched out arrangements for the economic development of tribal populations are likely to evidence useless.Education can perform a decisive part in setting consciousness between the tribals about their legislative rights and thus detained them to manage with breaking of contemporary life ***(Maurya R.D, 1985)***. He recommended that there is untouchable requirement for an organized attitude for rapid perpetuation of education among tribals. Tribals in India diverge from one another in numerous respects. Different studies also emphasize the difficult problems allied with tribal education programme. The complications and divergences in educational attainment of tribes are having the futures of socio, religious, economic and ecological ***(Shah B, 1990)***. Different studies suggesting the following measures for the improvement of the educational status of tribal women were encouraged. These were determine tribal groups for introducing inventive educational programme at micro level, fetching out reasons for non-enrolment of girl child in tribal communities in order to procure the aim of universalization of rudimentary education, reviewing the difficulties of dropouts, wastage and inactivity among tribal girls in schools, enhancement in social and economic standing of people, health modernity, practice of science and technology in agricultural development and environmental conservation ***(Singh and Ohri, 1993).Gregory, S. et al. (2007)***, claims that there is a need for the creation of a new kind of education that would be tribal-friendly, nature-centered and culture-bound, with a humanistic approach. Such an education should establish a kind of ownership and a sense of homeliness in the minds of the tribal people, and would make full use of local institutions and existing outlets while reducing external interventions. In his research on the tribal female population in Arunachal Pradesh ***Ram Krishna Mandal (2008)*** found that female population is larger than male population but most females lag behind

their male counterpart in education. He claims that gender inequality lies at the root of the enduring inferiority condition that affects women at all levels of their lives, and that education in general and higher education in particular is a protection against economic need. Accordingly, he believes that access to higher education, both technical and vocational, will ensure economic freedom leading to social status and thus empowerment of women in these areas, and tribal women in general. ***Rajesh Jaiswal's (2010)***, paper argues that a difference exists is the degree of social exclusion, as illustrated by ethno-linguistic heterogeneity that activates economic and psycho-social mechanisms to restrict tribal education. Originally, ethno-linguistic heterogeneity was used to explain the lagging economic development, but has appeared more recently in the literature to explain both civil war and public goods. His paper addresses the value of tribal education for economic and social development; the paper claimed that ethnic and linguistic heterogeneity in the country partly explains the completion levels of national and tribal primary schools and gender gaps in those levels. He believes that education is one of the most powerful tools to reduce poverty and inequality, and it is equally acts as key to enhancing India's global economy competitiveness. In his view, the central plan for India's economic and social development should be ensuring access to quality education for all, especially for the poor and rural population. ***Ranjan Mohanty's (2010)*** paper reviews the educational scenario in India in general and secondary education in particular and demonstrates the educational issue among India's tribal communities. He shows that the tribal India lags far behind the other groups in terms of exposure, usage and equity. In the march towards growth, where education was the engine of progress, the children of the forest and hilly areas were left stuck somewhere down the line while the forwards are in the vicinity of touching the mark. The author argues that a special secondary education program with distinctive policy guidelines will carry the broader tribal community into the mainstream and stimulate growth in their society. He

argues, however, that a full-fledged disadvantaged educational status will undoubtedly resolve the prominent question of deprivation and asymmetric wealth distribution in our society. ***Sanjay Kumar Pradhan (2011)*** looked at tribal education issues in India. He highlighted the problems associated with tribal children's education, such as deprivation, parents' and children's apathy, superstitions and discrimination, lack of adequate teachers, foreign language, insufficient educational facilities and waste and stagnation, which created major obstacles in the education cycle in tribal schools. He feels that educating tribals' needs concerted effort of the government and officials, dedication and sincerity of the teachers, awareness of the tribals and their involvement is of vital necessity.***The Times of India (2015)***, stated that the latest 2011 Socio- Economic and Caste Census (SECC) declared that 23.52 per cent of rural families do not have literate adults over the age of 25, indicating a poor state of education among rural masses. The Census was conducted in 640 districts, and it was found that the country has a total of 24.39 crores households, of which 17.91 crores live in villages. Of these households 10.69 crores are considered poor. The data on poverty shows that 5.37 crores (29.97%) households in rural areas derive much of their income from manual labor from landlessness. In villages, as many as 2.37crore (13.25 per cent) families live in one room houses with kaccha walls and roof. This is also estimated that SC / ST groups apply to 21.53 per cent, or 3.86 crores families residing in villages. Based on the poverty ratio for rural social groups, Scheduled Tribes experiences the highest rates of deprivation (47.40%), followed by Scheduled Castes (42.30%) and Other Backward Castes (31.90%), compared to 33.8% for all classes. The data offers a rare opportunity for both the Center and the State to plan convergent, evidence-based planning.

Background

A rigid social structure can be created by the combination of merit based choice, equal openings, and priorities given for the basic intelligence.

These are the minimum precondition for the advanced societies. As the differences between classes abolished, the biological differences initiated. Our Constitutions provides security for the citizens in terms of social and economic justice, equality in opportunity and status, and dignity of them. The under privilege class and the marginal people receives some special protection as per Constitution. Provisions have been included in the Constitution for conservation and encouraging the interests of the Scheduled Tribes in various specialties to make them to link the national majority. All over development of tribal inhabiting of our country has acknowledged precedence consideration of the Government. Various government strategies were taken for guarantee the wellbeing of tribal. For channelizing such efforts for development, the socio4 economic status of the tribal people improved by the adopted initiatives of State and Central governments. Thus, the present status of the tribal people is such that they become a part of social integration by some level. For further empowerment of them it becomes necessary to involve government organizations, local peoples, representatives of the tribal, voluntary organizations and other concerned public and private agencies in the continuous development process. It is important to confirm that the programmes for progress and enablement of Scheduled Tribes are more strongly followed. The Administration, peoples, representatives, voluntary organizations and other alarmed public and private activities are more meticulously tangled in getting about social incorporation and financial progress of Scheduled Tribes in a period assured method. To discourse the understandings and disquiets of the tribals and encompass them at the enactment phase and to make the programmes more operative the executing organizations at the cutting edge level is required. The procedure of enhancing the standard of living of these (SC & ST) disadvantaged classes of our society should be augmented by providing evenhanded level of education, medical care, training and productive employment to preserve them at par with mainstream people. The progression of

modernization cannot be wholly accomplished without focused on tribal education. Only if the acquaintance to modernity is at par with the conventional people, will the tribal population downgrade to second class citizens of the state. Acquaintance to modernity by itself cannot be painstaking an indicator of development; however it is a rudimentary and compulsory state within which the development practice takes place ***(R. Sudarsana Rao, 2000)***.

As per Article-340, a commission will be employed which examine the settings of socially and educationally backward classes and also examine the complications under which they work. The commission also make endorsements to eliminate such difficulties and to advance their conditions.

Article 15(14) authorizes the State to make any exceptional endowment for the progression of any socially and educationally backward classes of citizens or for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This endowment was added to the Constitution through the Constitution (First amendment) Act, 1951, which amended several Articles. This endowment has permitted the State to reserve seats for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in educational institutions including technical, engineering and medical colleges and in scientific and specialized Courses. In this Article as well as in Article 16(4) the term 'backward classes' in used as a basic term and encompasses numerous groups of backward classes, viz., Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, denotified Communities and Nomadic/Semi-nomadic communities.

Article 29(1) provides "any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture to its own shall have the right to conserve the same". This Article has exceptional implication for all the Scheduled Tribes. Santhals have a script of their own, viz., Olchiki. But this endowment need not be understood to educate tribals only in their language to rendering them to the open-air understanding.

Article-46 considers the elevation of educational and economic benefits of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. As per the article, for the educational and economic attention of the frailer segments of the people and in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes the state shall endorse it with special care. Also the State shall shield them from social injustice and all forms of exploitation.

Article 350A considers that "It shall be the Endeavour of every state and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instructions in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such directions to any state as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities". Maximum of the tribal communities have their own languages or dialects, which customarily belong to a dissimilar family of languages than the once to which the State's official language belongs.

Data & Methods

The present study considers a comparative study to understand the educational status of the tribal people of Purulia (PRR) and Bankura (BAN) districts of West Bengal. The total work is done on the basis of primary data collection from the study area. The Map of the two districts is given on figure-1. Primary data collection from the tribal household follows separate methodology and some secondary sources like Planning office of Purulia and Bankura Districts, G.P. Office, Block Office, NGO's, are also used by the study. The primary data collection follows three stage purposive sampling study. The stages are as follows;

Stage-I : Each Community Development Blocks (CD Blocks) of the districts are arranged in terms of tribal Population. From this list two CD Blocks are chosen with maximum tribal population. By this way four CD Blocks (two from each district) are chosen by the study.

Stage-II : From this two selected CD Blocks all the Primary Sampling Units (PSUs / Villages) are again arranged in terms of tribal households, and from that list two highest PSUs from each CD Blocks are selected. By this way eight PSUs were selected by the study of which four are from Purulia and four are from Bankura district.

Stage-III : Now considering the household size of each village eighty percent household of the existing are surveyed by simple random sampling and after it another five percent survey was done to minimize the issues like non-response.

Figure-1: Map of Bankura and Purulia district

Source : www.wb.gov.in

The study uses descriptive statistics, percentages and simple econometrics to explain the objectives of the study.

Results

The study first considers the issues like gender bias in education. Table-1 shows the details of educational status of the children of Scheduled tribe's families in the study area.Table-1 describes the education level of Male children living. In Purulia district, out of total male children, 42.66 percentare not going to school and 57.34percenthave studied in different classes, followed by 8.45 percent in ICDS, 5.26 percent in class II, 4.85 percent in class III, 8.59 percent in classIV to V, 8.03 percent in between class VI to VIII, 6.09 percent in between class IX to X, 5.68percent in X plus and

4.02percent in XII plus. Whereas in Bankura, out of total male children, 40.56 percentare not going to school and 59.44b percenthave studied in different classes, there are 9.89 percent in ICDS, 6.78 percent in class I, 6.33 percent in class II, 6.44 percent in class III, 6.22 percent in between class IV to V, 7.44 percent in between class VI to VIII, 6.78 percent in between class IX to X, 5.78 percent in X plus and 4.02 percent in class XII plus. In both the districts, intensity of education is more or less same. It is very sad that intension of education of male children is very poor due to lack of consciousness as well as poor financial condition of guardian. Figure-2 clarify the situation in more detail.

Table-1: Education level of Male children's living

Education Level	No of Boys		Legitimate %	
	PRR	BAN	PRR	BAN
In ICDS	8.45	9.89	14.73	16.64
In Class-I	6.37	6.78	11.11	11.40
In Class-II	5.26	6.33	9.18	10.65
In Class-III	4.85	6.44	8.45	10.84
Between Class-IV to V	8.59	6.22	14.98	10.47
Between Class-VI to VIII	8.03	7.44	14.01	12.52
Between Class-IX to X	6.09	6.78	10.63	11.40
Up to X+	5.68	5.78	9.90	9.72
XII+	4.02	3.7	7.00	6.36
Total	57.34	59.44	100.00	100.00
Not Going to School	42.66	40.56		
Grand Total	100	100		

Source: - Primary data survey 2018-19

(Figure in the parentheses shows the percentage)

Figure-2 : Education levels of Male children's living

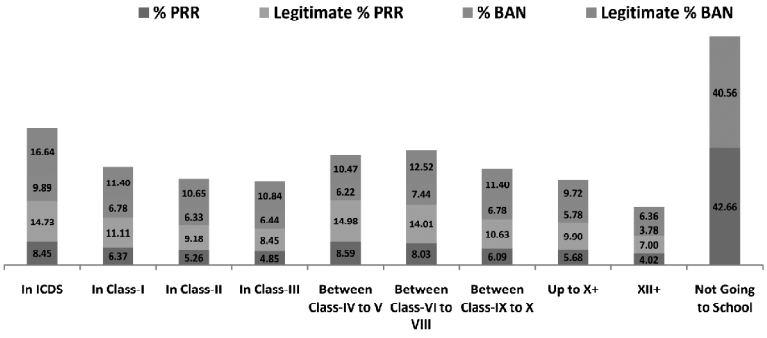

Source: - Primary data survey 2018-19

Table-2 : Education Qualifications of Girl children's living

Education Level	No of Boys		Legitimate %	
	PRR	BAN	PRR	BAN
In ICDS	7.17	11.52	12.47	14.44
In Class-I	6.54	9.21	11.38	11.55
In Class-II	5.53	9.45	9.63	11.85
In Class-III	5.16	8.00	8.97	10.03
Between Class-IV to V	7.42	8.12	12.91	10.18
Between Class-VI toVIII	9.06	9.58	15.75	12.01
Between Class-IX to X	6.67	9.94	11.60	12.46
Up to X+	4.91	8.12	8.53	10.18
XII+	5.03	5.82	8.75	7.29
Total	57.48	79.76	100.00	100.00
Not Going to School	42.52	20.24		
Grand Total	100	100		

Source : Primary data survey 2018-19

(Figure in the parentheses shows the percentage)

Figure-3: Education Qualifications and Number of Girl children's living

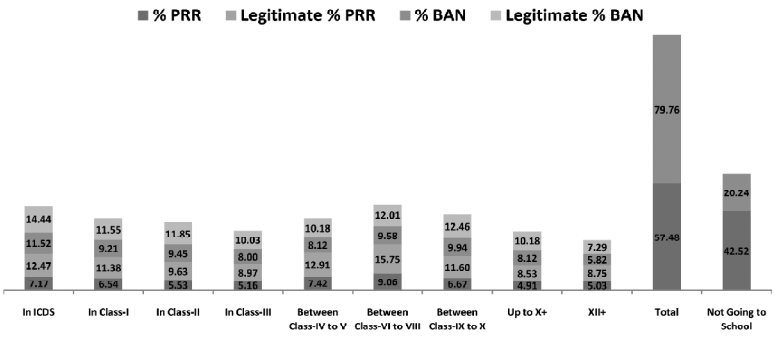

Source: - Primary data survey 2018-19

Table-2 gives educational qualification and number of girl children living. In the Purulia district, out of total girl children (100%), 42.52 percent are not going to school and 57.48 percenthave studied in different classes. whereas, in Bankura district, out of total girl children (100%), 20.24 percent are not going to school and 20.24percent are going to school. In this regard Bankura is comparatively better than Purulia. Also, higher education (XII plus) in both districts have been followed by very few girls.

It is in Purulia 5.03 percent and in Bankura 5.82 percent. Although legitimate cases percentage in higher education is relatively good in both the districts. Case of Other classes is more or less better in Bankura district than in Purulia district. In this aspect, it can be said that in both the districts parents are unconscious for education of girl children.

Table-3: Paired Sample T-test between Gender of PRR & BAN

Paired Samples T-Test

PRR				**statistic**	**df**	**p**
ICDS to III	M	F	Student's t	19.6	102	< .001
IV to VIII	M	F	Student's t	12.2	68	< .001
HIGHER	M	F	Student's t	5.7	44	< .001
BAN						
ICDS to III	M	F	Student's t	12.7	122	< .001
IV to VIII	M	F	Student's t	04.5	76	0.421
HIGHER	M	F	Student's t	4.1	53	0 .701

Source: Authors Calculation

Table-3 shows the paired sample t-test results of gender bias among the tribal population in terms of basic, middle and higher education. In case of Purulia district the study added that a clear gender bias persists at every level. The p-value for all the three categories is less than 0.001 for Purulia. For Bankura the study added that for the category ICDS to Class-III, the gender bias is significant, but for the group like class-IV to VIII and higher the level of gender bias are insignificant.

Table-4 brings out the relation between education and debts of the individuals. In the Purulia district total 35.28 percent respondents are having debt and 64.72 percent are not, whereas in Bankura district, it is 49.67 percent and 64.72 percent respectively. Majority of the respondents of the 'upper primary completed' (67.74%) and the 'upper primary not completed' (54.76%) are having debt in Purulia district. In Bankura district majority of the respondents from 'primary not completed' (60.47%) and 'illiterate but can do signature' (54.30%) have debt. Also in Purulia district, out of 530 respondents, 85.71 percent have no debt, whereas out of 610 respondents in Bankura, majority of the 'secondary plus' (64.71% have no debt. It is seen that less educated people are having more debt as compared to the people with high education.

Table-4 : Education Level and have any Kind of Debt

	%		%		%	
Educational Level	PRR	BAN	PRR	BAN	PRR	BAN
Illiterate	32.20	45.08	67.80	54.92	22.26	20.00
Illiterate & can do signature	32.64	54.30	67.36	45.70	27.17	24.75
Primary not completed	26.92	60.47	73.08	39.53	14.72	14.10
Primary Completed	18.87	54.24	81.13	45.76	10.00	9.67
Upper Primary not completed	54.76	43.64	45.24	56.36	7.92	9.02
Upper Primary completed	67.74	44.44	32.26	55.56	5.85	7.38
Up to VIII	55.88	45.65	44.12	54.35	6.42	7.54
Secondary	30.43	35.29	69.57	64.71	4.34	5.57
Higher	14.29	41.67	85.71	58.33	1.32	1.97
Total	35.28	49.67	64.72	50.33	100	100

Source : Primary survey-2018-19

(Figure in the parentheses shows the percentage)

Figure-5: Education Level and have any Debt

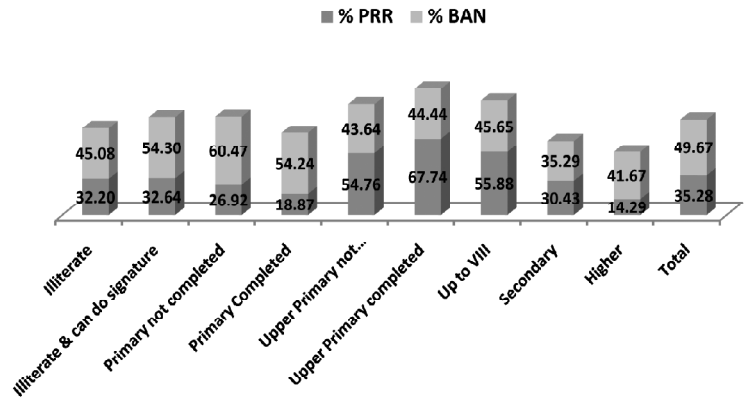

Source : Primary data survey-2018-19

Figure-6: Education Level with Debt& without Debt

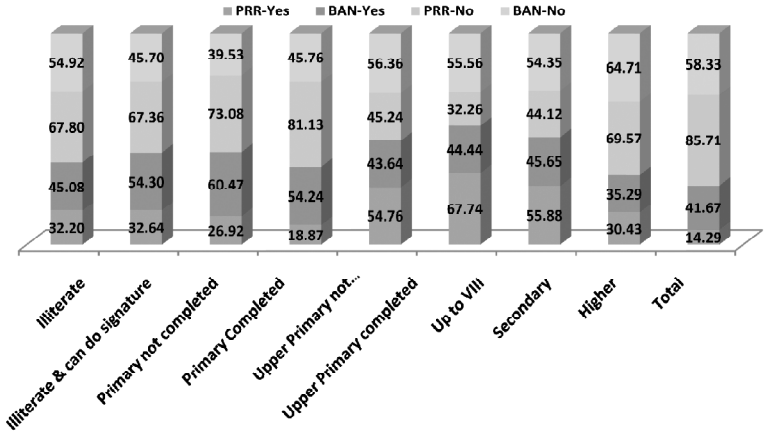

Source : Primary data survey-2018-19

Table-5: Education Qualifications and Practicing Family Planning

Educational Level	Practicing Family Planning					
	Yes		No		Total	
Illiterate	30.51	33.61	69.49	66.39	22.26	20.00
Illiterate & can do signature	42.36	65.56	57.64	34.44	27.17	24.75
Primary not completed	30.77	36.05	69.23	63.95	14.72	14.10
Primary Completed	32.08	40.68	67.92	59.32	10.00	9.67
Upper Primary not completed	35.71	58.18	64.29	41.82	7.92	9.02
Upper Primary completed	51.61	75.56	48.39	24.44	5.85	7.38
8+ to 10 (10 not completed)	64.71	63.04	35.29	36.96	6.42	7.54
Secondary+	82.61	79.41	17.39	20.59	4.34	5.57
Higher	80.94	83.33	0.00	16.67	1.32	1.97
Total	40.94	53.61	59.06	46.39	100.00	100.00

Source : Primary data survey-2018-19

Figure-7: Education Qualifications and practicing family planning

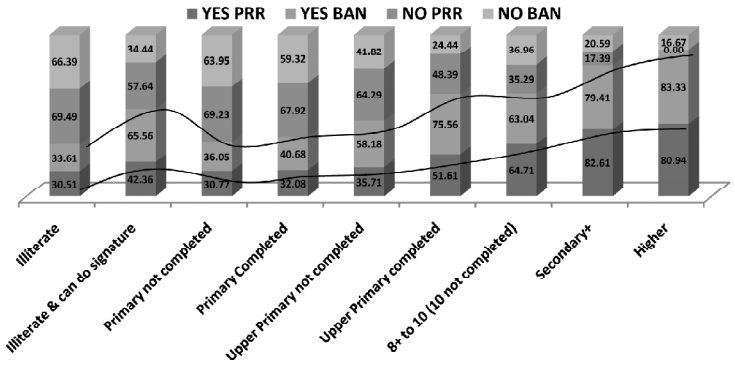

Source : Primary data survey-2018-19

An analysis of the table-5 planning. In the Purulia district, out of 530 respondents, 40.94 percent is practicing family planning and 59.06 percent is not practicing family planning; on the other hand, out of 610 respondents in Bankura, 53.61 percent is practicing family planning and 46.39 percent is not practicing family planning. In respect to family planning Bankura district is better than Purulia. In both the districts, higher education level of individuals leads to hig planning practices. So, here, inverse relationship exists between educational level and not pursuing family planning.

Conclusion

From the above study it is clearly understand that educational status of the households of the Scheduled tribes in the study area is highly linked with debt status and family planning adoption practice. The necessity of spreading education among the tribes shows significant impact across gender and it is important to note that after long time of our independence the situation of the tribes is not improved as expected. Recently, a lot of

effort has taken by the Ministry of Tribal affairs in this respect which are really distinct from the previous one and expected that will be more generous for the underprivileged tribal people.

References

1. Haimendorf, VCF (1982) "The tribes of India: the struggle for survival," Oxford University Press, Delhi.
2. Maurya R.D (1985), "Education for Tribals in Andhra Pradesh: Problems and Prospects" vol-33, No-4, Kurukhetra.
3. Shaha B (1990) "Research on tribal education" Perspectives in education, "A journal of the society for education research and development" vol-6, no.3.
4. Singh and Ohri (1993) "Educational Status of tribal Women in India".
5. Gregory,S. et al., (2007), Role of Education in Tribal Development: Issues and Concerns, Social Action, Vol. 57, Jan – Mar, 2007, pp. 14-26.
6. Ram Krishna Mandal, Role of Tribal Women in Socio-Economic Development, Southern Economist, August 15th, 2008.
7. Rajesh Jaiswal, Educational Development of Tribals in India, paper published in the book, Tribal Development in India, Contemporary Issues and Perspectives, Soubhagya Ranjan Padhi & Biswajita Padhy, Manglam Publications, Delhi – 53, 2010, pp. 162 – 189.
8. Tapan Ranjan Mohanty, The Have Nots of Hallowed Haven: Contextualizing Tribal Education in India, paper published in the book, Tribal Development in India, Contemporary Issues and Perspectives, Soubhagya Ranjan Padhi & Biswajita Padhy, Manglam Publications, Delhi – 53, 2010, pp. 199 – 215.
9. Sanjay Kumar Pradhan(2011), Problems of Tribal Education in India, Kurukshetra, May 2011, pp. 26-31.
10. The Times of India, Socio-Eco Census Paints a Grim Picture of Rural India, 4 th July, 2015, p.1. Bloomington, 1967.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

The Capability Approach to the analysis of disability of children in India

Gautam Bhowmik

According to UNDP's definition human development is a process of enlarging human's choices. The extent of human development is determined by the factors-equity, sustainability, productivity and employment. The essence of sustainable human development is that everyone should have equal access to development opportunities now and in future. Prof. Amartya Sen in his book 'Development as Freedom' (2000, oxford university press) established a relationship between human capital and human capabilities as an expression of freedom. The role of human capabilities manifests in three ways: a) their direct relevance to the well being and freedom of people (generation of income); b) their indirect role through influencing social changes (ensuring better health and education) and c) their indirect role through influencing economic productivity (skilled contribution to economic development). The relevance of the capability perspective incorporates each of these contributions. Environment (home, school and work), services available to the communities (transportation, health care, and social services) and cultural factors (law and attitude) altogether constitute contextual factors which affect an individual or child's life directly or indirectly. Prof. Sen has defined capability as deprivation of opportunities. So we can define disability as a deprivation in terms of capabilities or functioning that arises from the interaction of an individual's personal characteristics (i.e. age, impairments), set of available resources

(assets or incomes) and environment (social, economical, cultural and political). The capability approach explains disability in two ways - a) as a deprivation of capabilities- It mainly focuses on the concept of impairments rather than a disability and this impairments arises as a results of visual, physical or mental problems and b) as a deprivation of functioning- It results from interaction out of resources available to them or personal characteristics (job, age gender, financial supports of households) and the environment. Disability appears when an individual is unable of receiving practical opportunities due to different forms of impairments. Therefore, the capability approach developed by Sen is a useful instrument to define disability and understanding its socio-economic causes and consequences not only in terms of physical or mental disability rather it is understood by deprivation of practical opportunities.

. The percentage of disabled to the total population increased from 2.13% in 2001 to 2.21% in 2011. In rural areas, the increase was from 2.21% in 2001 to 2.24% in 2011 whereas, in urban areas, it increased from 1.93% to 2.17% during this period. The percentage decadal change in disabled population during 2001 -2011 is 22.4, whereas for the total population, the percentage decadal change is 17.7. This depicts the high prevalence of disability which is a great concern to us. Now economic development can be viewed as inclusiveness of disabled persons through expansion of opportunities and transforming them into productive capital.

Sustainable Development Goals (SDGs) is emphasizing on the social, economical and political inclusion (no one should be left behind) of persons with disabilities but we have no concrete realization in this respect.

In this chapter, we have tried

i) To develop an index on the burden of disability of children in major Indian states over periods

ii) To calculate a HHI (Herfindhal-Hirschman Index) to measure the concentration of disability of children among the states

iii) To analyze the nature of disability by age, sex and types

v) To ascertain whether there exists any correlation between disability and its determinants

vi) Critically review the government policies and programmes for children with disability

Definition and different types of disability

Disability is a physical or mental impairment that significantly restricts one or more major life activities. There is universal definition of disability. In India different definitions of disability have been introduced for various purposes. According to census (2001), different types of disability have been defined as follows:

i) Visual disability : A person who cannot see at all or has a blurred vision even with the use of spectacles will be treated as visually disabled.

ii) Hearing disability : A person cannot hear at all or can hear only loud sound (or with the help of hearing aids) will be considered as hearing disability.

iii) Speech disability : A person will be recorded as having speech disability if he or she is dumb. A person whose speech is not understood by a listener of normal comprehension and hearing will be considered as having speech disability.

iv) Movement or Loco motor disability : A person who lacks limb or unable to use limbs normally will be considered having movement disability.

v) Mental disability : A person who lacks the ability of comprehension appropriately will be considered as mentally disabled. Person with disability (PWD) Act (1995 & 2016) divides it into two categories- a)

mental retards and b) mentally ill. It means a condition of arrested or incomplete development of mind which is specially characterized by sub-normality of intelligence.

Source of data

The study is completely based on secondary data. To measure the burden of disability, firstly we have considered the children of two age groups (0-4) years and (5-9) years under five categories of disability seeing, speech, hearing, movement and mental retards for male and female separately. For this purpose we have used census data of 2001 and 2011respectively. To analyze the nature of concentration of disability among the children, we have tried to develop a HHI (Hinferdhal-Hirschman Index) using the data of two censuses on disability under five categories. For the comparative analysis of status of disability and its impact on health and education respect, we have taken the help of NSSO rounds (38th, 47th, 58th and 76th). Now the concept of disabled children has been redefined as children with special needs (CWSN). For this purpose, we are indebted to sarbha siksha abhijan (SSA) and National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) from where we have collected the data regarding CWSN and U-DISE at state level as well as at district level.

Methodology of the study

We have collected data from different secondary sources and all are in under achievement forms. To measure the incidence of disability, firstly we have developed a disability index under five categories over major Indian states, data are normalized using UNDP's goal post method. Now the standardized indicator takes the value zero to one. 1 indicates state's highest burden of disability for all individual categories of indicators, while 0 represents the lowest level of incidence of disability. Now based on the aforesaid standardized indicators, principal component analysis (PCA) has been applied using EVIEWS software to prepare an index of disability of children. But the disability index does not reflect the nature of

distribution of the impairments. To measure the extent of concentration (or, skewness) of disability through HH index, the proportion of children to total number of children of each individual category is squared and finally the summation of squared value is considered to present the degree of concentration among the states or the types of disability. Finally to evaluate the performance of the states in the field of reduction of disability over the periods, our attempt is to measure an index of children free from disability among major Indian states.

Disability Index

After normalising the data through UNDP's goal post method, EVIEWS software has been used to measure the index of disabled children (0-4 & 5-9 years) age group among the major. (Please see Next Page)

Here the Disability Index (DI) to be linearly constituted by five relevant components. The components are-impairments in seeing, in speech, in hearing, in movement and mental retards and they are denoted as V1i, V2i, V3i, V4i, V5i, and Z1i respectively The linear equation can be expressed as:

(DI)i = ë1 (SEEING IMP)i + ë2 (SPEECH IMP)i + ë3 (HEARING IMP)i + ë4 (MOVEMENT IMP)i + ë5 (MENTAL IMP)i+ ãi

Z1i = ë1 V1i+ ë2 V2i + ë3 V3i+ ë4 V4i + ë5 V5i+ ãi

Where Vi represents the standardized value of actual values (Xi) and ëi stands as loadings for the principal component of Zi and i=1 to 21 for census-2001 and census-2011.

The value of the index indicates the burden of the disability. Higher value represents higher incidence of disability and vice versa. Table-1 & Table-2 represent the disability index values of major Indian states among the children of (0-4) & (5-9) age groups and their corresponding ranks

Table-1: Disability index values among children and corresponding rank of states

STATES	2001		2011		2001		2011	
	INDEX VALUE	RANK (Male)	INDEX VALUE	RANK (Male)	INDEX VALUE	RANK (Female)	INDEX VALUE	RANK (Female)
J & K	0.13827343	18	0.203881203	18	0.179706	18	0.175141063	18
HP	0.05891454	19	0.082340843	19	0.03675579	19	0.037157149	19
PUNJAB	0.20168105	17	0.241726089	17	0.26231044	14	0.239418098	15
HARYANA	0.26077113	15	0.301026917	16	0.22523223	16	0.204657553	16
RAJASTHAN	0.70998074	6	0.962211567	5	0.60743076	8	0.559132236	9
UP	2.20280507	1	3.077994101	1	2.13475683	1	2.108794336	1
BIHAR	1.3415055	2	1.946178874	2	1.6952262	2	1.742704647	2
SIKKIM	0	21	0	21	0	21	0	21
MEGHALAYA	0.01944005	20	0.029847491	20	0.02318557	20	0.030169581	20
ASSAM	0.28869201	14	0.425527877	13	0.2432603	15	0.241966457	14
WB	1.13191045	3	1.735642287	3	0.88297046	4	0.88880321	4
JHARKHAND	0.33396498	12	0.489808143	12	0.46209608	12	0.46773921	11

STATES	2001		2011		2001		2011	
	INDEX VALUE	RANK (Male)	INDEX VALUE	RANK (Male)	INDEX VALUE	RANK (Female)	INDEX VALUE	RANK (Female)
ORISSA	0.54767213	9	0.770927678	9	0.58032175	9	0.565228094	8
CHHATTISGARH	0.22550662	16	0.324694009	15	0.2659774	13	0.268255291	13
MP	0.72075469	5	0.959431979	6	0.73707334	6	0.742537263	6
GUJARAT	0.45926683	11	0.588451017	11	0.47552322	11	0.445749577	12
MAHARASHTRA	0.94126721	4	1.277410173	4	1.58282923	3	1.513437332	3
AP	0.64830089	7	0.957432224	7	0.86520627	5	0.844000928	5
KARNATAKA	0.4743711	10	0.664832365	10	0.65939787	7	0.679828207	7
KERALA	0.3052848	13	0.417140914	14	0.19980288	17	0.188498813	17
TAMIL NADU	0.6056009	8	0.880823395	8	0.51013195	10	0.468640618	10

Sources : Authors' own calculation from secondary data

over the two census periods- 2001 and 2011. From the table-1, it appears that Bihar and UP hold the first two ranks of the table in both the year indicating increasing degree of disability. WB and Maharashtra interchange their 3rd and 4th position over the periods. Increasing burden of disability in these states may be due to lack of ante natal care, low nutrition level, low BMI of mothers, inadequate immunization of the children, percentage of family live below the poverty line, lack of monitoring and execution of the government schemes specially for the children with disability. Similarly highest three ranks (21st, 20th, 19th) predominantly occupied by Sikkim, Meghalaya and HP indicating lower degree of disability. The value of disability index for male has increased from 2001 to 2011 in almost states while the value of index for female children has decreased in major Indian states over the same period. This reflects a positive attitude towards the girl child which would likely to have a lesser impact on gender discrimination. But overall the relative positions of the states more or less by age and sex remain the same. This indicates that though commitments have made in Indian constitution towards reducing disability but the outcome remain unaltered.

Correlation of disability and its determinants

The prevalence of disability of children in India are mainly caused by several factors that occurs from the conceive of foetus to the human living birth. Some of them are out of controls and most of them can be detected at neo-natal stage and may be prevented from the occurrence of disability through proper health care of both mother and children, providing balanced nutritional diet, better immunization, quality health structure, skilled health workers. Thus the disability index (Z1) can be explained by the variables such as

i) **Full Ante Natal Care (ANC) -** It includes at least four antenatal visits, having received at least one TT injection, and having taken iron and

folic acid (IFA) tablets or syrup for 100 and more days from the primary health centre (PHC) or from nearest health facility. Full antenatal care of pregnant women reduces the probability of a child to be disabled. So the variable ANC is negatively associated with the disability index (DI).

ii) **Below Poverty Line (BPL) -** In capability approach, prof, Sen has defined poverty not only on the basis of income but rather than assessing some basic functioning such as life expectancy, infant mortality, the ability to well nourished and well sheltered, basic health care as capabilities. Deprivation of such capabilities as a result of poverty may lead to the problem of disabilities. Thus as the percentage of families below poverty rises, Malnutrition (lack of vitamins and minerals), inadequate access to preventive and medical care (such as immunization), risks of accidental and occupational injury all lead to increase poor family to disabled conditions. Therefore there is a positive relationship between poverty and disability.

iii) **Institutional delivery -** It means delivery of births assisted by a doctors or by a skilled health workers which includes auxiliary nurse midwife (ANM), lady health visitors (LHV), Accredited Social Health Activist (ASHA) and by other health personnel. More institutional births reduce the chance of a new baby to be disabled. On the other hand, delivery at home by unskilled worker (daima) increases the chances of baby to be disabled. So the variable institutional delivery is negatively correlated with the disability of the children.

iv) **Nutrition of children -** Balanced nutritional level of a child represents having food articles with adequate vitamin or minerals lack of which creates different types of disabilities. In our study nutrition level represents children age 6-23 months receiving solid or semi-solid food and breast milk (NFHS-3).So lower level of nutrition i.e. malnutrition represents higher chances of the children to be disabled. Therefore it is negatively related with the burden of disability.

v) **Teenage pregnancy -** The prohibition of child marriage Act announced (2006) to maintain strictly the minimum age of 18 of women. Because the pregnancy at teenage creates some complication that would have a greater chances of high MMR & IMR, high risks of deformities of the new born baby and ultimately it creates the condition of permanent disabilities. So early marriage and teenage pregnancy is an important determinants of disability and positively correlated with the incidence of disability.

vi) IFA taken by mother- Anaemia is a great problem in India. 58.6% of children, 53.2% of non-pregnant women and 50.4% of pregnant women were found to be anaemic in 2016 (NFHS-4). India-spend report (2016) noted that iron-deficiency anaemia was the top cause of disability in India for 10 years to 2015. Regular and periodic consumption of IFA tablet or syrup can reduce the problem of anaemia of women during pregnancy. So it is negatively associated with disability.

Table -2 shows the regression results of children's disability index with its determinants. It is clear from the table- nutrition of children; institutional delivery and IFA consumption by women during pregnancy are appeared to be significant for years, 2001 & 2011 with their expected sign. This implies that these variables have impacts on children's disability. Financial capability of the family representing by the variable, BPL is found to be significant for 2011. It indicates that low family income does not support the children with proper nutrition, better immunization or adequate access to preventive health care. This has also been established in a working pare by Susan Erb and Barbara Hari (2002). The variable teenage pregnancy in both years appeared as its expected sign and found to be significant.

Table-2: Regression results of children's disability index

	2001		2011	
Variables	Coefficients	prob.	Coefficients	prob.
BPL(X1)	0.0120128 (1.397256)	0.1841 (2.136475)	0.001366	0.0508
ANC (X2)	-0.014304 (-1.067514)	0.0038	-0.000327 (-0.493690)	0.0292
Nutrition(X3)	-0.013299 (-1.999323)	0.0654	-0.0014146 (-3.284405)	0.0054
Inst. Deliv (X4)	-0.034518 (2.299565)	0.0374	-0.00203 (2.478475)	0.0265
Teenage Preg (X5)	0.013451 - (0.732946)	0.0757	0.000238 (0.227988)	0.0230
IFA taken (X6)	-0.025671 (-2.366151)	0.0329	-0.002015 (-2.646966)	0.0191
Constant	0.271304 (0.396958)	0.6974	0.015830 (0.462425)	0.6509
R2	0.568469	0.832531	0.617127	0.453039
F-Statistic	3.073768	0.039091	3.760945	0.019278

Sources : Authors' calculation from secondary data

Note : Figure in the bracket indicates the value of t-statistic

* Indicates 5% level of significance ** indicates 10% level of significance

*** indicates 15% level of significance

Similarly the variable ANC appearing with its expected sign found to be significant indicating its negative impact on the problem of disability. The entire regression of the disability index with the above mentioned explanatory variables is appeared to be a good fit as explained by its high R2 value.

Measure of intensity of disability

SDGs is emphasizing on inclusion of all in economic development while the prevalence of disability creates an obstacle to the progress of a nation to a sustainable society. To measure the degree of concentration of disability among children in major Indian states by age, sex and types over the periods, we have applied the Herfindhal-Hirschman Index (HHI). Table-3 represents the value of HH index to measure the degree of concentration of disability over the periods.

Table-3: Herfindhal-Hirschman Index (HHI) by types of disability

AGE GROUP(0-4) YEARS	MALE		FEMALE	
TYPES OF	2001	2011	2001	2011
DISABILITY SEEING	1016.54	1111.50	1016.41	1115.93
SPEECH	866.44	980.31	885.80	654.88
HEARING	816.16	1275.65	838.68	1276. 64
MOVEMENT	929.71	778.01	923.36	788.35
MENTAL	857.17	798.01	891.09	804.21

Sources : Authors' calculation from secondary data

Table-3 shows that concentration of disability under the categories of seeing, speech (both for male and female) and hearing (only for male) has increased over the periods. The extent of increase in concentration is mainly contributed by the states of UP, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh and West Bengal. This is because the value of HHI for these states is in the range of HHI: 1000-1800 (concentrated zone of disability) and the value is greater than 1800 for U.P (highly concentrated level of disability). The value of HHI has decreased under the categories of movement and

mental both for male and female over the periods. This regressive mode ensures that government's initiatives regarding the screening, health support and rehabilitation through education, training and skill development have been materialised properly.

Educational aspects: Inclusive Education

The 86th amendment of the constitution has predicted a new thrust to the education with the children with special needs without whose inclusion, the objective of universal of elementary education cannot be achieved. Now the education CWSN has become an important part of sarva siksha abhijan (SSA). It has determined to ensure that every child with special needs, irrespective of kind, category and degree of disability should be provided meaningful and quality education. All the investments are aimed at creating barrier free education for CWSN to make education access to them.

Inclusive education is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. It implies all learners with or without disabilities being able to learn together through access to common education set up. The concept of inclusive education was first introduced at the world conference on special needs education; Access and Quality (Spain, 1994) consequently supported by the United Nations (UN). In India it has been introduced in 1997. But there is a slight difference between Special Needs Education (SNE) and Inclusive Education (IE). SNE refers the education of all those children and youth whose needs arise from disability or learning difficulties .IE stands for an integrated development for CWSN and normal children through mainstream schooling. SSA was launched mainly to achieve the goal of universal elementary education with a motto of zero rejection policy through emphasizing on access, enrolment and retention. It covers the following components under education for children with special needs- early detection and identification, functional and formal assessments,

educational placement, aids and appliances, support services, teachers' training, resource support, parental training and community mobilisation, planning and management, strengthening of special schools, facilities of home based education by special educators for children with severe and graved disabilities. In a work associated with the concept of inclusive education in Govt. Primary schools and teachers' perception by Khan, Hasmi et al (2017), they pointed out that the majority of teachers (74%) agreed that inclusive education is a desirable practice whereas 77 percent believed that all learners regardless of their disabilities should be in regular class. The study also revealed that teachers in mainstream schools have a favourable attitude towards children with seeing and hearing impairments compared to speech, mental or severe disabilities. This is similar to the findings of Paynee and Maurray (1974). In their concluding part they recommended that government should scale up inclusive education instead of practicing it only selected special schools, so that larger number of disabled students can avail the benefits of inclusive education.

Conclusions

This chapter has clearly brought out a strong linkage between disability and its determinants. In developing countries prevalence of disability is a great concern. Certain types of disabilities can be avoided through preventive measures, early care, proper immunization and vaccination at neo-natal stage. Similarly the accidental injuries in factory production or at road accident can be checked through proper measures and policy initiatives. Programmes such as "polio vaccination", Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) at school level, National Deworming Day (NDD) Programme etc by central government and "Safe Drive and Save Life", by West Bengal government impact remarkably. Awareness of the guardians about the facilities and changing their attitudes towards disability not considering it as an economic burden or as a social stigma, educating teachers as special pedagogical technique towards disabled

child actually includes this vulnerable and disadvantageous section with the main stream of the society. For social and economical protection 3% reservation provision are to be implemented in education and all poverty elevation schemes. Here the capability approach also prescribes the Persons With Disabilities (PWDs) to promote the labour force participation and economic self-sufficiency. It also suggests the policy makers to initiates the program of subsidies for on-job accommodation or transport cost for PWDs to go to work and escort allowances for CWDs to attend their schools and special trainings and provide temporary benefits to mitigate the constraints on resources resulting from impairments until a person finds job opportunities. Private sectors initiatives for ensuring concessional facilities for the disabled children and persons will help in breaking the vicious circle of disability. Problems of mobility and physical barriers are the road blocks for CWSN in accessing facilities regarding education, health and employment opportunities. Majority of children with disability are socially excluded and discriminated. The attitudinal barriers bare the real barriers that need to be removed with priority. Higher inflow of resources to the schemes relating to the sectors is required in order to materialize the commitments of an inclusive, barrier free and right-based society.

References

Amartya Sen (1985): Commodities and Capabilities. North-Holland. The most formal (technical) elaboration of Sen's capability approach

Amartya Sen (1989): "Development as Capability Expansion," Journal of Development Planning 19: 41–58. An especially accessible and succinct account of the capability approach to human development.

Amartya Sen(1999): Development as Freedom. Oxford University Press. Important and influential synthesis of Sen's work on human development and the Capability Approach.

NFHS (National Family Health Survey) (NFHS-4) 2015-16 India December (http://www.rchiips.org/nfhs or http://www.iipsindia.org) (International Institute for Population Sciences (IIPS) and ICF. 2017. National Family Health Survey (NFHS-4), 2015-16: India. Mumbai: IIPS.)

Mitra Sophie, the Capability Approach and Disability

NITI Ayog-Transforming Nutrition in India (2019): A Progress Report on Poshon Aviyan, September, 2019.

NSSO (2007-08): Education in India: Participation and Expenditure. NSS 64th Round, July, 2007–June, 2008. Report No. 532, Ministry of Health and Programme Implementation, Government of India, New Delhi.

Census data of 2001 and 2011

NSSO rounds (38th, 47th, 58th and 76th

Mitra sophie and et.all (2017), Disability and school attendance in 15 low- and middle-incomecountries

Suguru Mizuno

Mitra sophie, Disability, Health and Human Development, Fordham University, NY, USA

Narsing Rao (1990)

sarbha siksha abhijan (SSA) and National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA)

Sing Pooja (2014) in her work on PWDs

Susan Erb and Barbara Hari (2002)

The Report (2014) of Social and Rural Research Institute (SRRI)

World Bank's report (2007) & The World Bank Report (2009)

Portrayal of the sufferings and humiliation of woman in India A Comparative study of "A Time to be happy" and "Cry the Peacock"

Dipak Kr. Mandal

Abstract : Anita Desai is an Indian novelist. As a writer she has been shortlisted for the Booker Prize three times. She received "Sahitya Akademi Award" in 1978 for her novel "Fire on the mountain". Anita Desai's works open a period of forty years and her earlier works mostly explore tensions between the family members and the alienation of the middle class women. On the other hand Nayantra Sahgal has undoubtedly emerged as one the celebrated Indo-English fiction writers of the recent times. She got "Sahitya Academy Award" for her novel "Rich like us in India". The use of political genre is one of the main aspects of her novels. In my research paper I have made a comparative study of some works of Nayantra Sahgal and Anita Desai. Both these writers are feminist. But Anita Desai's works are different from Nayantra Sehgal. Nayantra Sahgal is mainly concerned with politics, east-west encounters and social themes. But Desai is more concerned with the Psychic life of her characters. Both these writers highlight the women's problems in the society and present them largely as victims in a patriarchal society. They mainly portrayed the tyrannies, torture and

violence faced by women in Indian society but their approach to address the problems and issues is different.

Keywords: Loneliness; Women; Marital discord; Insanity; Societal pressure; Torture.

This paper investigates how Nayantra Sahgal's "A Time to be Happy" and Anita Desai's "Cry, The Peacock'' shows how both of the writers are similar in their attempt to portray the sufferings and humiliation of women in India. M. Selvanayki writes: "Sahgal seems to expose conventional narrow minded Indian society through the character of Nita. In Indian society, the parents arrange for the two young souls to live happily even after. Sahgal strongly attacks this social convention and names this kind of marriage "just organised Rape" (qtd: 274). Usha Bande observes: Anita Desai disowns all social concerns and asserts more than once that she is interested in individuals and not in social issues. Social issues intrude only where they affect the character (Bende 12). The truth is that Desai's heroines are the traditional un-intellectual women who depend on their husbands for subsistence. She depicts the exploration of the disturbed psyche of the Indian women laying emphasis on the factors of loneliness and alienation. Most of her women characters lack the spirit of viewing life with optimism and fail to overcome their existing trauma and torture. Whereas Sehgal shows women suffering in marriage life and then deciding to come out of the suffering bondage by preferring for divorce. Her women characters leave their husbands or break marriage which does not allow them to be free from the suffering and agony of an unhappy or unjust relationship.

Anita Desai is not interested in politics and social life. She is interested in peculiar and eccentric characters rather than every day, average ones. She presents the plight of introspective, hypersensitive women in her novels. Her work is an accelerating exploration of the psyches self. Kohli

points out: "No other writer is so much concerned with the life of young men and women in Indian cities as Anita Desai"

On the other hand Sehgal's fiction is all about women's struggle for freedom from the world of male domination but her fiction has political aspects also. She belongs to a well prominent Indian political family (Nehru family). Almost every novel of Sahgal has a political setting. Due to all these factors her concern for moral values in politics and social life goaded her to use politics as background for her writing. Mrs. Desai discovers its principle suitable to her themes "aspects of existentialism" are in the evidence in the total framework of her stories. She lays stress on the alienation of men from an absurd world, his following from normal society and his recognition of the world as negative and meaningless- presents the sensitive, individual, fragmented and spiritually destroyed picture of the particular social conditions of life.

Whereas Nayantra Sahgal has different views about the society. She does not want the separate world of women. She wants a world in which men and women are living together with mutual trust and love. Because happiness of both depends upon each other. She is not only a feminist but also a humanist who speaks of the need for a universal culture and universal experience as A. V. Krishna Rao observes in Nayantara Sahgal: A study of her fiction and nonfiction "Nayantra Sehgal is perhaps one of our best socio-political novelists today." Similarly, Jasbir Jain in his book Nayantra Sahgal says "All around them, political and moral ideas were being discussed and formulated and the girl was a part of it. If it is Nehru's idealism which has influenced her political stance, whereas it is her own father's gentleness and courage which has influenced her moral stance".

When we compare the two novels "Cry, the Peacock" (Anita Desai) and "A Time to be Happy" (Nayantra Sahgal), the protagonists of these two novels have same conditions and are suffered from isolation, marital dilemma discord, self Identity, quest for love and respect.In"Cry the

peacock" (1963) Anita Desai portrays the Psychic tumult of a young and sensitive married girl Maya. Being alone in the family she is extremely loved by his father.She talks to herself"No one, no one else, loves me as my father does". Excessive love from her father she desires to have similar attentions from her husband Gautama. But her husband fails to satisfy her intense longing for love and life, she is left to the solitude and silence of the house which preys upon her."Torture, guilt, dread, imprisonment these were the four walls of my private hell, one that no one could survive in long. Death was certain". (Cry, the peacock, 88) She realizes that she could never sleep in peace. She is caught in the net of inescapable. "God, now I was caught in the net of inescapable and where lay the possibility of mercy, of release? This net was no hallucination? no... ...Am I gone insane? Father, Husband! Who is my saviour? I am in need of one. I am dying and I am in love with living. I am in love and I am dying. God let me sleep, forget rest. But no, 'I'll never sleep again. There is no rest anymore- only death and waiting"(84). Lack of communication between Maya and Gautama was the chief cause of suffering and her mental illness. At the end Maya pushes Gautama of the parapet of their house. Thus she murders her husband in a fit of insanity and commits suicide.

In "A time to be happy" by Nayantra Sahgal, the protagonist Maya is not comfortable in her relationship with her husband. In order to want peace in her life, she was always busy in social work and relationships. Maya experiences loneliness, frustration and complain of marriage. Like Maya in "Cry the Peacock '' Maya in "A time to be happy" (Nayantara Sahgal) there is a lack of communication between husband and wife. Her husband did not understand the psyche of his wife. Instead he demands that Maya should be submissive and traditional women. But Maya only wants equal respect, response and existence in her own house. His concern was with God and hers with God in him (A time to be happy-153). For Maya marriage was doomed from the beginning, there is a lot of difference between

their personalities. "She had the cool purity of eucalyptus, as compared with his extra vagrant gulmohar. She was the mirror-smooth lake to his rushing water full" (A time to be happy, 42). Maya remains frustrated in her relationship and ultimately their marriage becomes fragile. The marital agreement is maintained only because of the social conventions and the moral fear of the society. Though they are not soulmates to each other and however wrong their match may be, the women in this novel do not dare to come out of their homes or to break their marriage ties.

Conclusion : Nayantra Sahagal and Anita Desai both are well prominent feminist writer. Both have the same views but in some cases Nayantra's approach is different from Anita Desai. Anita Desai is the staunch supporter of feminism. But Nayantra Sahgal did not agree with this. She shows a balanced approach. She does not hold men absolutely responsible for the pathetic condition of women, instead she blames the system itself. According to this system she blames not only men's cruel throught but also women's unwillingness and passivity. And she is never in favour of creating a separate world for women. She wants to create a common world in which men and women live happily. Anita Desai's themes are mainly isolation, loneliness, alienation and marital discord whereas Nayantra Sahgal's themes are man-woman relationship, political, economic and social rights for women, democratic and humanistic values in Indian politics. But both these writers were struggling for the emancipation of women in this male dominated society. Their works become all about a woman's courage to fight societal pressures, her independent spirit and will power to take decisions as an individual.

References

1. Desai, Anita. 2006. Cry, the Peacock. Delhi! Orient paperbacks.
2. Sharma, R. S 1981 Anita Desai. Arnold-Heinemann, New Delhi.
3. Kumar, Narendra. N "Introduction" Fits and mists: A study of Anita Desai

Protagonist. Bareilly Prakash book Depot, 1995.

4. Kohli, Suresh "Indian women writing in English". Times weekly, 8 Nov. 1970.
5. Bande, Usha. The novels of Anita Desai. New Delhi: Prestige Books, 1988.

Works cited

1. Jasbir Jain, Nayantara Sahgal Michigan: Printwell, 1994. P. 12. Print.
2. Rao, A. U. Krishna. "Historical consciousness in the novels of Nayantra Sahgal". The Journal of Indian writing in English 18. 2 (July 1990. Print
3. Sahgal, Nayantra. A time to be happy. New Delhi: Sterling Publishers, 1975. Print.
4. Rogers, Katherine M. (1966), The Troublesome Helpmate: A History of Misogyny in Literature. Seatle: University of Washington.
5. Rajan, Rajeshwari Sunder. (1993), Real and Imagined Women: Gender, Culture and Post Colonialism. London / New York: Routledge.
6. Spivak,Gayatri.(1988), Can the Subaltern Speak? in Marxism and the Interpretation of Culture. Ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana, IL: University of Illinois Press.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 12. October, 2020

Solution Self-Assembly of Organic Crystalline Array for High-performance Molecular Electronic Devices

Biswanath Mukherjee

Abstract

The fabrication of highly aligned crystalline array of some low molar-mass, small, organic molecules by capillary force driven solution self-assembly is reported. Based on the solution processed crystals array, high-mobility organic field-effect transistors and organic photodetectors with reproducible and reversible photoswitching characteristics have been fabricated. The method, being applicable to a range of organics for the oriented growth of organic crystalline arrays and the ability to make large area organic crystals through solution processing opens up new possibilities for integrated device applications of organic nanostructures for future large-scale and low-cost plastic optoelectronic devices.

Introduction

The tremendous progress in silicon based microelectronics technology in last few decades has brought revolution in electronic devices and display technology. The basic sub-unit of an integrated chip (IC), the transistor has shrunk considerably and further downscaling of the devices becoming

almost impossible due to the scaling limit issue.[1] Thus, for the continuation of the miniaturization of ICs well into the next century, it is likely that present day, microelectronic device designs will have to be replaced with new device designs that take advantage of the quantum mechanical effects and dominate on the much smaller, nanometer scale regime. Molecular electronics, which is aiming toward the use of a single organic molecule or an assembly of molecules as an active element in integrated electronic circuitry, has been considered to be one of the best viable alternatives to the scaling limit problem. Organic semiconductors offer a range of benefits which includes low-cost, ease of device fabrication, large-area coverage, low processing temperature and mechanical flexibility. Moreover, additional functionalities can be incorporated into the organic semiconductor by suitably tailoring the molecular design. This interdisciplinary subject of molecular electronics started flourishing only in 1974, when A. Aviram and M. Ratner proposed in a seminal publication that even a single molecule can function as a molecular device.[2] The experimental proof came after long time in 1997,[3] afterwards there have been dramatic improvements in the field of molecular electronics. The improved performance of organic devices over the past few years have given a great deal of promise to plastic electronics, especially for organic light-emitting diodes (OLEDs),[4] radio-frequency identification tags (RFIDs),[5-7] organic photovoltaic devices,[8,9] organic field-effect transistors[9-12] and organic phototransistor.[12, 13] The rapid progress made in this field has been, in part, due to improvements in the fabrication processes and the development of new materials with noticeably improved electronic properties.

Nano/microstructures of low molar-mass organic semiconducting compounds possess unique properties that can complement or rival those of inorganic nanostructures for applications in various nanoscaled optoelectronic devices.[14] In this article, a novel capillary force driven self-assembled method to grow ordered crystalline array of π-conjugated molecules from the solution phase has been described and its application

in different optoelectronic devices have been discussed. The simple, cost-effective, solution based self-assembly approach, requiring no additional surface treatment to grow ordered crystalline array, is suitable for large area fabrication, compatible with rigid as well as flexible substrates and can be extended to different π–π stacked soluble organic molecules suggesting its potentially broad utility and applicability.

Experimental Methods

The organic materials used in this study are 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (TCNQ), tetrathiafulvalene (TTF) and N,N′-dioctyl-3,4,9,10-perylene tetracarboxylic diimide (PTCDI-C8). The details of the crystal growth technique was described in our earlier communication [11,12] and also in the results and discussion section. For the fabrication of OFET, we have used patterned ITO coated glass substrates as gate electrode. Cross linked poly(4-vinyl phenol) (CL-PVP) was used as the gate dielectric. The precursor solution of CL-PVP was prepared by mixing poly(4-vinylphenol) (PVP) (Mw = 20,000 g/mol) (10 wt%) with a cross linking agent, poly(melamine-co-formaldehyde) (Mn = 511 g/mol) (5 wt%) and butanol (85 wt%). The precursor solution of the dielectric was spun-cast over the ITO gate electrode and the cast films was soft-baked at 90 °C for 10 min on a hot plate in ambient conditions and baked further at 175 °C in a vacuum oven (10^{-3} Torr) for 45 min. Ordered arrays of organic crystals were grown over the substrate. To complete the device fabrication, gold (Au) was thermally evaporated on top of the crystals to make the top contact source-drain electrodes having channel length (L) and channel width (W) as 50 and 1000 μm, respectively. A HP4145B semiconductor parameter analyzer was used for the characterization of the devices under ambient conditions.

Results and Discussions

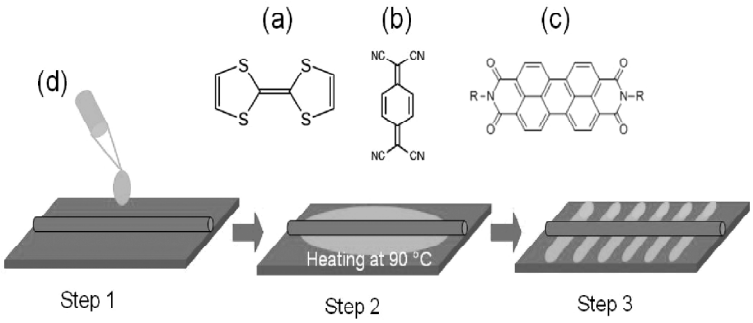

Figure-1 : Chemical structures of (a)TTF (b) TCNQ and (c) PTCDI-C8 molecules. (d) Schematic of the solution growth for crystal array fabrication.

Figure 1 (a – c) shows the chemical structure of the molecules used in this study. The schematic diagram for the preparation of the crystalline array is shown in Figure 1 (d). The small amount (5–10 μL) of solution of the material with concentration 2 mg/ml was dropped slowly from a micro-pipet atop the capillary tube (3–4 cm long, 1 mm diameter) placed over the substrate (step 1). The substrate along with the capillary tube was then placed on a heater preset at a temperature 90 °C (step 2). The substrate with the solution was heated for 1 hour under ambient condition to completely get rid of the solvent. It was seen that needle shaped crystals, completely oriented and in a direction almost normal to the capillary tube has grown on both sides of the tube (step 3). With increasing temperature, solvent evaporation at the edges is enhanced, which increases the diffusion of crystallites seeds towards the contact line and results in the nucleation of crystals and the self-assembly of molecules from the peripheral edge to the contact line of the solution with the tube.[15]

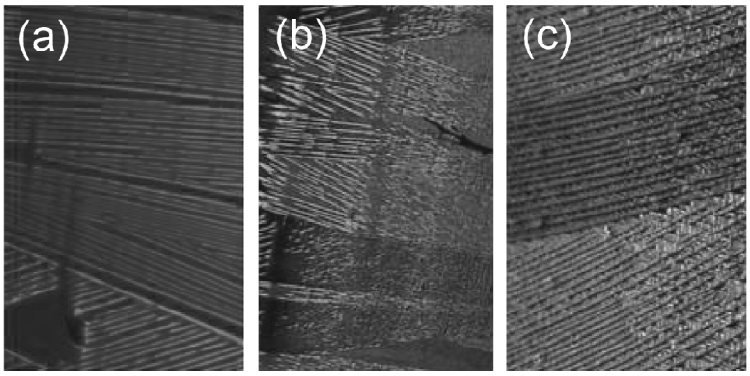

Figure-2 : Optical microscope images of aligned array of TCNQ crystals on (a) ITO coated glass substrate (b) gold coated glass substrate and (c)CL-PVP coated glass substrate. Image of only one side of the tube is shown in the figure. Each frame has width of 200 μm.

It was observed that the nature (size, shape) of the crystals depends greatly on the substrate used. It is obvious that the growth of the crystals will depend on the nucleation and self-assembly of molecular seeds and hence on the interaction between the organic molecules and the substrate atoms. Figure 2 shows the optical microscope (OM) image of TCNQ crystals deposited on ITO, Au and polymer coated glass substrates. In all the cases, the crystals were deposited from toluene solution of TCNQ and the substrate temperature was kept fixed at 90 °C. It is clear that the growth of the crystals were interrupted by the surface roughness. If the roughness of the substrate is more, the crystal growth will be hampered more by the ups and downs of the surface, creating some discontinuities within the crystal itself, and hence less will be the length of the crystals (Figure 2b). On the other hand, length of the crystals will be more, if there is uninterrupted growth of the crystallite seeds, which is possible when the growth occurs in a smooth surface (Figure 2a, c). The typical length of the crystals as measured from the OM image was found to be >200 μm. The

crystalline nature of the microwire was confirmed from the X-ray diffraction spectra.

The present method invariably represents a facile approach for fabrication of highly ordered organic micro-crystalline array of different organic compounds. For example, by using an identical procedure, aligned crystals of TTF (Figure 3a) and PTCDI-C8 (Figure 3b) can also be obtained. In this case also, the concentration of both the material was fixed at 2 mg/ml with a drying temperature of 90 °C. It is evident from Figure 3, that long, needle shaped single crystals aligned array can easily be prepared by the present solution based method leading to the conclusion that this technique affords the formation of ordered microstructures for varieties of π-conjugated, soluble organic molecules.

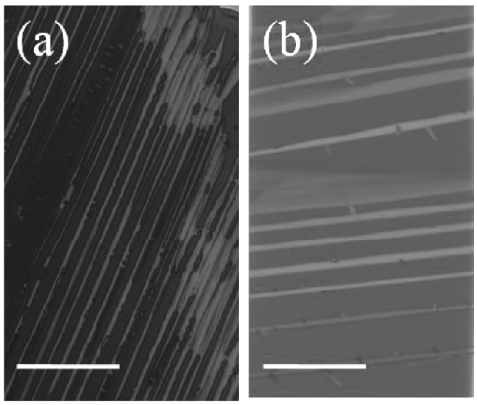

Figure- 3 : OM image of (a) TTF crystals and (b) PTCDI-C8 crystals on glass substrate prepared by capillary method. The scale bar is 100 μm.

To demonstrate the potential application of the present technique, photodetectors (PDs) from the TCNQ and TTF crystalline arrays have been constructed. Figure 4a shows the typical I–V curves of TCNQ crystals based PD obtained in the dark and under continuous illumination of different intensity. It shows that the photocurrent under illumination is markedly higher than that obtained in the dark. Also, the photo current increases with increase in light intensity, as expected. Figure 4b reveals that the time response of the device, where the light source was switched

on and off periodically, is reversible and reproducible. As soon as the light was turned on, the current sharply increased to a high value demonstrating fast response of the device. The ratio between the currents under light and in dark states was found to be ~40. The photoswitching characteristics of devices based on TTF crystals arrays is shown in Figure 4c. With an applied bias of 10 V between the electrodes, when the light was switched alternately on and off, it caused the current of the devices to show two distinct states: the ''low'' current state in the dark and the ''high'' current state in the light. The variation between these two states was fast and reversible, making it possible for the device to act as a high quality photosensitive switch.

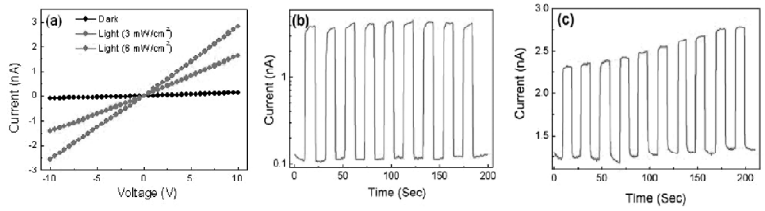

Figure-4 : Photoresponse characteristics of devices. (a) I–V characteristics of TCNQ crystals based PD measured in the dark and under illumination. Time response of the device under pulsed light of fixed intensity for (b) TCNQ PD (c) TTF PD.

Finally, the high performance organic field-effect transistors based on ordered crystalline arrays have been fabricated. The output (I_{DS}–V_{DS}) and transfer (I_{DS}–V_G) characteristics of TCNQ and TTF crystals based OFETs is shown in Figure 5(a) and (b) respectively. The characteristics for TTF crystalline OFETs exhibited p-type (hole dominant) conduction (left panel, Figure 5a), whereas, the OFET based on TCNQ crystals showed n-type (electron dominant) conduction (right panel, Figure 5a). Both n- and

p-type OFETs showed excellent gate modulation along with current saturation. With increase in VG, more charge carriers are accumulated in the interface between organic crystals and the gate dielectric near the channel region resulting in increase of the drain current (I_{DS}). The transfer (I_{DS}–V_G) characteristics (Figure 5b) demonstrated an on/off current ratio ~10^3 for both types of transistors and saturation charge carrier mobility (μ) ~0.02 $cm^2 V^{-1} s^{-1}$ (TCNQ OFET) and 0.05 $cm^2 V^{-1} s^{-1}$ (TTF OFET). The threshold voltages (VTh) as estimated from the transfer curves were found to be 5 V and -18 V, respectively, for TCNQ and TTF based OFETs. So far as the mobility and threshold voltage is concerned, the performance of the current device is impressive and superior than the early report of TCNQ thin-film transistors,[16] which indicates that the intrinsic material performance was not fully realized in previous TCNQ OFETs with the polycrystalline films, presumably because of extrinsic influences, such as from grain boundaries, defects and traps.

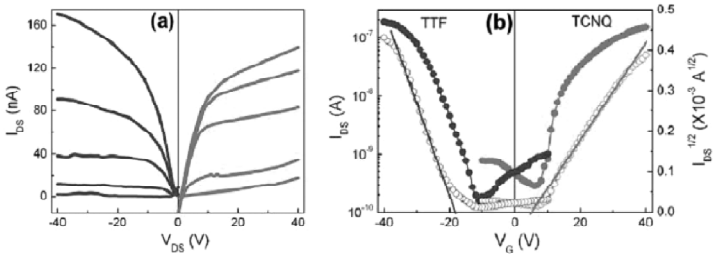

Figure-5 : (a) Typical output characteristics of TTF (left panel, blue curve) and TCNQ (right panel, red curve) crystalline OFET with |VG| ranging from 0 to 40 V (step 10 V). (b) Transfer characteristics of the OFETs measured at |VDS| = 30 V.

Conclusions

To conclude, a simple, one step solution processing method has been described to deposit long, needle shaped, one-drectionally grown organic single crystals array. Organic photodetector and field-effect transistors

based on TCNQ and TTF micro crystalline array have been designed to have high device performance. The proposed capillary force induced method, being a general one, can be extended to different soluble organics and have significant potential for large-scale and low-cost optoelectronic/ plastic electronics applications.

References

1. International Technology Roadmap for Semiconductors, 2001 ed., Intl. Sematech, (2001).
2. A. Aviram, M.A. Ratner, Chem. Phys. Lett. 29 (1974) 277.
3. R.M. Metzger, B. Chen, U. Ho¨pfner, M.V. Lakshmikantham, D. Vuillaume, T. Kawai, X. Wu, H. Tachibana, T.V. Hughes, H. Sakurai, J.W. Baldwin, C. Hosch, M.P. Cava, L. Brehmer, G.J. Ashwell, J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 10455.
4. X. Yang, X. Feng, J. Xin, P. Zhang, H. Wang, D. Yan, J. Mater. Chem. C 6 (2018) 8879.
5. K. Myny, S. Steudel, S. Smout, P. Vicca, F. Furthner, Org. Electron. 11 (2010) 1176.
6. S. Steudel, K. Myny, V. Arkhipov, C. Deibel, S. De Vusser et. al., Nat. Mater. 4 (2005) 597.
7. V. Fiore, P. Battiato, S. Abdinia, S. Jacobs, I. Chartier et. al. IEEE Transactions on Circuits and Systems 62 (2015) 1668.
8. Y. W. Su, S. C. Lan, K.H. Wei, Materials Today 15 (2012) 554.
9. R.Q. Ping, P.-J. Cjia, J.-C. Tang, B. Liu, S. Sivaramakrishnan, M. Zhou, S.H. Khong, H.S.O. Chan, J.H. Burroughes, L.-L. Chua, R.H. Friend, P.K.H. Ho, Nat. Mater. 9 (2010) 152.
10. R.P. Oritz, A. Facchetti, T.J. Marks, Chem. Rev. 110 (2010) 205.
11. B. Mukherjee, M. Mukherjee, K. Sim, S. M. Pyo, J. Mater. Chem. 21(2011) 1931.
12. B. Mukherjee, K. Sim, T. J. Shin, J. Lee, M. Mukherjee, M. Ree, S. M. Pyo,

J. Mater. Chem. 22 (2012) 3192.

13. B. Mukherjee, M. Mukherjee, Y. Choi, S. M. Pyo, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2 (2010) 1614.
14. E.W. Meijer, A.P.H.J. Schenning, Nature 419 (2002) 353.
15. B. Mukherjee, M. Mukherjee, Org. Electron. 12 (2011) 1980.
16. M. Lizuka, Y. Shiratori, S. Kuniyoshi, K. Kudo, K. Tanaka, Appl. Surf. Sci. 130 (1998) 914.

E-Commerce : A Booming Industry in India

Dr. Malay Kumar Ghosh

Abstract

The rapid penetration of internet network, mobile phone has changed the way of communication and the business world over the last two decades. The world of E-Commerce provides a platform known as E-market place via website and mobile app network to the sellers and buyers for online shopping of goods and services without going to the traditional market place. These practices and cultures in the developing countries like India has taken a significant place in recent few years as the people are mostly preferring online shopping for getting goods and services at their doorstep to reduce their daily life hazards to some extent. This paper aims to represent the basic idea of E-Commerce, its current scenario and future possibilities in India.

Key words : E-Commerce, E-Market Place, Traditional Market Place, Online Shopping.

Introduction

In 1995, the internet operation started first in India and soon thereafter, the first wave of Electronic Commerce also known as E-Commerce took place. Now,E-Commerce is becoming a fast-growing industry in India with the

rapid penetration of internet opportunities and android based smart phones. The E-Commerce offers a platform also known as E-market place through website and mobile app networks before suppliers and consumers where they can bargain with each other regarding the products and services and then complete the transaction by avoiding to go to traditional market place. It not only saves time and money but also arranges relaxed environment for shopping safely and peacefully. People mainly in urban areas and some in rural areas also go for online shopping to minimise their day to day life hazards. Truly speaking, E-Commerce has opened a new dimension which has changed the traditional business world widely.

Objectives of the Study

1. To overview the basic idea of E-Commerce
2. To explain the Indian scenario of E-Commerce.
3. To express the causes of and threats to E-Commerce in India.
4. To recommend some suggestions to overcome the factors responsible against the growth of E-Commerce in India.

Methodology Used

The present research is exploratory in nature. Secondary data available in various Journals, Articles, Reports and Web Resources are used for the study. The relevant information is presented using tables.

Review of Literature

1. Kumar, Dr. Naveen (2018)

The article, entitled, "E-Commerce in India: An Analysis of Present Status, Challenges and Opportunities", attempts to study the present status of E-Commercein India, examine the barriers and discuss the future of E-Commerce in India. This study finds that the growth of E-Commerce is running very fast in Indiain spite of its many barriers. This rapid growth is possible because of many positive factors such as increase in 3G/4G,

internet services, number of internet as well as smart phone users, digitalisation etc. This paper also gives suggestions of providing legal frame work by the government to minimize hindrances against the growth of E-Commerce in India.

2. Shettar, Dr. (Smt) Rajeshwari M (2016)

The article, entitled, "Emerging Trends of E-Commerce in India: An Empirical Study", aims to study the concept of E-Commerce, analyse& study the present trends of various challenges faced by E-business players in India and the prospects of E-Commerce in India. The study reveals that for the whole sellers, retailers, producers and consumers, several kinds of facilities are provided by E-Commerce.

3. Goyal, Nitika & Goyal, Deepam (2016)

The article, entitled "Impact of E-Commerce in India: Issues & Challenges",attempts to highlight the reasons, challenges, barriers, advantages, various facilities of E-Commerce in India. This study expresses that the new door for business & new avenues in the field of education are opened with the helping hands of E-Commerce. This study also remarks that though E-business provides opportunities in wide ranges, the success of E-Commerce depends upon successful IT security framework.

4. Sarode, Dr. RajendraMadhukars (2015)

The article, entitled, "Future of E-Commerce in India Challenges & Opportunities", attempts to analyse, examine and find out the present trends and opportunities, the barriers and the factors of E-Commerce in India respectively. This study reveals that E-Commerce has a great future in India if necessary arrangements such as legal framework for E-Commerce, privacy, prevention of fraud, consumer's protection etc. is given much importance.

Basic Idea of E-Commerce

In the 20th Century, Electronic market place i.e. E-market place was emerged

with the development of internet opportunities and gave birth to the todays Electronic Commerce known as E-Commerce. The E-Commerce provides E-market place which is an imaginary place like traditional market place where products and services as well as information are transmitted from sellers to buyers (Goyal, Nitika & Goyal, Deepam (2016). So, exchange of products, services as well as information via internet network is known as E-Commerce. The evolution of E-Commerce started from Barter Process, then Monetary Transactions, Street Vendors, Mail Order Cataloguing, Tele Shopping and lastly to E-Commerce. In India both Multiproduct E-Commerce and Single Product E-Commerce are found. Multiproduct E-Commerce deals with all types of products and services such as vehicles, jewellery, books & magazines etc. in a single portal like www.radiff.com; www.khoj.com etc. Single Product E-Commerce is engaged in particular item such as automobiles through site like http://www.indiacar.com; matrimony through site like http://www.saadi.com; real estate through site like http://www.indiaproperties.com; gift items through portal like http://www.indiagiftsportal.com; stock market through portal like http://www.equitymaster.com; employment through site like http://www.naukri.com; travel & tourism industry through portal like http://www.tourismindia.com and so on. Five major categories of E-Commerce business are found in India viz. Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), Business to Business to Consumer (B2B2C) and Business to Government (B2G) (Shettar, Dr. (Smt) Rajeshwari M (2016). The top 10 E-Commerce companies in India, 2018 are 1st – IRCTC; 2nd – mjunction; 3rd – Flip Kart; 4th – Paytm; 5th – Amazon India; 6th – Snapdeal; 7th – Shopclues; 8th – Make My Trip; 9th – Myntra and 10th – Book My Show (https://www.mbaskool.com). India's top 10 E-Commerce websites for online shopping, most popular and most visited websites are: flipkart.com, snapdeal.com, Myntra.com, Jabong.com, shimply, Homeshop18, yebhi.com, infibeam.com.shopclues.com, TRENDIN.com, ebayamazon (www.walkthroughindia.com).

Causes of booming of E-Commerce in India

In the recent years, E-Commerce is growing very fast because it possesses huge merits not only to consumers but also to suppliers and the society as a whole. The relevant causes are enumerated below.

1. **Solving Tough Life Schedule :** Daily life schedule of the people are tough in this competitive age. People have no enough time for shopping from the traditional market and have to depend on online shopping to save the time and effort to be utilised otherwise.
2. **Increased Income :** The advancement of business world creates huge job opportunities in the society which lead to increase in income of the people. The purchasing power of the people increases, as a result, the surplus income is used for online shopping easily as and when required.
3. **Maintenance of Sophisticated Life :** With the rising in purchasing power of the people, they want to enjoy a sophisticated, gorgeous and colourful life. So, they are mentally prepared to spend more for sophisticated items through E-Commerce operation.
4. **Increased Literacy :** Now a day, not only urban people but some of rural people are computer literate which lead to increase the zeal of the people to go for online shopping.
5. **Raising of Internet and Mobile Phone Users :** The number of internet and mobile phone users is increasing day by day. Web users are transformed into web client by sophisticated online travel operators in recent years which also raise the E-Commerce business.
6. **Increased People Awareness :** Through social media like newspaper, radio, television, face book, whatsapp, messenger etc, the people are very much aware of the whereabouts of the products and services. Before purchasing of the products, they can compare the products, its features and related cost thoroughly. These also make them interested in online shopping.

7. **Low Cost of Products and Services :** Due to increase in competition amongsellers engaged in online business, the cost of the products and services becomes low. So, the buyers have to spend less for the products and services.
8. **Quick Delivery :** Quick delivery of products and services in E-Commerce operation attracts the consumers for online shopping.
9. **Cash on Delivery :** E-Commerce business offers the facility of cash on delivery which most of Indian prefers. So, the consumers have to pay after getting the products. If any discrepancies, damage in regard to products, its specification are found, then those products can easily be returned without any tension. So, they can access to online shopping freely.
10. **More Freedom to Choose Products :** With the blessing of E-Commerce business, there are a lot of opportunities to choose the best products and services from many alternatives which the consumers like.
11. **Reduction in Storage Cost :** In E-Commerce business, Just in time (JIT) approach is followed. As a result, storage of lump sum goods or establishment of costly showroom for retail sale are not necessary which reduce the related cost. The companies therefore prefer E-Commerce business.
12. **Enhancement of Relationship :** The existence of company in business world depends upon the enhancement of good relationship with the customers. Customers satisfaction is only possible by delivering goods and services at the right time in the right place to the right person through E-Commerce operation.
13. **Opportunity of Globalization :** The worldwide consumers are well informed about the products and services of a company through E-Commerce activities. So, there are ample opportunities to a company to become globalized.

14. **Reduction in Processing Time :** The processing time for an order can be reduced with the help of information technology like Electronic Data Interchange (EDI) which leads to minimise the processing an order. It is also a blessing of E-Commerce operation.

15. **Easy Payment System :** The customers make payment through net banking, Debit/Credit Card for e-shopping easily. So, both consumers and suppliers become tension-free in this regard.

Threats to E-Commerce in India

Though E-Commerce possesses variety of merits and that's why E-Commerce becomes so popular, it faces numerous threats also. These are mentioned below.

1. **Problems of Secrecy and Security :** Both secrecy and security aspects of E-Commerce followers are very much crucial factors. Any break in either these aspects, consumers will keep themselves aside from E-Commerce shopping.

2. **Problems in Delivery :** So far as delivery of goods and services is concerned, the customers face the following two problems:

   a) The aim of the E-Commerce is to deliver the goods and services to the right customers to their doorstep in right moment. If the items inside the sealed packet are defective, damaged or not up to the mark as regard to quality, quantity, colour, size and other specifications as shown in advertisement in the respective website, it comes to the notice of the customers after opening of the seal. Then the customers confront a problem of returning the products as well as cash back if already paid at the time of placing order. Postage fee if any will also not be refunded by the company. All these will have a negative impact on the customers toward online shopping.

   b) Sometimes the delivery, before or after due date which the

customers have been informed previously, may happen and if the door of the said customers remains closed i.e., due to non-availability of the customers on that date and time, the products are returned back. The customers in this case also are undergone difficulties to get the products back which frustrates the customers for online shopping.

3. **Compelled to Purchase More :** For getting free delivery, the customers often have to purchase the goods of certain amount though not required. This is also embarrassing to the customers which aggravates the customer's interest to go for e-shopping.
4. **Less Involvement of Rural People :** India is basically a village-based country. Most of the Indian people reside in rural India. Many of rural people are not aware of e-shopping as compared to urban people. Moreover, wide area of rural India is devoid of internet connectivity. This is obviously a threat to grow E-Commerce in India.
5. **Critical Version of Website :** In some cases, the version of website is found critical to realise by the less or illiterate users, then the customers in this category will not be ready to go for transactions through E-Commerce.
6. **Low Internet Speed :** Due to low speed in internet operation, placing of order and making of payment may be disrupted which is a barrier to E-Commerce shopping.
7. **Un-updated Website :** Sometimes, websites of many E-Commerce companies are not updated regarding the information of products and services. Fascinating photographs of the products are not uploaded which may not attract the customers for online shopping.
8. **Window Dressed of Website :** In the website, fabricated information and window dressing of products and services are uploaded. This may entice the customers towards e-shopping.

9. **Difficulty in Incorporating Legal Formalities :** E-Commerce companies operate their business countrywide as well as worldwide. The tax, GST, other laws, policies, practices and procedures etc vary from state to state and also country to country. So, the E-Commerce companies have to incorporate all these while operating their activities which are very difficult.

10. **Unhealthy Competition :** To earn more, the E-Commerce companies are going too far which is making the competition unhealthy. So, the genuine companies and customers are suffered from it.

Indian Scenario of E-Commerce

With the penetration of internet and android based phone, the growth of E-Commerce business in India has become noteworthy and it is changing the traditional business trend in a wider range. The young consumers, age profile between 15-35 years are net savvy and like online shopping.

Table-1 : Internet Subscribers in India in Millions

At the end of March	Total	Narrow band	Broad-band	Wired	Wire-less	Urban	Rural
2015	302.36	203.15	99.20	19.07	283.29	194.80	107.56
2016	342.65	192.90	149.75	20.44	322.21	230.71	111.94
2017	422.20	145.68	276.52	21.58	400.62	285.68	136.52
2018	493.96	81.35	412.60	21.24	472.72	348.13	145.83

Source : Telecom Statistics India-2018

Table-1 depicts that total number of internet subscribers in India, 302.36 million at the end of March, 2015 increased rapidly to 493.96 million in 2018. During 2015-2018, the number of broadbands, wired & wireless

subscribers increased from 99.20 to 412.60, 19.07 to 21.24, 283.29 to 472.72 million respectively except the number of narrowband subscribers which decreased from 203.15 to 81.35 million. So far as urban & rural subscribers are concerned, both increased from 194.80 to 348.13 and 107.56 to 145.83 million respectively during 2015 to 2018.

Table-2 : Number of Digital Buyers in India

Years	Digital Buyers in Millions
2014	54.1
2015	93.4
2016	130.4
2017*	180.1
2018*	224.1
2019*	273.6
2020*	329.1

Source : Statista 2019

Table-2 highlights that the number of digital buyers in the year 2014 in India was 54.1 million and is expected to grow to 329.1 million in 2020 i.e. 6 times approx. as compared to 2014.

Table:3 Digital Buyer Penetration in India

Years	Share of Internet Users in %
2014	30.3
2015	37.3
2016	43.8
2017*	52.3
2018*	58.0
2019*	64.4
2020*	70.7

Source : Statista 2019

Table-3 shows the data regarding digital buyers' penetration in India during 2014 to 2020. 30..3% of internet users in India during 2014 purchased goods through online which is expected to reach 70.7% in 2020.

Table- 4 : Retail E-Commerce Sales in India

Years	Sales in Billion US Dollars
2015	13.31
2016	23.39
2017	37.50
2018	52.54
2019	65.09
2020	79.41

Source: emarketer, August 2016

Table-4 reveals that according to the report of e-marketer, August, 2016, the retail E-Commerce sales 13.31 billion US dollars during 2015 is expected to grow to 79.41 billion US dollars in 2020 which is approximately 6 times more than that of 2015.

Table- 5 : E-Commerce Share of Total Retail Sales in India

Years	% of E-Commerce Sales
2014	0.8
2015	1.7
2016*	2.6
2017*	3.6
2018*	4.4
2019*	4.8

Source : Statista 2019

Table-5 highlights the E-Commerce share of total retail sales in India during 2014 to 2019. During 2014, E-Commerce share was 1.7% of total retail sales in India which is expected to grow to 4.8% in 2019.

Table- 6 : Retail E-Commerce Revenue Forecast in India

Years	Revenue in Billion US Dollars
2017	18.03
2018*	22.14
2019*	27.34
2020*	33.26
2021*	39.46
2022*	45.55
2023*	51.24

Source : Statista 2019

Table- 6 highlights a forecast of retail E-Commerce revenue during 2017 to 2023 in billion US dollars. The retail E-Commerce revenue, 18.03 billion US dollars during 2017 is estimated to reach 51.24 billion US dollars during 2023.

Findings of the Study

1. The number of internet subscribers is increasing immensely though the rate of growth of internet users in case of rural India is slower in comparison with urban India.
2. The internet network coverage is also fast growing including rural India. All these expedite the E-Commerce business in India as the people are more linked with E-Commerce.
3. The number of digital buyers is increasing year after year.
4. There is a sharp rising trend in retail E-Commerce sales in India.
5. An upward trend is also noticed in case of retail E-Commerce revenue
6. Due to various merits of E-Commerce, the consumers, as well as

producers/suppliers are very much interested in E-Commerce transaction.

7. For getting the benefits of E-Commerce, the manufacturers, whole sellers and retailers get themselves linked with online transaction.

Suggestions

1. Personal and trade information should be kept secured, so that any information may not be disclosed through internet network.
2. There should be suitable delivery system so that the products and services may be distributed to the right customer at the right time at the right place as per order of description to avoid refund and associated cost.
3. Initiative should be taken to connect rural India fully with internet network so that more rural people can get the benefit of online shopping. Internet speed should also be taken care of.
4. Order size should be such that no difficulties to avail free delivery of goods and services can be reached.
5. The version of the website should be as easy, lucid as possible to read and realise, so that all kinds of customers can access to it any time.
6. The website should properly be updated by uploading right and current information, original photographs and other relevant data regarding goods and services.
7. A regulatory framework should be implemented for E-Commerce business by the government to set aside the chaos concerning various laws, policies, practices, procedures etc and to protect privacy, to prevent fraud etc.
8. The world of E-Commerce business should be free, fair and honest to

avoid the unhealthy competition among the E-Commerce companies and there by the consumers will not be deprived.

Conclusion

Though E-Commerce in India has a variety of limitations, it is associated with enormous benefits which change the business activities as well as the attitude of the consumers rapidly towards online shopping. The link between the producers and consumers is becoming broadened speedily because of E-Commerce. The fate of future trade depends upon E-Commerce. Accessibility to E-Commerce is now an essential phenomenon of daily life of the people. At present 3G, 4G networks are in force in India but very soon 5G networks will take entry. India is second largest populous country in the world and has vast economic market. The number of internet users, digital buyers is increasing immensely. Retail E-Commerce sales and E-Commerce revenue also have upward trend. The Government of India has taken remarkable initiatives such as Digital India, Make in India , Start-up-India, Skill India and so on since the year 2014 which also support to enhance the growth of E-Commerce in India. If the factors, stand in the way of growth of E-Commerce in India, are managed in a best possible way to keep them under controlled, there is an ample scope which can propel the growth of E-Commerce in India in forthcoming days. So, it is obvious that the E-Commerce is doubtlessly a booming industry in India.

References

1. Goyal, Nitika and Goyal, Deepam (2016), "Impact of E-Commerce in India: Issues & Challenges", International Journal of Advanced Research in Computer Science, ISSN: 0976-5697, Vol-7, No.-6 (Special Issue), November, 2016, pp-192-194.
2. Kumar Anuj, Fahad Fayaz, Kapoor,Ms. Namita (2018), "Impact of E-

Commerce in Indian Economy", IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668, Vol.20, Issue-5, Ver VI, May, 2018, pp-59-71.

3. Kumar, Dr. Naveen (2018), "E-Commerce in India: An Analysis of Present Status, Challenges and Opportunities", International Journal of Management Studies, ISSN(Print): 2249-0302, ISSN(Online): 2231-2528, Vol.-V, Issue-2(3), April, 2018, pp-90-95.
4. Mitra, Abhiji (2013), "E-Commerce in India-A Review", International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, ISSN 2277-3622, Vol. 2 No. 2, February, 2013, pp-126-132.
5. Sarode, Dr. Rajendra Madhukars (2015), "Future of E-Commerce in India Challenges & Opportunities", International Journal of Applied Research, ISSN (Online): 2394-5869, ISSN(Print): 2394-7500, 1(12), pp-646-650.
6. Shettar, Dr. (Smt) Rajeshwari M (2016), "Emerging Trends of E-Commerce in India: An Empirical Study", International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2319-8028, ISSN(Print): 2319-801X, Vol. 5, Issue 9, September, 2016, pp-25-31.
7. Telecom Statistics, India-2018.
8. www.walkthroughindia.com/hot-trends/indias-top10-e-commerce-websites-online-shopping/accessed on 30.03.2019.
9. https://www.mbaskool.com/fun-corner/top-brand-lists/17639-top-10-ecommerce-companies-in-india-2018.html accessed on 30.03.2019.
10. https://www.emarketer.com/Chart/Total-Retail-Retail-Ecommerce-Sales-India-2015-2020-billions-change-of-total-retail-sales/194284 accessed on 13.04.2019.
11. https://www.statista.com/statistics/289770/e-commerce-revenue-forecast-in-india accessed on 13.04.2019.
12. https://www.statista.com/statistics/379167/e-commerce-share-of-retail-in-india accessed on 30.03.2019.

THE PRISM
Vol. 12 October, 2020

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

THE PRISM
2229-7537